ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস ঃ সপ্তম খণ্ড

কোরআনের আলোকে

আব্বাসীয়া খেলাফত

ডক্টর ওসমান গনী, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট. (ক্যাল.)

মল্লিক ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশনায় ঃ
আলহাজ্ব আব্দুল কালাম মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ
মার্চ, ১৯৬৩

মুদ্রণে ঃ
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির
(এশিয়ার ক্ষণজন্মা মনীষী)

বলেন মানবশ্রেষ্ঠ 'মহম্মদ' ধরার—
এই বিশ্ব-বিধাতার একটি পরিবার।
উত্তম তিনিই এক বিধির দরবারে
যে-জন উত্তম এই বিশ্ব-পরিবারে।
যে করেছে তারে তোরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বল
মানুষের সেবা আর মানব মঙ্গল।
যে-জন করেন তিনি মানব-মহান
গরিবের সেবা আর গরিব-কল্যাণ
—হাদিস

শক্তি মোরে দাও প্রভু যেন চিত্তে মম
মানবে বরিতে পারি মোর ভ্রাতাসম।
শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ভুলি যেন নাথ
কল্যাণে মিলিতে পারি সকলের সাথ।
—অধ্যাপক কবির

যাঁদেরে দেখিয়া মম জেগে ওঠে প্রাণ
গরীয়ান মহীয়ান তুমি সে মহান।
কল্যাণই কামনা যার সঞ্জিবনী মূল
জীবন-বীথিকা বনে তুমি সেই ফুল।
—গ্রন্থকার

কোরআন—৩ : ১১০, ১৬ : ৯০, ৩৯ : ১০,
১০৭ : ৬-৭

ভূমিকা

আজ সর্বপ্রথম পরম করুণাময় কৃপানিধানকে জানাই অন্তরের অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা, যাঁর অসীম করুণাবলে আজকের এই ভূমিকা লিখছি।

সে আজ অনেকদিন হল (১৯৬২-৬৩) যখন আমি গবেষণারত, দুটি দিক থেকে নির্দেশ পেয়েছিলাম—'দুটি কাজ' করতে। কাজটি ছিল—পবিত্র কোরআনের কিছু ব্যাখ্যা-সহ একটি স্বচ্ছ সরল বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা ভাষাতে ইসলামের প্রথম যুগের (৫৭০-১২৫৮ খ্রীঃ) একটি ধারাবাহিক সঠিক ইতিহাস প্রণয়ন। এই মহৎ উদ্দেশ্যের একদিকে ছিলেন পিতা মওলবী মোহঃ ইউনুস, পিতৃব্য মওলানা মোহঃ ইলিয়াস, স্বপ্নদ্রষ্টা অগ্রজ মোহঃ সোলেমান, অন্যদিকে ছিলেন শ্রদ্ধেয় মনীষা অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য সুকুমার সেন, ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতগণ।

পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা-সহ বঙ্গানুবাদ যথাসময়ে বের হয়েছে। ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের শেষ বা সপ্তম খণ্ড আজ বের হতে চলল। কিন্তু আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার হল—যাঁদের একান্ত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষায়, অফুরন্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়, যাঁদের প্রাণভরা আশিস ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে একদিন এই জীবন-জোড়া বিশাল কাজে কম্পিত হৃদয়ে, আশা-নিরাশার মাঝখানে বসে পরম করুণাময়ের অফুরন্ত করুণা কামনা করে কলম ধরেছিলাম, তাঁদের আজ কেউই জীবিত নেই। আজ যেন আমি সুদীর্ঘকাল পরে ফেলা আসা যৌবনের উপবন হতে বার্ধক্যের বারাণসীতে না হলেও প্রৌঢ়ত্বের প্রাঙ্গণে রিক্তমনে রিক্তপ্রাণে ভাষাহীন অব্যক্ত ভাবে ভীষণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুসজল নয়নে দূর অতীতের স্মৃতিচারণ করে ঐ সমস্ত পরলোকগত আত্মাসমূহের কায়মনবাক্যে শান্তি কামনা করছি। আবার তাঁদের সেই প্রাণজুড়ানো হৃদয়ভরা দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করছি। আবার বলি—হে পরলোকগত আত্মা, তোমরা শান্তিতে রও।

যে জাগ্রত মনীষার সুনিবিড় স্নেহ, একান্ত ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা একদিন আমাকে ধন্য করেছিল, যাঁর লেখা কোরআনের ধারাবাহিক তফসির (ব্যাখ্যা) আমার

সম্পাদিত পত্রিকা 'যুববাণী'-তে বের করার সৌভাগ্যলাভ করেছিলাম, সেই যুগ-মানব ভাষাবিদ শহীদুল্লাহকে হারালাম ১৯৬৮-তে। যিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ অধ্যাপক কবিরকে হারালাম ১৯৬৯-এ। জীবনের পথে যাঁকে অভাবনীয় ভাবে পেয়েছিলাম, সেই মহান আচার্য চট্টোপাধ্যায়কে হারালাম ১৯৭৭-এ। পরম পূজ্য পিতাকে হারালাম ১৯৭৮ সালে। পথ-প্রদর্শক পিতৃব্যকে হারালাম ১৯৮১-তে। ভিন্নদেহ অভিন্ন হৃদয় স্বপ্নদ্রষ্টা অগ্রজকে হারালাম ১৯৯০-এ। এ জীবনের মহান কাণ্ডারী সহস্র জীবনের নির্মাতা, শতাব্দীর সূর্য মাস্টারমশাই আচার্য সেনকে হারালাম ১৯৯২-এ। ক্ষণে-ক্ষণে, মহাক্ষণে, ভীষণ ক্ষণে এঁদের একের পর এক বিদায়বেলা আমার হৃদয়কে কতখানি শূন্য করেছে, বিদীর্ণ করেছে, তা এক অন্তর্যামীই জানেন। ২ : ৭৭, ৩ : ১১৯, ৫ : ১০৯, ১১৬, ৮ : ৪৩

ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবনী 'মহানবী' এবং দ্বিতীয় হতে পঞ্চম খণ্ড সৎ খলিফা বহু পূর্বেই বের হয়েছে। এখন দ্বিতীয় হতে পঞ্চম খণ্ড (হযরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, হজরত আলি) আবার পৃথক পৃথক ভাবে বের হওয়ার পথে। ষষ্ঠ খণ্ড উমাইয়া খেলাফত আগেই বের হয়েছে। এবার শেষ বা সপ্তম খণ্ড আব্বাসীয় খেলাফতের পালা। ছাপার কাজ শেষ হল। এখানেই এই ধারাবাহিকতার সমাপ্তি পর্ব।

বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইসলামকে জানতে ও চিনতে আমার মহান উপদেষ্টামণ্ডলী বহুদিন হতে বাংলা ভাষাতে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। যে ধারাবাহিকে সঠিক কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে ধর্মের শুকনো কচকচানি, গোঁড়ামির লেশ ও ভাঁড়ামির স্পর্শ থাকবে না, যে ধারাবাহিকের মূল সুরে বিধৃত ও ঘোষিত হবে পবিত্র কোরআনের আলোকে ইসলামের মহান উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য—**মনুষ্যত্বের জয়, মানবতার জয়, মানব জাতির উত্থান**। যেখানে ধর্মের উপলক্ষ কোনক্রমেই যেন তার মূল লক্ষ্যকে অতিক্রম না করে। কেননা আজ সারা পৃথিবীতে ধর্মের উপলক্ষগুলি তার মূল লক্ষ্যকে পদদলিত করতে বসেছে। এই ধারাবাহিকতার কাহিনী বর্ণনার সাথে সেদিকেও তীক্ষ্ন লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সকল ধর্মের প্রতি সকল ধার্মিকেরই শ্রদ্ধা রাখাটা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা ধর্মান্ধতা আপন ধর্মেরও হত্যাকারী। আপন হাতেই ধর্মকে হত্যা করে। আবার ধার্মিক সেজে প্রাণহীন ঐ ধর্মকে বুকে জড়িয়ে রাখাটা বড়ই করুণ দৃশ্য, বড়ই অকৃত্রিম অভিনয়, বড়ই বেদনাদায়ক।

কোরআন—২ : ৬২, ১৫৬, ৪ : ৮০, ১৩৬, ৫ : ৬৯, ৬ : ১০৮,
১০ : ৯৯, ১১ : ১১৮, ১৭ : ৮৪, ২২ : ৬৩

প্রথম খণ্ড 'মহানবী'তে পেয়েছি ইসলামের প্রবর্তন যুগ, দ্বিতীয় খণ্ড 'আবুবকর'-এ পেয়েছি ইসলামের পরিত্রাণ যুগ, তৃতীয় খণ্ড 'ওমর'-এ পেয়েছি ইসলামের

প্রকৃত প্রতিষ্ঠার যুগ, চতুর্থ খণ্ড 'ওসমান'-এ পেয়েছি প্রথমার্ধে প্রসার যুগ, পরার্ধে পদস্খলন যুগ, পঞ্চম খণ্ড 'আলি'তে পেয়েছি প্রাণপণে ইসলামের পুনরুত্থানের যুগ বা পতনের মুখোমুখি যুগ। ষষ্ঠ খণ্ড 'উমাইয়া খেলাফত'-এ পেলাম মুসলমানদের (ইসলামের নয়) রাজ্য বিস্তারের স্বর্ণযুগ, সপ্তম খণ্ড 'আব্বাসীয়া'তে পেলাম মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ।

যে কোন একটি ধারাবাহিক কাজ করতে গেলে বিশেষ কয়েকটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। বিশেষ করে ইতিহাস লিখতে গেলে তখনকার ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক কাঠামো, যুগের চাহিদা, ঘটনা, কাহিনী, রটনা, গুজব, তত্ত্ব, তথ্য, কিংবদন্তী, প্রবাদ এবং রাজনৈতিক পরিবেশ, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের রুচি-অভিরুচি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অবস্থা-দুরবস্থাগুলিকে ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হয়। রাজ্য কেন ও কোন্ গুণে শূন্য হতে অভাবনীয় ভাবে গড়ে উঠলো, আবার শূন্য হতে গড়ে ওঠা ঐ সুবিশাল রাজ্য কেন অজস্র সৈন্য-সহ অচিন্ত্যনীয় ভাবে রসাতলে গেল, তাও খতিয়ে দেখতে হয়। অতীতের ঐগুলিকে আপন অনুভূতি ও অনুভবে এনে ভাব ও ভাষার মাল-মসলা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে সাজাতে পারলে ভাবীকালের জন্য ইতিহাসের সুন্দর ইমারত গড়ে ওঠে।

কোন সমাজের বা যুগের ইতিহাস যদি দূর অতীতের অভিজ্ঞতা-সহ অনাগত কালের ছেলেমেয়েদের, যুবক-যুবতীদের, পাঠক-পাঠিকাদের সে যুগের ভাল-মন্দ, ভুল-ভ্রান্তি, উচিত-অনুচিত-সহ, প্রতিষ্ঠা ও পতনের যথার্থ কারণগুলি যথাযথ ভাবে নির্ণীত করে ধরিয়ে দিতে না পারে, তাহলে ঐ ইতিহাসও কোন এক কালের ঘটনা ও কাহিনীর অপ্রয়োজনীয় পুঞ্জীভূত নিষ্প্রাণ পচনশীল ক্ষয়িষ্ণু পাহাড় মাত্র। কিন্তু মানব-সমাজের ইতিহাস হওয়া উচিত—সমাজের সার্বিক দিশারী, মানব জাতির উত্থান-পতনের দিক নির্ণয়ে অভ্রান্ত কম্পাস।

ইসলামের এই সাত খণ্ড ধারাবাহিক ইতিহাসে প্রশংসার কথা প্রচুর আছে। শুনতে কিছুটা খারাপ শোনালেও সত্য ও সংশোধনের খাতিরে অপ্রশংসনীয় অংশও কিছুটা তুলে ধরা দরকার। এই ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড 'মহানবী'তে লক্ষ্য করলাম—মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ)—সমগ্র মানব-সমাজে সূর্যের আলো দান করলেন। অতঃপর প্রথম দুই খলিফা তাঁকে পরিপূর্ণ ও সার্থকভাবেই অনুসরণ করলেন। পরবর্তী তৃতীয় খলিফার আমলের মধ্যভাগে ইসলামের রাজনীতির গগনাকাশে দেখা দিল দুষ্ট গ্রহের আবির্ভাব—যেমন বাইতুল মালের (কোষাগার) অপব্যবহার, অপরিমিত অর্থের সঞ্চয় এবং ঐ সঞ্চিত অর্থের অপচয়। জোতদার, জমিনদার, ভূস্বামী ও ধনী শ্রেণীর আবির্ভাব, সরকারী উচ্চ পদাধিকারগণের উৎপাত, ক্ষমতার অপব্যবহার, দরিদ্র ও গরিব মানুষদের প্রতি অবহেলা, তাদের অনুতাপ ও আহাজারী। ইসলাম যে পঞ্চজনকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে, তা যেন মাথাচাড়া দিল—অসত্যবাদী, অত্যাচারী, অহঙ্কারী, অপব্যয়ী বা অমিতব্যয়ী

ও অকৃতজ্ঞ, এটি ছিল বড়ই বেদনাদায়ক। চতুর্থ খলিফা এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ও পরিবেশকে অত্যন্ত সদিচ্ছার সাথেই নির্মূল করতে গিয়ে কায়েমী স্বার্থ ও ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে মহামানব নিজেই নির্মূল হয়ে গেলেন। মুসলিম সমাজে তাঁর মহৎ বেদনা মহৎ সার্থকতা লাভ করল না। মানব-সমাজ হারাল এক সিংহ-পুরুষকে। ইসলামের ইতিহাসে এ অধ্যায় বড়ই মর্মান্তিক।

উমাইয়া খেলাফত মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজ্য বিস্তারের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছে। আব্বাসীয়া খেলাফত মুসলিম-সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ গড়ে তুলেছে। উভয়েরই গৌরবগাঁথা ইসলামের ইতিহাসে চিরদিনই লিপিবদ্ধ থাকবে। তাই বলে ঐ দুই খেলাফতে অনৈসলামিক বা অসামাজিক কাজেরও অভাব ছিল না। অভাব ছিল না বলেই মহান আল্লাহ্ ঘটিয়েছিলেন মহাপতন। শূন্য হতে গড়ে ওঠা আরব খেলাফত আবার শূন্যতেই বিলীন হল। বেশ কিছু খলিফাদের চারিত্রিক অধঃপতনই বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের মূল ও মুখ্য কারণ ছিল, যে চরিত্রবল একদিন তাঁদের অভাবনীয়ভাবে গড়ে তুলেছিল। কোরআন—১৩ ঃ ১১

উমাইয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মোয়াবিয়া যেভাবে স্বয়ং মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের গণতন্ত্রকে বধ করে রাজতন্ত্রকে কায়েম করলেন, তা ছিল বড়ই অমানুষিক ও অনৈসলামিক কাজ। পবিত্র কোরআনের নিরিখেও তা কুফরী ব্যতীত নয়। নবীজীর গণতন্ত্র কোরআনেরই ঘোষণা। —৩ ঃ ১৫৯, ৪২ ঃ ৩৮। এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে ইসলামের ইতিহাসে হজরত আলির জীবনাবসান ও তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হোসেনের লোমহর্ষক নিধন ও সকরুণ পরিণতি অতি বড় কঠোর চিত্তকেও ব্যথিত করে। সিংহাসন লাভে প্রথম মারওয়ানের কু-চাল তাঁর গুরু-সকল ষড়যন্ত্রের জনক মোয়াবিয়ার বিদেহী আত্মাকে ভাল শিক্ষাই দিল। মানুষ মনে না রাখলেও, এটি ছিল ইতিহাসের কত বড় প্রত্যুত্তর। আবার উমাইয়া খেলাফতের খলিফা দ্বিতীয় ওমর আপন মহৎ কাজের দ্বারা 'খোলাফায়ে রাশেদীনের' পঞ্চম হওয়ার নজিরবিহীন মহাসম্মান মহাগৌরব অর্জন করেছিলেন। আবার কতিপয় খলিফা কেবল মদ্যপানে তৃপ্ত হতে না পেরে এবং নর্তকী ও গায়িকাদের নাচ-গানে প্রাণের সাধ মেটাতে না পেরে, কখনো মদের দরিয়া বানিয়ে সন্তরণের দ্বারা, কখনো নর্তকীদের সাথে নাচতে নেমে বিশাল সাম্রাজ্যের পতনকে কতই না ত্বরান্বিত করেছিলেন।

আব্বাসীয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠালগ্নে যে কয়েকজন মানুষের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত ঐ খেলাফত কোনদিনই জন্ম নিতো কি না কে জানে, তাঁরা ছিলেন আবুল আব্বাসের আপন পিতৃব্য জাবের যুদ্ধের বিজয়ী বীর উমাইয়া খেলাফতের ধ্বংসকারী, ভাবী খেলাফতের আশাধারী আব্দুল্লাহ ও তাঁর পুত্র এবং আবু মুসলিম ও বিশেষ করে আলি বংশ। পরবর্তীকালে খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর তাঁদের সাথে কেবল মাত্র বেঈমানিই করলেন না, বরং একের পর এক সাধু বেশে সংহারই করলেন।

ন্যায়-পরায়ণ খলিফা হারুণ-রশিদ তাঁর পিতার বন্ধু ও মন্ত্রী ইয়াহইয়াকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। তাঁর ছেলে ফজল ছিলেন খলিফার দুধ ভাই, বাল্যবন্ধু, হিতার্থী প্রধানমন্ত্রী, পরে তাঁর অন্য পুত্র জাফর ঐ পদটি অলঙ্কৃত করেন। পরমাসুন্দরী রাজকন্যা বোন আব্বাসার সাথে প্রধানমন্ত্রী জাফরের (কল্পিত) পরিণয়কে কেন্দ্র করে দূরে অতীতের খেলার সাথী, বহুকালের বাল্যবন্ধু, সান্ধ্যভ্রমণের একান্ত সঙ্গী, গভীর রাতের পরামর্শদাতা, রাজনীতির নিবিড়-ঘন রহস্যজালের মুক্তিদাতা সুপুরুষ, সুপণ্ডিত, সুরুচিসম্পন্ন জাফরের আচম্বিতে মৃত্যুদণ্ড এবং ভাই ফজল ও তাঁর সমগ্র বার্মেকি বংশকেই নিশীথ-রাতের গভীর আঁধারে কারাগারের নিবিড় অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে, এমনকি ধরার বুক হতে একেবারেই মুছে দিতে ইতিহাসের ন্যায়পরায়ণ খলিফার এতটুকুও মমতাবোধ জাগেনি। সর্বাপেক্ষা লোমহর্ষক ঘটনা—বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, বিশেষ করে জীবনের একান্ত বন্ধু চরম হতভাগ্য জাফরের প্রাণহীন দেহটিকে রাজধানী বাগদাদের প্রধান ফটকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে ঝুলিয়ে দিতে সমগ্র বাগদাদ কেঁপে উঠলেও বিবেকের বোধোদয়ে খলিফার বন্ধুর অন্তর ও মানব-হৃদয় কেঁপে ওঠেনি। হতভাগা জাফরের মৃতদেহকে এভাবে লাঞ্ছিত করার পূর্বেই কি ইতিহাসের ন্যায়পরায়ণ খলিফা আপন বিবেককেই লাঞ্ছিত করেননি? এটিই কি মহান নবীজীর শিক্ষা! ইসলামের শিক্ষা! এ তো ঘোর ইসলাম-বিরোধী কাজ। রাজ-আদেশ এমনই অনিবার্য, এমনই আশ্চর্য, এমনই রহস্যময়।

আর একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত, ইসলাম জগতে স্বাধীন চিন্তার জনক-স্থানীয় মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের কোনদিনই হাত কেঁপে ওঠেনি বিশ্ববিখ্যাত স্বাধীন চিন্তাবিদদের জেলে পুরতে। এমনকি বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিতেও। ইসলাম জগতের খ্যাতনামা চার চিন্তানায়ক অর্থাৎ চার ইমাম—আবু ইমাম হানিফা, ইমাম শাফি, ইমাম মালেকী ও ইমাম হাম্বল কেউই খলিফার নির্যাতন ও লাঞ্ছনা হতে নিষ্কৃতি পাননি। ক্রীতদাসী মারাজিলার গর্ভজাত সন্তান পুত্র খলিফা মামুনের নিকট আমিনের রাজমাতা সম্রাজ্ঞী জুবাইদার করুণা ভিক্ষা ইতিহাসের অবিস্মরণীয় সকরুণ শিক্ষা। খলিফা হারুণ পুত্রের নাম রাখলেন—'মহম্মদ'। ডাকনাম—আমিন। যে নামে তিনি খলিফা বলেও পরিচিত হলেন। নামের দিক থেকে পিতা একেবারেই মহানবী (সাঃ)-কে অনুসরণ করলেন, কিন্তু কামের দিকে পুত্র শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইতিহাসের নির্মম সাক্ষী হয়ে থাকলেন।

আব্বাসীয়া খেলাফতের ২২ নম্বর খলিফা (৯৪৪-৪৬) মুস্তাকফিকে নিয়ে তাঁর বুয়াইয়া বংশীয় আমীর মুইজ-উদ-দুল্লাহ মানব-সমাজের পবিত্র-বিবাহ বন্ধনে যে রোমাঞ্চকর রেকর্ড সৃষ্টি করলেন—নিছক রাজনীতির জন্য তা আজও অদ্বিতীয়। নিজে জোর করে খলিফা-তনয়াকে বিবাহবন্ধনে বাঁধলেন এবং

খলিফাকেও বাধ্য করলেন তাঁর (আমীরের) কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধতে। যার পশ্চাতে ছিল পঙ্কিল রাজনীতি। এত কিছু সত্ত্বেও খেলাফতের শেষ রক্ষা হল না।

বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের প্রধান কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটো ধীরে ধীরে আরো ঘনীভূত হতে থাকল। আমরা জানি মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) সপ্তম হিজরীতে (৬২৮-২৯) তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে ইসলামের দাওয়াত পাঠাচ্ছিলেন। মহানবীর 'দূত' পথিমধ্যে রোমান সম্রাট হারকিউলিসের গভর্নর সুর হাবিল কর্তৃক নিহত হন এবং বারবার এই নারকীয় ঘটনা ঘটতে থাকলে মহানবী মূতা অঞ্চলে অভিযান পাঠাতে মনস্থ করেন ও পাঠান। কেননা মহানবীর চোখে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার স্বার্থে দূতের অবমাননা, দূত হত্যাটা ছিল ক্ষমাহীন অপরাধ ও পাপ। এই মূতা অভিযানে বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ বিজয়ী বেশে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে মহানবী তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইসলামের চোখে 'দূত হত্যা' ক্ষমাহীন অপরাধ ও পাপ। অথচ ১২১৮ খ্রীস্টাব্দে খাওয়ারিজমের শাহ মহম্মদ কর্তৃক ঘটল একটি অবাঞ্ছিত ও অনৈসলামিক ঘটনা 'দূত হত্যা'। এক দল মঙ্গোলিয়া বাণিজ্যোপলক্ষে খাওয়ারিজমে আসলে সেখানকার একজন অধস্তন শাসনকর্তা তাদের গুপ্তচর বৃত্তির দোষে দোষী সাব্যস্ত করে মালপত্র বাজেয়াপ্ত করে তাদের প্রাণদণ্ড দেন। এই সংবাদ দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খানের নিকট পৌঁছালে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে খাওয়ারিজমের শাহ মহম্মদের নিকট দূত পাঠিয়ে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। নির্বোধ শাহ চরম গোঁয়ার্তুমী ও নিরেট নির্বুদ্ধিতার সাথে আপন বিবেকের মাথা খেয়ে ঐ দূতকেও বধ করার নির্দেশ দেন। এই ভয়াবহ সংবাদে চেঙ্গিজ খান আর স্থির থাকতে না পেরে দশ লক্ষ উন্মাদ অনুচর-সহ ঝড়ের বেগে শাহকে জীবনের মতো শিক্ষা দিয়ে দিলেন। শাহ আপন ভুলে, আপন পাপে ডুবলেন। কিন্তু চেঙ্গিজ খানও সীমা লঙ্ঘন করলেন—কয়েক লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে (শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা) অতীব নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে।

অনুরূপ ঘটনা ঘটল আব্বাসীয়া শেষ খলিফার জীবনে। হালাকু খান যখন তাঁর নিকট সাহায্য চেয়ে দূত পাঠালেন, তখন তিনি সেই দূতগণকে সাহায্য করার কথা না দিয়ে অত্যন্ত অপমানিত ভাবে তাড়িয়ে দেন। একদিন ইরান সম্রাটও এইরূপ ঘৃণিত আচরণ করেছিলেন মহানবীর দূতের সাথে। এটিও ছিল ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ কাজ দূতের অপমান, কাম্য। ছিল উত্তম বাক্য।—২ঃ২৬৩ হালাকু খান রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সমগ্র খেলাফতকেই উলটিয়ে দিলেন। এটাও ছিল ভয়াবহ সীমা অতিক্রম। পবিত্র কোরআন মানবমণ্ডলীকে নিষেধ করেছে—"তোমরা সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না।" —২ঃ১৯০, ৩ঃ১৯২, ৫ঃ৮৭, ৭ঃ৫৫, ১১ঃ৪৪, ২৫ঃ১৯, ২৭ঃ৫২, ৩৭ঃ৩০, ৫২, ৬৬।

এই খেলাফতের শেষ বা ৩৭ নম্বর খলিফা মুস্তাসিম (১২৪২-৫৮) নিজ চারিত্রিক নানা দুর্বলতা-সহ এতই শিয়া ও পণ্ডিতবিদ্বেষী ছিলেন, আলি বংশ ও পণ্ডিতকুলের অর্থাৎ আলেম-উলামাগণের ধ্বংসের জন্য প্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলেন। সেদিনের সমাজ-জীবন অনৈসলামিক ও অসামাজিক কাজে একেবারেই ডুবে গিয়েছিল। ঐ ডুবন্ত সমাজকে উদ্ধারের জন্য বা পতনোন্মুখ সমাজকে অবক্ষয়ের হাত হতে রক্ষা করার নিমিত্ত আলেম-উলামাগণ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন—এই ছিল তাঁদের অপরাধ। পাপের কলসী পূর্ণ হয়ে এলো। শেষ ঘণ্টা বাজতে আর বেশি দেরি হল না। খলিফার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নিজেই শিয়া, অথচ তাঁর আমলেই শিয়াদের দাসে পরিণত করা হচ্ছিল। তিনি আর সহ্য করতে না পেরে অসভ্য তাতার নেতা হালাকু খানকে গোপনে জানালেন আব্বাসীয়া খেলাফতকে চিরবিদায় দেওয়ার জন্য। রাগে-রোষে হালাকু খানও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। মুসলিম সেনাপতি মুসা ও তারিক কর্তৃক স্পেন বিজয়ের মূলেও ছিল এই একই কারণ, একই হেতু—জুলুম, অত্যাচার, চারিত্রিক অধঃপতন। বিধাতা কর্তৃক বিশ্ব-ইতিহাসের প্রাঙ্গণে ও বিশ্বজোড়া বিস্তৃত প্রান্তরে দুর্লভ মানব-জীবনের সাধে গড়া সাধনায় গড়া সমাজকে একটি সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইতিহাসের অতি নিষ্ঠুর, অতি নির্মম, অতি নির্জলা পুনরাবৃত্তি ঘটল বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের পতন হতে সুবিশাল আব্বাসীয়া খেলাফতের প্রাণচাঞ্চল্যকর, হৃদয়বিদারক ভাষাহীন মর্মান্তিক পীড়াদায়ক পতনে। অসত্যবাদী, অত্যাচারী, অহংকারী, অকৃতজ্ঞ ও অমিতব্যয়ী নির্বোধ খলিফা মুস্তাসিম সপারিষদে, সপরিবারে শিশু-নারী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা-সহ এক বিভীষিকাময় ষোল লক্ষ মানুষের বর্ণনাতীত বধ্য-ভূমিতে বধ হলেন। এও ছিল মহাপাপেরই মহাপতন। বাগদাদে কয়েক শতাব্দীর স্বাধীনতার সূর্য, বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব-রবি অস্তমিত হল।

কোরআন—৪ঃ ৩৬, ৩৭, ৬ঃ ১৪১, ৭ঃ ৪০, ৪১, ৮ঃ ৮, ১৬ঃ ২২, ২৩,
১৭ঃ ২৭, ৩১ঃ ১৮, ৩২ঃ ১৫, ৪০ঃ ২৭, ৫৭ঃ ২৩।

কিন্তু আজও অস্তমিত হয়নি—নবী বংশ, আলি বংশ, যা কোনদিনই হবে না, অস্তমিত হননি আলেম-উলেমাকুল। যাঁরা গৌরবে আছেন, সগৌরবে থাকবেন চিরদিন।

বাগদাদের এই বিভীষিকাময় ঘটনার পর যদি আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হতো, তাহলে হয়তো বাগদাদের এই কাহিনীও আদ, সামুদ ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের মতো আল্লাহর বাণীতে স্থান পেতো। এটা ছিল এমনই মর্মান্তিক, এমনই করুণ ও এমনই পৈশাচিক নারকীয় দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। —৮৫ঃ ১৭, ১৮, ৯১ঃ ১১। তবে যাই হোক, খাওয়ারিজমের শাহ যদি অতি মূর্খামি করে বাগদাদের খলিফার সহ-মিলনের ও সহ-অবস্থানের প্রস্তাবকে দিবাস্বপ্ন যোগে প্রত্যাখান না করতেন, তাহলে মোঙ্গল গোষ্ঠী কোনদিনই এগিয়ে আসতেও সাহস পেতো না। শাহ বিরামবিহীন

চেষ্টা চালাচ্ছিলেন বাগদাদকে পদানত করতে। কিন্তু মোঙ্গল নেতা তাঁদের এই দূরত্ব ও দুর্বলতা বুঝতে পেরেই শাহকেই প্রথম গ্রাস করল। অদূরদর্শী, অতিলোভী, আগ্রাসী শাহের এই সমুচিত শিক্ষা ও শাস্তি পাওনা ছিল। বাগদাদের শেষ খলিফাও শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে অতিরিক্ত ঘৃণ্য ব্যবহার করার জন্য তাঁর সেনা-বাহিনীতেও বিশৃংখলা দেখা দেয়, জনগণও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিষ্ঠুর মোঙ্গল নেতা এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল। মানব-ইতিহাসে বাগদাদের পতনটাই কেবল মাত্র বড় কথা নয়, অসংখ্য মানুষের জীবনাবসান মোঙ্গল নেতা হালাকু খানকে বীর হতে অতীব বর্বর ও পশু-মানবে আখ্যায়িত করেছে। কোন জন্তু-জানোয়ার ও অসংখ্য জীবের প্রতি এরূপ করে না।

"হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর, যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো ও যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা প্রদান কর। তোমারই হতে কল্যাণ নিহিত। নিশ্চয় তুমি সর্বোপরি সর্ব-শক্তিমান।" কোরআন—৩ : ২৬

নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির (উত্থান ও অবনতির জন্য) তার অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অন্তরের (চরিত্রের) অবস্থার পরিবর্তন করে।" কোরআন—১৩ : ১১

ওসমান গনী

নিবেদন

এখানে দু'-একটি কথার উল্লেখ করতে হয় যদিও সেটি অন্তর ও মনের অনুল্লেখিত অধ্যায়। পবিত্র কোরআনের অনুবাদ হতে সাত খণ্ড ইসলামের ইতিহাস সমাপ্ত করতে বহু জ্ঞানী ও গুণীর, বহু লেখক-লেখিকার বহু সাহায্য পেয়েছি। বহু পাঠক-পাঠিকা, বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, অনুরোধ আমাকে এই দীর্ঘ ও দুর্গম পথে কম শক্তি জোগায়নি। এই অধ্যায়ে পিতৃতুল্য খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ মিঞা ও শ্রদ্ধেয় মহসীন ভাই ও লিলি ভাবী (বীরভূম) এবং আমার বাল্যকালের সত্যদ্রষ্টা ঋষি শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের (শান্তিনিকেতন) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ প্রথম প্রকাশের পথে বন্ধু জনাব নূরুল ইসলামের অবদান, দ্বিতীয় সহৃদয় বন্ধু এস. এম. রফিক সাহেবের ভূমিকা ভূয়সী প্রশংসার দাবিদার। ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশের প্রথম দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার মহাশয়ের শুভেচ্ছা-বাণীও চরম উৎসাহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য সচিব বন্ধুবর অধ্যাপক ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে প্রকাশক শ্রীসুনীল ভট্টাচার্যকে পেয়ে উপকৃত হই। দু'জনেরই নিকট আমি বড়ই কৃতজ্ঞ।—৩৪ : ১৭, ১০০ : ৬

আমার বর্তমান প্রকাশক জনাব আলহাজ্ব আবুল কালাম মল্লিক সাহেবের ইসলামি প্রকাশনায় যে আন্তরিক আগ্রহ, যে অকৃত্রিম ইচ্ছা, তা নিছক ব্যবসাভিত্তিক নয়। একটি মহৎ বেদনাতে তাড়িত হয়েই তিনি এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। হাজী সাহেবের এই মহৎ চিন্তাপ্রসূত আবেদন ও মহৎ বেদনাজাত অবদান অনগ্রসর জাতির অসার অস্থি ও মজ্জাকে সুসার ও সজীব করতে ইতিহাসের এই অনুল্লেখিত অধ্যায়ে সুদূরকালের গর্ভেও দূর অতীতের এই অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে জাতীয় জীবনে একদিন তরঙ্গাভিঘাত জাগিয়ে তুলবে। তাঁকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ্ তাঁকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী করুন।

তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও জামাতা স্নেহভাজন আব্দুর রহমান মল্লিক ও জনাব ওসমান গনী আমার এই দীর্ঘ কাজে সকল উৎপাত ও অনেক অহেতুক আবদার সহ্য করে আমাকে চির মুগ্ধ করেছেন। প্রুফ রিডার শ্রীদিলীপ সুর, মুদ্রণকারী শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ, প্রচ্ছদ শিল্পী কুমার অজিত এবং অন্যান্য সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই যজ্ঞশালায় যাদের নামোল্লেখ না করে পারি না, যারা অকাতরে অম্লান বদনে সুদীর্ঘ দিন ধরে আমাকে এই কাজে সাহায্য করলো, তাদের অন্যতম স্নেহ-ভাজন ভাইপো—মোহঃ ইয়াসীন (মন্টু) ও পিয়ার আলি এবং পুত্রকন্যা মণি ও চুণি এবং আপনজন মম (মমতাজ), আরো অনেকে।

জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় গুরু-দায়িত্বের সুপ্ত স্বপ্ন ও দীর্ঘ সাধনায় জীবন-সঙ্গিনী শওকত আরা গনীর (সেতারা) সর্বমুখী সাহায্য ব্যতীত এর কোন সম্মানজনক সমাধান হতো কি না কে জানে! জীবনের স্বপ্ন হয়তো স্বপ্নই থেকে যেত মরণেও।

সঙ্গিনী সুখের মূল স্বর্গ সুজয়
জগৎ যাতনা ফের নরক নিশ্চয়।

একদিন যে মহান আল্লাহকে মাথায় রেখে, মনের গোপন কোণে স্মরণ করে, দুরু দুরু বুকে দুর্বল ভাঙা তরীটিকে সাধনার গভীর খাতে ভরা বর্ষার প্রবল-প্লাবিত খরস্রোত নদীতে ভাসিয়ে ছিলাম, প্রতি পলকে যাঁর করুণা অতি ভীত-বিহ্বল চিত্তে কামনা করেছিলাম, আজ তাঁরই অফুরন্ত করুণাবলে সেই জীর্ণ, শীর্ণ ও দীর্ণ ভাঙা তরীটি তীরে ভিড়েছে।

কোরআন—১৫ : ৫৫, ৫৬, ৩৯ : ৫৩, ৪৩ : ৬৮

হে মহান আল্লাহ্ :

অজানা জোয়ার জলে দিবসযামী
জীবন-তরণী মোর সুদূরগামী
মাল্লা তোমারে জেনে যাত্রী আমি।
মম হাতে সে বিন্দু তুমি যে পাথারে
উতারিবো ভয় নাই আমি পারাবারে।
তুমি যদি থাক মোর জীবন-তরীতে
কোন ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

কোরআন—৩ : ১৩৯, ৯ : ৪০

জ্ঞানদানকারী রূপে তুমিই যথেষ্ট—২ : ৩২
অভিভাবক রূপে তুমিই যথেষ্ট—২২ : ৭৮
সাহায্যকারী রূপে তুমিই যথেষ্ট—৪ : ৪৫
সকল কার্য সম্পাদনে তুমিই যথেষ্ট—৩৩ : ৩
সমস্ত প্রশংসা তোমারই—১ : ১, ৩৭ : ১৮২

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা—১. ১. ১৯৯৩

ওসমান গনী

শুভেচ্ছা বাণী

[পাণ্ডিত্যে প্রখর, ব্যক্তিত্বে স্নিগ্ধ, ব্যবহারে বিরল, বিনয়ে আচার্য, কর্তব্যে অটল, নিরাভরণ মনীষা ডঃ রথীন্দ্রনারায়ণ বসু]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ওসমান গনীকে বেশ কয়েক বছর পূর্বে বাংলা ভাষায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্যনির্ভর সহজ-সরল পাঠ্যপুস্তক হিসাবে কয়েক খণ্ডে ইসলামের ইতিহাসের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারাবাহিকতা প্রণয়নের জন্য সেদিনের কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী মনীষা একটি গৌরবজনক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। ডঃ গনী তাঁর দীর্ঘদিনের নিরলস কঠোর সাধনা দ্বারা আজ ঐ ধারাবাহিক ইতিহাস সাত খণ্ডে সমাপ্ত করে ঐ গৌরবজনক গুরুদায়িত্বের সম্মানজনক সমাধান করলেন।

বহু বিদগ্ধজনের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ডঃ গনী রচিত এই সাত খণ্ড ইসলামের ইতিহাসটা আসলে কি! মহামানব হজরত মহম্মদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত একটি মহা উচ্ছৃঙ্খল অধঃপতিত অন্ধকারাচ্ছন্ন শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাসে অশান্তির আগুনে ভস্মপ্রায়, শতধাবিভক্ত, শত কুসংস্কারে কুঅভ্যাসে জর্জরিত, শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, সভ্যতা ও সংস্কৃতিহীন, মনুষ্যত্ব ও মেরুদণ্ডহীন নিঃস্ব মরুচারী আরব, বেদুইন আরব; যাদের 'চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন' হতো, সেই সমাজের বিশ্বজোড়া এক অবিশ্বাস্য উত্থান-পতনের লোমহর্ষক ও অতি চাঞ্চল্যকর সাড়াজাগানো বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন হতে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ সৃষ্টিকারী ইউরোপকে আলোদানকারী এক অভূতপূর্ব মানব-ইতিহাসই (৫৭০-১২৫৮ খ্রীঃ) ইসলামের ইতিহাস নামে বিশ্ব ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই সাত খণ্ড তারই যথার্থ পর্যালোচনা।

যে-সমস্ত খ্যাতনামা বিদগ্ধজন দূর অতীতে অফুরন্ত ও আন্তরিক অনুপ্রেরণা সহ একদিন তাঁকে এই কাজে নামিয়েছিলেন; বড়ই দুঃখ ও বেদনার কথা, আজ তাঁদের দু-একজন ব্যতীত আর কেউই নেই। তাই আমি আজ আমার ও তাঁদের পক্ষ হতে সংগ্রামী লেখককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে বহু কিছু করেছেন ও বহু

মূল্যবান পদক্ষেপও নিয়েছেন। দীর্ঘদিনের বিরামবিহীন একটানা শ্রমে ও সাধনায় গড়া ডঃ গনীর মূল্যবান ধারাবাহিকটিও সরকারী পদক্ষেপেরও একটি সার্থক সংযোজন ও পূর্ণ পরিপূরক বলে মনে করি। সত্যাশ্রয়ী সাধনাপ্রেমী নিষ্ঠাবান অধ্যাপককে জানাই সাধুবাদ।

ডঃ গনী খোলামনে খোলাপ্রাণে বহু অজানাকে, বহু অতিরঞ্জনকে, বহু অবাস্তবকে দূর অতীতের অন্ধকার হতে বর্তমানের জ্ঞানালোকে এনে ইসলামের ইতিহাসের প্রকৃত মূল্যায়ন করেছেন নিষ্ঠার নিরিখে ও নির্ভেজাল ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ মানদণ্ডে। দক্ষ ইতিহাসস্রষ্টা ও নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে মহাকালের কঠিন কষ্টিপাথরে যাচাই করতে গিয়ে তিনি কাউকেই ছেড়ে কথা বলেননি।

চিন্তার মুক্তিতে ও জড়তাবিহীন জীবন-জিজ্ঞাসায় আপসহীন সংগ্রামী সাধক ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামিকে শুধু ঘৃণার চোখেই দেখেননি, বরং মানব সমাজের উত্থান ও উন্নতির সোপানে এবং সত্য ও সুন্দরের পথে এদের পথের কণ্টক ও প্রতিবন্ধক বলেই মনে করেছেন। দেশ ও দশের মাঝে, নানা ধর্ম, নানা বর্ণের মাঝে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে, সংহতিতে, জাতীয় ঐক্যে এবং জাতীয় জীবনের গভীর হতে গভীরতম সংকটকালে ও আন্তর্জাতিক বোঝাপাড়ায় সুদূরকালের গর্ভেও আমাদের এই বিবদমান মানবসমাজে লেখকের মহৎ বেদনা মহৎ সার্থকতা লাভ করুক। জাতীয় সংহতির অঙ্গনে ও বিশ্বশান্তির প্রাঙ্গণে এ আমার একান্ত আন্তরিক কামনা।

ডঃ গনীকে আমি বহুদিন ধরেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিষ্ঠাবান ছাত্রছাত্রী দরদী অধ্যাপক রূপে জানি ও চিনি। তাঁর প্রভূত কাজের সাথেও আমার কিঞ্চিৎ পরিচিতিও ঘটেছে। তাই তাঁর মতো লেখক সম্পর্কেও আজ আমার মনে একটি কথা সাড়া দেয়, দীর্ঘদিনের এই ধারাবাহিক অপূর্ব কাজ ও বিশাল কোরআনের বঙ্গানুবাদ ও আধুনিকতম যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দ্বারা ডঃ গনী গতানুগতিক 'অধ্যাপনার পেশা' থেকে 'জীবনের স্থির ব্রতে' এবং **'Professional Scholar'** থেকে **'Dedicated Scholar'**-এ নিজেকে উন্নীত করতে পেরেছেন। আমি জানি 'জীবনের স্থির লক্ষ্য'কে 'জীবনের মহাধ্রুব রূপে' দেখতে না পারলে এটা হয় না।

আমি আশা করি, সকল শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, অগণিত ছাত্র-ছাত্রী, গবেষকবৃন্দ ও পাঠক-পাঠিকাগণ ডঃ গনীর এই সুদীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ জীবনের অনবদ্য অনন্যসাধারণ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত ইসলামের ধারাবাহিক সাত খণ্ড ইতিহাস পড়ে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ও ইতিহাসকে জানার ও বোঝার সুযোগ পাবেন, উপকৃত হবেন ও আনন্দ পাবেন।

এই ধারাবাহিকটি প্রতিটি বাড়িতে রাখার মতো, ও প্রতিটি জিজ্ঞাসু মানুষের জানার মতো মহাসম্পদ। সর্বশেষে লেখক ও প্রকাশক উভয়কেই জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

স্বাঃ অধ্যাপক শ্রীরথীন্দ্রনারায়ণ বসু
উপাচার্য
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সুচীপত্র

☐ প্রথম পর্ব ☐

আব্বাসীয়া খেলাফতের সময় স্বাধীন রাজবংশের পূর্ব অধ্যায়

প্রথম অধ্যায় ☐ সূচনা ১—২৬

আব্বাসীয়া খেলাফতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আবুল আব্বাস—সিংহাসনে আরোহণ, বিদ্রোহ দমন, প্রশাসন, চরিত্র।

আবু জাফর আল-মনসুর—সিংহাসন লাভ, বিদ্রোহ দমন, আব্দুল্লাহ ইবন আলির বিদ্রোহ ও পতন, আবু মুসলিমের বিদ্রোহ ও পতন, সানবাদের বিদ্রোহ, রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন, খোরাসানের বিদ্রোহ দমন, তাবারিস্তানে বিদ্রোহ দমন, আলি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন, মহম্মদ ও ইব্রাহিমের বিদ্রোহ, আলি বংশের ইমামদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার, উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ দমন, হিরাত ও মাসুলের বিদ্রোহ, সাম্রাজ্য বিস্তার—তাবারিস্তান ও গিলান অধিকার, এশিয়া মাইনর, স্পেন অভিযান, শাসনব্যবস্থা বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা, শাসন প্রণালী, গুপ্তচর ও বদলি প্রথা, পারস্য প্রভাব, বিচার বিভাগ, জনহিতকর কার্যাবলী, খলিফার মনোনয়ন, খলিফার মৃত্যু, চরিত্র, মনসুরের কৃতিত্ব, বিদ্রোহ দমন, রাজ্য সম্প্রসারণ, দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ, সুযোগ্য শাসক, আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির গুণগ্রাহী মনসুর, পারস্য প্রভাব, আব্বাসীয় সভ্যতার জনক, স্থাপত্য ও কারুশিল্প।

দ্বিতীয় অধ্যায় ☐ আল-মাহদি ও আল-হাদি ২৭—৬১

আল-মাহদি—উদারনীতি, বিদ্রোহ দমন—মুকান্নার, জিন্দিকের, বাইজাণ্টাইনের, উত্তরাধিকারী মনোনয়ন।

আল-হাদি—সিংহাসন লাভ, বিদ্রোহ দমন, হাদি ও মাতা খায়জুরান।

বাগদাদের স্বর্ণযুগ : হারুণ-আর-রশিদ—স্বর্ণযুগ, প্রাথমিক কার্যাবলী, বিদ্রোহ দমন—মসুলের, ওয়ালিদ ও লায়লার, গ্রীকদের, আলিপন্থীদের, মুদারীয় ও হিমারীয়, আফ্রিকায় আগলবী শাসন, মন্ত্রী ও মনোনয়ন, হজব্রত পালন, মুসলিম-বাইজাণ্টাইন দ্বন্দ্ব, আইরিনের সন্ধিপত্র, হারুণের

'রশিদ' উপাধি লাভ, বাইজান্টাইনের বিপর্যয়, আইরিনের সিংহাসনচ্যুতি, নাইসিফোরাসের পত্র, প্রত্যুত্তর, যুদ্ধাভিযান—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ফলাফল, বার্মেকি বংশের উত্থান ও পতন, জাফর বার্মেকি, খালিদ বিন জাফর, ইয়াহিয়া বিন খালিদ, ফজল বিন ইয়াহিয়া, জাফর বিন ইয়াহইয়া, মুসা ও মহম্মদ, বার্মেকিদের পতন, অনৈসলামিক প্রভাব, শিয়া প্রবণতা, সুন্নী মতবাদের বিরোধিতা, অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, আরব আমীরদের অসন্তোষ ও ঈর্ষা, আব্বাসা ও জাফরের গোপন প্রণয়, খোদ খলিফার রোষদৃষ্টি, রাফির বিদ্রোহ, হারুণের জীবনাবসান, চরিত্র—ধর্মভীরুতা, বদান্যতা, সন্দেহপ্রবণতা ; কৃতিত্ব—শ্রেষ্ঠত্ব, অভ্যন্তরীণ নীতি, বৈদেশিক নীতি ; সংগঠন—শাসনব্যবস্থা, জনকল্যাণকর কার্যকলাপ, কূটনীতিবিদ, প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে ভরা বাগদাদ, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উৎকর্ষতাসাধন, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য ও কাব্য, আরবোপন্যাস, ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রভাব, অনুবাদ, চিকিৎসাশাস্ত্র, সংগীত, স্থাপত্যশিল্প ও শিক্ষা, উপসংহার।

তৃতীয় অধ্যায় □ আল-আমিন (মহম্মদ) ৬২—৭৩

সিংহাসনারোহণ, গৃহযুদ্ধ, মনোনয়নে দ্বৈতভাব, ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা, দলিল সম্পাদিত, শিক্ষাগত পার্থক্য, চারিত্রিক পার্থক্য, আরব-পারস্য দ্বন্দ্ব, আমিনের স্বৈরাচারিতা, দুই মন্ত্রীর সংঘাত, ভ্রাতাদের অপসারণ, পুত্রদের মনোনয়ন, গৃহযুদ্ধ, বাগদাদ অবরোধ, আমিনের জীবননাশ, গৃহযুদ্ধের ফলাফল, সফলতার কারণ—মামুনের চরিত্র, আমিনের মন্ত্রীর অযোগ্যতা, আমিনের বিশ্বাসঘাতকতা ও অনভিজ্ঞ সেনাপতি, অমিতব্যয়িতা, পারস্যবাসীদের সমর্থন, আমিনের চরিত্র।

চতুর্থ অধ্যায় □ আল-মামুন ৭৪—৯৭

জন্ম, খেলাফতের প্রথম ৬ বছর ও পরবর্তী ১৪ বছর, ফজলের শাসনকার্য পরিচালনা, বিদ্রোহ, আরবে অরাজকতা, হারসামার প্রাণনাশ, বাগদাদে বিদ্রোহ, আলি-আর-রাজির মনোনয়ন, ফজল ও রাজির মৃত্যু, ইব্রাহিমের আত্মসমর্পণ, স্বর্ণযুগের সূচনা, নসরের বিদ্রোহ দমন, ইয়েমেন, খোরাসান ও বাবেকের বিদ্রোহ ও খলিফাকে হত্যার চক্রান্ত, সিসিলি ও ক্রীট দখল, বুরানের সঙ্গে মামুনের বিবাহ, মামুনের মনোনয়ন দান ও মৃত্যু, চরিত্র, চরিত্রের বিশ্লেষণ, কৃতিত্ব—স্বর্ণযুগের স্রষ্টা,

হারুণ ও মামুন, চরিত্রে প্রভাব, ধর্মমত, জ্ঞানচর্চা, প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক, বায়তুল হিকমা, অনুবাদ, হুনাইন-ইবন-ইসহাক, ইবন মাতার, মানমন্দির, কলাবিভাগ, কোরআন ও হাদিস, মতবিরোধ, হস্তলিপি ও ইতিহাস, শিক্ষার সম্প্রসারণ ও কাগজের কারখানা, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য, মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ।

পঞ্চম অধ্যায় □ আব্বাসীয় খেলাফতের শেষার্ধ ৯৮—১০৪

আল-মুতাসিম, আল-ওয়াসিক, আল-মুতাওয়াক্কিল।

ষষ্ঠ অধ্যায় □ খলিফা মুনতাসির হতে মুত্তাফি পর্যন্ত ১০৫—১১০

আল-মুতাজিদ, মুকতাফি, মুকতাদি, কাহির, আর-রাদি বিল্লাহ, মুত্তাফি, পরবর্তী খলিফাগণ।

□ দ্বিতীয় পর্ব □

আব্বাসীয়া খেলাফতের সময় স্বাধীন রাজবংশগুলির উদ্ভব

প্রথম অধ্যায় □ পশ্চিম অঞ্চল ১১৩—১১৫

পশ্চিমাঞ্চলের স্বাধীন রাজবংশগুলি—স্পেন, প্রথম শিয়া রাজবংশ, আগলবী বংশ, তুলুনী বংশ, ইখশিদী বংশ, হামদানি বংশ।

দ্বিতীয় অধ্যায় □ পূর্ব অঞ্চল ১১৬ -১২০

তাহিরী বংশ, সাফফারী বংশ, সামানী বংশ, জিয়ারী বংশ, গজনবী বংশ, সুলতান মাহমুদ।

তৃতীয় অধ্যায় □ বুয়াইয়া বংশ ১২১—১৩১

অভ্যুত্থান—আবু সুজা বুয়াইয়া, মুইজ-উদ-দৌলাহ, ইজ-উদ-দৌলাহ, অজুদ-উদ-দৌলাহ, শাহানশাহ, নজিরবিহীন বিবাহ, খেলাফত হরণ, নহবত, জনহিতকর কার্যকলাপ, সামসু-উদ-দৌলাহ, শরাফ-উদ-দৌলাহ, আবু নসর-বাহা-উদ-দৌলাহ, বুয়াইয়া যুগের জ্ঞানচর্চা, পতন, পতনের কারণ—শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব, আরব-পারস্য প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার দম্ভ, সাক্ষীগোপাল খলিফা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, গোত্রীয় কলহ।

চতুর্থ অধ্যায় □ সেলজুক বংশ ১৩২—১৪৯

অভ্যুত্থান, বংশ-পরিচয়, যুদ্ধে জয়লাভ ও দলপতি নির্বাচন, তুঘ্রিল বেগ, তুঘ্রিলকে আমন্ত্রণ, আল-বাসাসিরির বিদ্রোহ, তুঘ্রিলের সংবর্ধনা, কৃতিত্ব, আলপ-আরসালান, বাইজান্টাইনদের সঙ্গে সংঘর্ষ, মানজাফার্দের যুদ্ধ, গুরুত্ব, চরিত্র ও কৃতিত্ব, মালিক শাহ জালালুদ্দৌলাহ, খলিফা মুকতাদির, নিজাম-উল-মুলক, শাসন সংস্কার, সিয়াসতনামা, নিজামিয়া মাদ্রাসা, মানমন্দির, নিজামের আকস্মিক মৃত্যু, মালিক শাহ ও নিজামের মৃত্যুর ফল, জনহিতকর কার্যাবলী, পরবর্তী সেলজুকগণ, অবদান, রাজনৈতিক অবদান, সামাজিক অবদান, ধর্মীয় অবদান, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবদান, সাংস্কৃতিক অবদান, গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়, হাসান আল-সাব্বাহ।

□ তৃতীয় পর্ব □

আব্বাসীয় খেলাফতের শেষ লগ্ন

প্রথম অধ্যায় □ শেষ প্রহরে শেষ চেষ্টা ১৫৩—১৫৬

খলিফা আল-নাসির—খাওয়ারিজমের শাহকে আহ্বান, মঙ্গল নেতা চেঙ্গিজকে আমন্ত্রণ, আব্বাসীয় খেলাফতকে ধ্বংসের পরিকল্পনা, চেঙ্গিজ খানের আক্রমণ, ঘাতক হাসানের আনুগত্য স্বীকার, ফতুয়া সংঘের প্রতিষ্ঠা, নাসিরের মৃত্যু।

দ্বিতীয় অধ্যায় □ অন্তিম শয়ানে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ১৫৭—১৫৮

আল-মুতাসিম।

তৃতীয় অধ্যায় □ বিশাল আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের অন্তরালে বিবিধ কারণ ১৫৯—১৭৬

সূচনা, ইবনে খালদুনের নীতি, অযোগ্য উত্তরাধিকারীগণ, সাম্রাজ্যের বিশালতা, স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি, দুর্বল সেনাবাহিনী, সুনির্দিষ্ট মনোনয়ন নীতির অভাব, গোষ্ঠীগত কলহ, ধর্মীয় বিভেদ, পারস্য বিজয়, খলিফাদের নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক অচলাবস্থা, আশ্রয়দাতা আশ্রিত, আমীর-উল-

উমারাদের ঔদ্ধত্য, স্বাধীন খেলাফতের উৎপত্তি, বুয়াইয়াগণের প্রভুত্ব, সেলজুক বংশের পতন, জনগণের অসন্তোষ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, হালাকু খানের আমন্ত্রণ ও আক্রমণ, ফলাফল।

☐ চতুর্থ পর্ব ☐

আব্বাসীয়া খেলাফতের শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থা

প্রথম অধ্যায় ☐ শাসনব্যবস্থা ১৭৯—১৯৫

বৈশিষ্ট্য, খলিফার কর্তৃত্ব, মন্ত্রণা পরিষদ, হাজিব, জল্লাদ ও জ্যোতিষী, উজির, প্রশাসনে সরকারী বিভাগ, সামরিক বিভাগ, সেনাধ্যক্ষগণের জায়গীর, উপসংহার, বিচার ও অন্যান্য বিভাগ, পত্র-বিনিময় বিভাগ, দিওয়ানুল খাতাম, দিওয়ানুল সুরতা, দিওয়ানুল-নজর বিন মাজালিম, অন্যান্য বিভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ☐ আব্বাসীয় যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১৯৬—২০৬

সামাজিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য, আধুনিক আরবে মিশ্র জাতির সৃষ্টি, প্রাচীন আরবে মিশ্র জাতি, সমাজে নারীর মর্যাদা, বিবাহ, ভদ্রসমাজ, আসবাবপত্র, পোশাক, ভোগ-বিলাস, স্নানাগার, শিকার ও খেলাধুলা, আব্বাসীয় যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা।

তৃতীয় অধ্যায় ☐ অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ২০৭—২১৪

বাগদাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য পাক ভারত, চীন, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ইউরোপ-আফ্রিকা, ব্যাংকব্যবসা, সওদাগরগণ, দরদেশগণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান উৎস—শিল্প, কাপড়, কার্পেট, কাচ, কাগজ, ধাতবশিল্প, কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য, খাল ব্যবস্থা, ফুল ও ফুলের বাগান।

চতুর্থ অধ্যায় □ আব্বাসীয় যুগের সাংস্কৃতিক গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিল্পকলার উৎকর্ষতা ২১৫—২৫০

পটভূমিকা, সূচনা ও স্বর্ণযুগ, জ্ঞানজগতের দিগন্ত উন্মোচন, জ্ঞানসাধনার প্রথম শতাব্দী, অমর অনুবাদকগণ, গ্রীক দর্শনের সংরক্ষণকারী, ইউরোপ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে, ভাবধারার বাহন আরবী, দর্শন, ইসলামি দর্শন, দার্শনিক আল-কিন্দি, আল-ফারাবি, ইবনে সিনা, ইখওয়ান উস-সাফা, চিকিৎসা জগতের পথিকৃত, প্রবাদ পুরুষগণ—জাবির বিন হাইওয়ান, সিনান-বিন-সাবিত, আত-তাবারি, আর-রাজি, আল-মাজুসি, ইবনে সিনা, ইবনে ঈসা, ইবনে আখি, চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা, জ্যোতিষ বিদ্যা, মানমন্দির, যন্ত্রপাতি ও জ্যোতির্বিদগণ, আল-বেরুনি, ওমর খৈয়াম, তুসী, আল-মাশার, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, প্রাণিতত্ত্ব ও খনিজ বিজ্ঞান, ভূগোল, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রথম ভূ-মানচিত্র, ভূগোল গ্রন্থ ও ভৌগোলিকগণ, খুরদাজবিহ, আল-ইয়াকুবি। ইবনে রুস্তা আল-হামাদানি, কুদামা, ইস্তাখরি ও ইবনে হাওকাল, আল-মাকদিসী, আল-হামারি, আল-মাসুদি, আল-বেরুনি, ইবনে বতুতা, ইতিহাস চর্চা, ইতিহাস লেখার প্রথম পদ্ধতি, প্রাক-ইসলামি আরবের ইতিহাস, আরবের ইসলামি ইতিহাস, ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ইবনে সাদ, আল-ইস্পাহানি, আত-তারাবি, আল-মাসুদি, ইতিহাসের ধারা, ইবনে খালদুন, ধর্মশাস্ত্র, কোরআন, হাদিস ও ফেকাহ, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, মজহার, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শক্তি, ইমাম মালিক, ইবনে হাম্বল, দু'যুগের দুটি অবদান, সংস্কৃতির জগৎ, সুবিয়াহ আন্দোলন, আরব ও অন-আবর সাহিত্যিক —মাকামাহ, আল-আগানি, স্থাপত্যশিল্প—উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয়া যুগ, মসজিদ, সুকুমার শিল্প—সূচনা, ক্ষুদ্রচিত্র, চিত্রকলা, মৃৎশিল্প, হস্তলিখন শিল্প, সঙ্গীত।

পরিশিষ্ট ২৫১—২৫৪

ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সন-তারিখ
ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী
ইসলামের শাসক ও রাজধানী

অবতরণিকা

"হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্, তুমি যাকে খুশি রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা দান কর, তোমারই হস্তে কল্যাণ, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়োপরি সর্ব শক্তিমান।" কোরআন—৩ঃ২৬

"আল্লাহ্ যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের ওপর কেউই জয়ী হবে না। আল্লাহ্ যদি তোমাদের সাহায্য না করেন, তাহলে তোমরাও অন্যের সাহায্যেও জয়ী হতে পারবে না।" কোরআন—৩ঃ১৬০

নিখিলের স্রষ্টা তুমি সর্ব শক্তিমান
তোমারই হাতের দান মান-অপমান।
নিত্য বিরাজিত তুমি চির বিদ্যমান
রাখিবে আপন হাতে মানীর সম্মান।
যে দিকে মঙ্গল আছে নিখিল-নিদান
করহে বলার আগে তাহাই বিধান।

নিখিল মানবে সাবধান বাণী—
মহানবীর হুঁশিয়ার
কোন মানুষের কিছু নাই কারো
চেষ্টা ব্যতীত তার।

কোরআন—৫৩ঃ৩৯-৪১

মুসলিম খেলাফতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তরালের মানচিত্র

"জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণে মানব জাতির প্রধান কাজগুলি মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল ঃ

সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক—আল-ফারাবি
সর্বশ্রেষ্ঠ অংকশাস্ত্রবিদ—আবু কামিল, ইব্রাহিম ইবনে সিনান
সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ও বিশ্বকোষ প্রণেতা—আল-মাসুদি
সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক—আত-তাবারি
সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক—আর-রাজি
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী—ওমর খৈয়াম
সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ—হাইওয়ান
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণিতত্ত্ববিদ—জাহিদ প্রমুখ সকলেই এক একজন মুসলমান ছিলেন।"

—জর্জ মার্টিন

নিঃসংকোচে নিখিলের বুকে
ঘোষণা করেছে কোরআন
জাতির ভাগ্য জাতিরই হাতে
জাতি আনে উত্থান।

কোরআন—১৩ : ১১, ৫৩ : ৩৯

মুসলিম খেলাফতের বিশ্ববিজয়ী অন্তরালের মানচিত্র

বিশ্বের বিস্ময় যাহা বিশ্ব অভিমত—
শূন্য হতে গড়েছিল আরব খেলাফত।
আজও তুলনাহীন এ কোন বিজয়—
সে ছিল সৈনিক নয় ঈমানের জয়।
যখনই হারাল তারা ঈমানের বল
বিশাল সাম্রাজ্য-সহ হল বিহ্বল।
দুই হাতে তুলে নাও হাদিস-কোরআন
আবার ফিরিবে তব হৃত সম্মান।

কোরআন—৩ : ১৬০

উমাইয়া-আব্বাসীয়া খেলাফতের বৈশিষ্ট্য

উমাইয়া খেলাফত ইসলামের রাজ্য-সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগ।
আব্বাসীয়া খেলাফত ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ।

* * *

উমাইয়া খেলাফত (ইসলামের) প্রতিষ্ঠা ও প্রবর্তনের যুগ।
আব্বাসীয়া খেলাফত (ইসলামের) পরিকল্পনা ও প্রযোজনার যুগ।

* * *

উমাইয়া খেলাফত (ইসলামের) সকল কিছুর প্রারম্ভের যুগ।
আব্বাসীয় খেলাফত (ইসলামের) বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ।

"নিশ্চয়ই মানবমণ্ডলী ক্ষতির মধ্যে আছে। কিন্তু ওরা নয়, যারা বিশ্বাস করেছে (আল্লাহকে) ও সৎকাজ করে (আপন জীবনে), এবং সত্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করে (অন্যকে) এবং ধৈর্য সম্বন্ধেও উৎসাহ দান করে (অপরকে)।"

কোরআন—১০৩ : ২-৩

যে নিজে কোন অন্যায় বা পাপ করে কোন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর তা চাপিয়ে দেয়, সে মিথ্যা, অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

কোরআন—৪ : ১১২

মহা কোরআন আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে—
ইতিহাস অধ্যয়নে ও ইতিহাস প্রণয়নে

"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি।"

কোরআন—১২ : ৩

"আমি তোমার নিকট ওদের (গুহাবাসীদের) ইতিহাস সঠিকভাবে বর্ণনা করছি।" কোরআন—১৮ : ১৩

"তোমার নিকট ফেরাউন ও সামুদের সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত এসেছে কি? যারা অবিশ্বাস কবে তারাই মিথ্যা বলে।" কোরআন—৮৫ : ১৭-১৯

আপন আচারে তুমি হও হে তেমন
অন্য হতে পেতে চাও নিজেরে যেমন।
হোক তব ব্যবহার মানব সমাজে
যেরূপ পাইলে তুমি খুশিও নিজে।

—হাদিস

করিলে আপন হাতে আপনার কাজ
গড়িবে আপন হতে মানব সমাজ
সবাই সবেরে কর নিজেরে আদেশ
ভাল হও ভাল হবে তোমার স্বদেশ।

ইতিহাস

অতীত কাহিনী ধারা গাঁথে যে যতনে
বিগত দিনের ছবি দেখে সে নয়নে।
অতীতের লুপ্তপ্রায় সত্যের সন্ধানে
ভবিষ্যতের চলাপথ গড়ে বর্তমানে।
যে-জন অজ্ঞান এই ইতিহাস জ্ঞানে
সমাজের তিক্ত হতে মিষ্ট নাহি জানে।

মানুষ মোহেতে চায় সাময়িক মধু
সতর্ক করিতে থাকে ইতিহাস শুধু।

অন্যায় করিতে কত দেখি মোরা যাকে
দেখি না করেছে ক্ষমা ইতিহাস তাকে।
যখন কাহারো ভুল কেহ নাহি ধরে
অন্যায়ের প্রতিকার ইতিহাস করে।

কালের বিচারাগারে নাহি ব্যবধান
দুর্বলেরে সবলেরে করেছে সমান।
ঘটনা ঘটিয়া যায় কালের প্রহরে
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আসে স্তরে স্তরে।
নাহি ক্ষমা পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীরে
ইতিহাসের উত্তর পায় তবে ধীরে।

শক্তির মাদকতায় মোহময় মন
কখনও নমরুদ হয় কখনও ফেরাউন।
বিধাতাকেও করে বসে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ
ইতিহাস ধরে যবে আপন স্বরূপ।
নিয়তির নিষ্ঠুর দেখ পরিহাস
করেনি কখনও ক্ষমা কারো ইতিহাস।
ইতিহাস একা শুধু অতীত-দর্পণ
ধরণীতে ধরিয়াছে সমাজ-দর্শন।

ইসলামের ইতিহাস

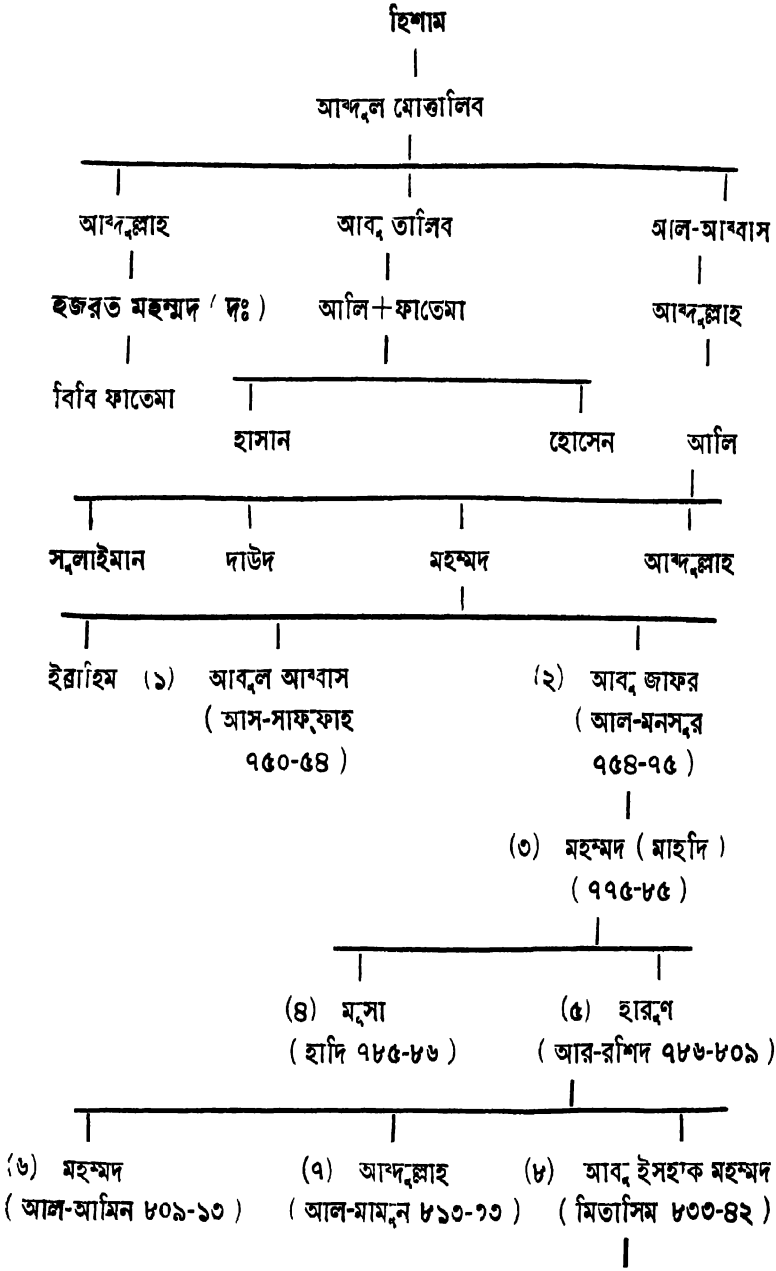
দেখিয়া কোন মুসলিম হাতে জুয়ার আসরে তাস
ভাবিও না তা কোরআন-হাদিস ইসলামের ইতিহাস।
দেখিয়া কোন মুসলিম হাতে সতীর সর্বনাশ
ভাবিও না তা আল্লাহর বাণী নবীজীর ইতিহাস।
মুসলিম নয়, নর-পশু সে, পশু প্রবৃত্তির দাস
মহা পাপীরে ধিক্কার দেয় ইসলামের ইতিহাস।
নর-নারীর প্রেম শুদ্ধ পথে বহিতে প্রেমের প্রবাহ
ব্যাভিচারে দিয়ে প্রাণদণ্ড বিবাহতে দেয় উৎসাহ।
এক যদি হয় মহীয়ান তবে অন্য সে মহীয়সী
এক যদি হয় গরীয়ান তবে অন্য সে গরীয়সী।
দেখিয়া কোন বাদশার কোপে অসহায় মজলুম
জালেমের রূপ দেখিও সেথা ইসলামে নাই জুলুম।

অত্যাচারীর অত্যাচারে গরিব হয়েছে নাশ
ইসলাম তারে দিয়েছে লানৎ অভিশাপ বারো মাস।
অত্যাচারী, মুসলিম নয় পাপী শয়তান-দাস
মুসলিম যারা, কোনদিন কারো করে না সর্বনাশ।
বলে না কোরআন বলে না হাদিস সাম্যের ইতিহাস
মর্ত্যের বুকে করিবে মানুষ খুনোখুনি বারো মাস।
বলেছে কোরআন বলেছে হাদিস শান্তির ইতিহাস
বিশ্ব-মানব করিবে হেথা শান্তিতে বসবাস।
চার খলিফার প্রাণের ছবি ইসলামের ইতিহাস
মোরা শুধু তার বিকৃতীকরণ করেছি সর্বনাশ।

কোরআন—২ঃ ১২৪, ২০৯, ৩ঃ ১৫৯, ৪ঃ ৩, ৩৪, ১২৯, ৯ঃ ৭০, ২৩ঃ ৯৪, ২৪ঃ ২৭, ২৮, ৩২, ৩৩, ২৮ঃ ৩৭।

আব্বাসীয়া বংশের খলিফা তালিকা ঃ (১–৩৭)

(৭৫০-১২৫৮ খ্রীস্টাব্দ)



(৯) আবু জাফর হারুণ (ওয়াসিক ৮৪২-৪৭)

(১০) আবুল ফজল জাফর (মুতাওয়াক্কিল ৮৪৭-৬১)

(১২) আবুল আব্বাস আহম্মদ (মুস্তাইন ৮৬২-৬৬)

(১৪) আবু-আব্দুল্লাহ মহম্মদ (আল মুহতাদি ৮৬৯-৭০)-

মুওয়াফ্ফাক

(১১) আবু জাফর আহম্মদ (মুনতাসির ৮৬১-৬২)

(১৩) আবু আব্দুল্লাহ আহম্মদ (মুতাজ ৮৬৬-৬৯)

(১৫) আবুল আব্বাস আহম্মদ (মুতামিদ ৮৭০-৯২)

(১৬) আবুল আব্বাস আহম্মদ (মুতাজিদ ৮৯২-৯০২)

(১৭) আবু মহম্মদ আলি (মুকতাফি ৯০২-০৮)

(১৮) আবুল ফজল জাফর (মুকতাদির ৯০৮-৩২)

(১৯) আবু মনসুর মহম্মদ (কাহির ৯৩২-৩৪)

(২২) আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ (মুসতাকফি ৯৪৫-৪৬)

(২০) আবুল আব্বাস মহম্মদ (রাদি ৯৩৪-৪০)

(২১) আবু ইসহাক ইব্রাহিম (মুত্তাফি ৯৪০-৪৪)

(২৩) আবুল কাসিম আল-ফজল (মুতি ৯৪৬-৭৪)

ইসহাক

(২৪) আবু বকর আব্দুল কারিম (তায়ি ৯৭৪-৯১)

(২৫) আবুল আব্বাস আহম্মদ (কাদির ৯৯১-১০৩১)

(২৬) আবু জাফর আব্দুল্লাহ (কায়িম ১০৩১-৭৫)

মুহম্মদ

(২৭) আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ (মুকতাদি ১০৭৫-৯৪)

(২৮) আবুল আব্বাস আহম্মদ (মুস্তাজিদ ১০৯৪-১১১৮)

(২৯) আবু মনসুর আল-ফজল
(মুসতারশিদ ১১১৮-৩৪)

(৩০) আবু জাফর মনসুর
(রশিদ ১১৩৮-৩৫)

(৩১) আবু আবদুল্লাহ মহম্মদ
(মুকতাফি ১১৩৫-৬০)

(৩২) আবুল মুজাফ্ফর ইউসুফ
(মুস্তানজিদ ১১৬০-৭০)

(৩৩) আবু মহম্মদ হাসান
(মুসতাদি ১১৭০-৮০)

(৩৪) আবুল আব্বাস আহম্মদ
(নাসির ১১৮০-১২২৫)

(৩৫) আবু নসর মহম্মদ
(জাহির ১২২৫-২৬)

(৩৬) আবু জাফর মনসুর
(মুস্তানসির ১২২৬-৪২)

(৩৭ আবু আহম্মদ আব্দুল্লাহ
(মুস্তাসিম ১২৪২-৫৮)

প্রথম পর্ব

আব্বাসীয়া খেলাফতের সময় স্বাধীন রাজবংশের পূর্ব অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

আব্বাসীয়া খেলাফতের প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ আব্বাসীয়গণ যে দুটি জিনিসকে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কাজে লাগিয়ে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন, তা ছিল—উমাইয়াদের রাজতন্ত্র ও ধর্মবিবর্জিত জীবনযাত্রা। এইজন্য আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস সিংহাসনে আরোহণ করেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রথম ঐ দুটির প্রতি লক্ষ্য দিলেন।

রাজনীতির দিক থেকে লক্ষ্য করলে উমাইয়াদের সঙ্গে আব্বাসীয়গণের মূল পার্থক্য কি ছিল, উমাইয়াদের সময় রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা আরব-মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল। সেখানে অন-আরব মুসলমানদের কোন মান-সম্মান ছিল না বললেই চলে। এমনকি স্বয়ং মহানবী (সঃ)-এর বংশধর হাশেমীদেরও কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি। সমগ্র উমাইয়া খেলাফতের মধ্যে একমাত্র মহানুভব খলিফা দ্বিতীয় ওমর মহানবীর বংশধর হাশেমীদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ভুল করেননি। বাকি সকলেই ঐ একই দোষে দুষ্ট। উমাইয়াদের যুগে যারা ছিল উপেক্ষিত, সেই উপেক্ষিত অন-আরব-মুসলমানদের হাত করে আব্বাসীয়গণ একদিন সদলবলে খেলাফত লাভ করেন। সেইজন্য মাওয়ালী অর্থাৎ অন-আরব-মুসলমানদের প্রতি আব্বাসীয় খলিফাগণ বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। যার ফলে আব্বাসীয় খেলাফতে রাষ্ট্র-পরিচালনায় আরব-মুসলমানদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে অনারব মুসলমানদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এ যুগেই মাওয়ালী মুসলমানগণ চরম উন্নতি লাভ করেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় নতুন পরিস্থিতি ও নব পরিবেশের সৃষ্টি হল। খলিফাদের দেহরক্ষীগণ হলেন খোরাসানবাসী এবং উজিরগণও ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রাঃ)-এর প্রবর্তিত আরব জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত হল। আরবীয় রাষ্ট্রের পরিবর্তে জন্ম নিল—নানা জাতি নানা বর্ণের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র। এক কথায়, আব্বাসীয় যুগে ইসলামের পতাকা তলে আন্তর্জাতিক ইসলামের নামে ইরানীদের প্রভুত্ব স্থাপিত হল।

আব্বাসীয় খেলাফতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল উমাইয়া যুগের সাম্রাজ্যসীমা যেমন অটুট বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, আব্বাসীয় যুগে তা শিথিল হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ স্বাধীনতার স্বাদ পেতে আরম্ভ করল। ফলে সমগ্র মুসলিম জগৎ তখন হতে আর খলিফার প্রাধান্য মেনে চলল না। এইভাবে ধীরে ধীরে স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, উম্মান, সিন্ধু ও খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চলগুলি আর খলিফাকে সেরূপ প্রাধান্য দিত না।

আব্বাসীয় যুগের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—ধর্মীয় অনুশাসন। যে সমস্ত অনৈসলামিক কার্যকলাপের জন্য উমাইয়াদের পতন হল, আব্বাসীয় খলিফাগণ প্রথমদিকে সেগুলি সম্পর্কে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এমনকি

তাঁরা জনসাধারণকে মুগ্ধ করার জন্যই অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। আলেম ও ফকীহগণ খলিফার দরবারে সম্মানলাভ করতেন। অনেকে অনেক উচ্চাসনও লাভ করলেন। ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন সাধু ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা দেশ শাসিত হতে আরম্ভ হল। শাসনকার্য তাঁদের পরামর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত হল। নতুন খলিফাগণ তাঁদের কথায়, কাজে, পোশাক-পরিচ্ছদে, নামধামে সর্বত্র ধর্মের প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করলেন, ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলি যাতে সহজে কার্যকরী হয়, তার জন্য বহু কর্মচারীও নিযুক্ত হল, যারা তা অমান্য করল, তাদের শাস্তিরও বিধান হল। কিন্তু সবই হল। এবং যা কিছুই হল, এ সবই ছিল আব্বাসীয়গণের মনের কথা নয়, মুখের কথা। আল্লাহকে খুশি করা নয়, জনসাধারণকে খুশির নামে প্রতারণা করা। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার নামে আপন গদিকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই মূলত উমাইয়া খলিফাগণের সাথে আব্বাসীয় খলিফাদের ধর্মীয় কোন পার্থক্য ছিল না। উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় খলিফাগণই ইসলামকে স্বীকার করলেও ইসলামের সারসত্য হতে নিজদেরকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ উমাইয়া খলিফাদের মতোই আপন আপন স্বার্থকে ধর্মীয়স্বার্থের বহু ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁদের ব্যক্তি-জীবন হতে পারিবারিক জীবনে ধর্মীয়ভাব খুবই কম ছিল। উভয় খলিফাগণই তাঁদের বেশভূষা, জাঁকজমক ও নানা বিষয়ে যে ভাবে বিলাসস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কালাতিপাত করে গেছেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের কোনমতেই খোলাফায়ে রাশেদীনের সাথে তুলনা করা চলে না। বরং তাঁরা সমধিক তুলনীয় অনৈসলামিক প্রাচীন পারস্য সম্রাটদের সাথে। খোলাফায়ে রাশেদীন অপেক্ষা প্রাচীন পারস্য সম্রাটদের জীবনযাত্রাই তাঁদের বেশি প্রভাবান্বিত করেছিল। মহানবী (দঃ)-এর ইসলাম (৬১০-৬৩২ খ্রীঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামের অবিকৃত যুগকে (৬৩২-৬৬১ খ্রীঃ) সাদরে বরণ করার মতো মানসিকতা তাঁদের ছিল না। সুতরাং ধর্মীয়ক্ষেত্রের নিগূঢ় তত্ত্বে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাদের মূলত কোন পার্থক্যই ছিল না।

আব্বাসীয় যুগের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—সংস্কৃতির সমন্বয়। উমাইয়া যুগে আরব মুসলমানদের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের নামে যে অনুদারতা লক্ষ্য করা যায়, আব্বাসীয় যুগে তার আমূল পরিবর্তন লক্ষণীয়। আব্বাসীয় যুগে নানা জাতি, নানা বর্ণ ও নানা সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে ও সমবেত চেষ্টায় সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ঘটে। এই একটি স্থানে লক্ষ্য করা যায়—ইসলামের 'ইখওয়ানিয়াৎ' বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধের মর্যাদা লাভ। আব্বাসীয় যুগের এটা ছিল একটি নিরঙ্কুশ কৃতকার্যতার স্থান। কেননা ইসলাম তার দুহাতে দুটি জিনিসকে তুলে ধরেছিল —ব্যক্তিজীবনে ইনসানিয়াৎ—মানবতা ও সমাজ-জীবনে ইখওয়ানিয়াৎ—ভ্রাতৃত্ব। যে কোন দেশে, যে কোন সমাজে ইসলামের আগমন ও অন্তর্ধানকে যদি কেউ

বুঝতে চান, তাহলে বুঝতে হবে প্রথম ইসলামের ঐ দুই নিশানাকে। ঐ দুটি নিশান যেখান থেকেই অবলুপ্ত হয়েছে, ইসলামও সেখান থেকে লুপ্ত হয়েছে। বঙ্গদেশে মুসলিম-সমাজের পতন তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আব্বাসীয় যুগের সংস্কৃতির এই সমন্বয়ে তাঁদের চরম অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে বহু নগর ও বন্দর গড়ে ওঠে। আমদানি ও রপ্তানি প্রভৃত উন্নত হয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য সুদূর ভারত, সিংহল, মালয়, জাভা, সুমাত্রা ও চীনদেশ পর্যন্ত রপ্তানি করা হত। আবার ঐ সমস্ত দেশের প্রাপ্ত মুদ্রা হতে বহু জিনিস আমদানিও করা হত। এই বাণিজ্য সম্ভারের সাথে সংস্কৃতিরও বিনিময় হতে থাকে। ফলে মুসলমানগণ সাহিত্য, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নানা বিষয়ে কালজয়ী অপরিমিত জ্ঞান ভাণ্ডার রেখে যান।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য—রাজতন্ত্রের স্বীকৃতি। স্বয়ং মহানবী ইসলাম ও ইসলামের শাসনতন্ত্রকে নিরঙ্কুশ গণতান্ত্রিক ভিত্তিক করে গেলেন। খোলাফায়ে-রাশেদীন সেই পথই অনুসরণ করলেন। পরবর্তীকালে উমাইয়াগণ গণতন্ত্রের পাঠ পরিস্কার তুলে দিলেন। এই অধ্যায়ে আব্বাসীয়গণ উমাইয়াগণকে বেমালুস অনুসরণ করে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে না এনে জনগণের সাথে বেইমানীই করলেন। কথা ছিল ফিরিয়ে আনার। নিজেদের গদি ফিরল, কিন্তু মহানবীয় প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র আর ফিরল না। পরবর্তীকালে ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণে তাঁদের যে—অধঃপতন দেখা দিয়েছিল, তাই-ই তাঁদের পতনকে এত শোচনীয় ও এত সকরুণ করেছিল।

আবুল আব্বাস
(৭৫০–৭৫৪ খ্রীঃ)

☐ সিংহাসনে আরোহণ—বিদ্রোহ দমন—প্রশাসন—চরিত্র। ☐

সিংহাসনে আরোহণ (হাশিমীয়া) ঃ জাবের যুদ্ধে উমাইয়া শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পতন আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা করে। এই কাজের নায়ক ছিলেন আবুল আব্বাস, যিনি প্রতিশোধ গ্রহণার্থে আস সাফ্ফা অর্থাৎ রক্ত-পিপাসু উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুফার অধিবাসীগণ আলি (রাঃ)-এর বংশধরগণের সমর্থক থাকায়, আবুল আব্বাস কুফাকে তাঁর রাজধানী রূপে নিরাপদ স্থান মনে করতে না পারায়, ফুরাত নদীর তীরবর্তী আল-আনবার নামক স্থানে নতুন রাজধানী নির্মাণ করে তাঁর পূর্বপুরুষের নামানুসারে নাম রাখলেন—হাশিমীয়া।

বিদ্রোহ দমন ঃ রক্ত পিপাসু আব্বাস উমাইয়া বংশের সকলকে ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে নির্মম অত্যাচার আরম্ভ করলেন, তার ফলে বহু স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। দামেস্ক, হিমস, কেন্নিসরন, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়ায় ব্যাপক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। আবুল আব্বাসের চাচা আব্দুল্লাহ ও ভ্রাতা আবু জাফর এই বিদ্রোহের আগুন নির্মূল করেন। ইরাকের উমাইয়া শাসনকর্তা ইয়েজিদ ইবন হুবায়রা হজরত আলির জনৈক বংশধর আব্দুল্লাহ ইবন হাসানকে খলিফা বলে ঘোষণা করলে আব্বাসীয় সেনাপতি হাসান ইবন কাহতাবা এবং খলিফার ভ্রাতা আবু জাফর ওয়াসিত অবরোধ করেন। এগারো মাস অবরোধের পর ইয়েজিদ ইবন হুবায়রা নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। ইতিমধ্যে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের মৃত্যু সংবাদেও ঘটনার আরও অবনতি ঘটে। ইয়েজিদ তাঁর আত্মসমর্পণের পরিবর্তে নিজের, পরিবার-বর্গের ও অনুচরদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু খোরাসান হতে আবু মুসলিম খলিফার নিকট ইয়েজিদ ও তাঁর অনুচরবর্গের হত্যার জন্য পরামর্শ পাঠালেন (এখানে আবু মুসলিম উমাইয়া যুগের আব্দুল মালিকের খেলাফতে অতি নিষ্ঠুর হাজ্জাজের ভূমিকা পালন করছিলেন।)। খলিফা আবু মুসলিমের পরামর্শকে কার্যকরী করার জন্য ভ্রাতা জাফরকে বার বার তাগাদা দিতে থাকেন। কিন্তু আবু জাফর কোনমতেই সম্মত না হওয়ায় অবশেষে খলিফার দুজন আজ্ঞাবহ ওদের নির্মমভাবে হত্যা করে আবু মুসলিমের পরামর্শকে কার্যে পরিণত করেন। খলিফার অপর ভ্রাতা ইয়াহিয়া মসুলের অধিবাসীদের নানা-ভাবে নির্যাতন করে সেখানকার বিদ্রোহও দমন করেন। ধীরে ধীরে সিন্ধু, উম্মান

ও খোরাসানের বিদ্রোহও অনুরূপ ভাবেই প্রদমিত হল। এদিনের আবু জাফরের সিদ্ধান্তের ওপর আবু মুসলিমের অযাচিত হস্তক্ষেপ পরবর্তীকালে আবু মুসলিমের জীবনাবাসনের করুণতম ইতিহাসের সৃষ্টি করে।

প্রশাসন ঃ আবুল আব্বাস তাঁর প্রশাসনিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার জন্য আপন ভ্রাতা ও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী আবু জাফরকে ইরাক, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ায় পিতৃব্য দাউদ ইবন আলি ও সুলাইমান ইবন আলিকে সিরিয়া ও বসরায়, আবু মুসলিমকে খোরাসানে এবং আবু আয়ুনকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এবং আবু সালামাকে উজীরের পদে ও খালিদ বিন বার্মাকে অর্থসচিবের পদে নিযুক্ত করেন।

চরিত্র ঃ আবুল আব্বাস আস-সাফফা সাড়ে চার বছর রাজত্ব করে ৭৫৪ খ্রীঃ ভ্রাতা আবু জাফরকে উত্তরাধিকার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশাকে পরবর্তী ভাবী উত্তরাধিকার মনোনীত করে দেহত্যাগ করেন। তাঁর চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য—তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ। প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাঁর শরীরে এতটুকুও দয়া-মায়ার চিহ্ন ছিল না। তাই তাঁকে আস-সাফফা অর্থাৎ রক্ত-পিপাসু বা রক্ত-লোলুপ উপাধি দেওয়া হয়। উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার সাথে আব্বাসীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার সম্যক সদৃশ পাওয়া যায়। উভয়েই ছিলেন পাষণ্ড, মিথ্যা শপথকারী, কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক। আবার উভয়েই ছিলেন—সংযমী, ধীরস্থির, দূরদর্শী, বিচক্ষণ, কূটনীতিজ্ঞ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। উইল বলেন—"আবুল আব্বাস শুধু পাষণ্ডই ছিলেন না, মিথ্যা শপথকারী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন।" হিট্টি বলেন—"আস-সাফফা ইসলামের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতন ও গৌরবোজ্জ্বল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।" আস-সাফফার উম্মে সালমা নামে একটিই মাত্র পত্নী ছিল।

আবু জাফর আল-মনসুর
(৭৫৪-৭৭৫ খ্রীঃ)

□ ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যেমন হজরত ওমর (রাঃ),
উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যেমন আব্দুল মালিক,
আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তেমনি আবু জাফর আল-মনসুর। □

আবু জাফর আল-মনসুর (৭৫৪-৭৫ খ্রীঃ)
↓

আল মাহদী (মহম্মদ) (৭৭৫-৮৫)	আল-হাদী (মুসা) (৭৮৫-৮৬)	হারুণ-আর রসিদ (হারুণ) (৭৮৬-৮০৯)

↓

আল-আমিন (মহম্মদ) (৮০৯-১৩)	আল-মামুন (আব্দুল্লাহ) (৮১৩-৩৩,	আল-মুতাসিম (কাসেম) (৮৩৩-৪২)

সিংহাসন লাভঃ আবু জাফর হজ উপলক্ষে মক্কায় গমন করলে তাঁর অবর্তমানেই আবুল আব্বাস আস-সাফফার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর আব্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশা আবু জাফরকে পরবর্তী খলিফা বলে ঘোষণা করেন। ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবু জাফর কুফায় প্রত্যাবর্তন করে 'আল-মনসুর' অর্থাৎ বিজয়ী উপাধি ধারণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর খেলাফতের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—(১) বিদ্রোহ দমন, (২) শান্তি প্রতিষ্ঠা (৩) সাম্রাজ্য বিস্তার ও (৪) প্রশাসনিক সংগঠন।

বিদ্রোহ দমনঃ একদিন উমাইয়া খেলাফতে আব্দুল মালিক যে ভূমিকা গ্রহণ করে উমাইয়া খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করেছিলেন, আজ আবু জাফর আল-মনসুরও সেই সমতুল্য ভূমিকা পালন করে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত স্থাপয়িতার সম্মান লাভ করেন। উভয়েরই ভাগ্যে দেখা দিয়েছিল—বিদ্রোহ দমন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্য বিস্তার ও প্রশাসনিক তৎপরতা।

আব্দুল্লাহ ইবন আলির বিদ্রোহ ও পতনঃ যে সিংহ পুরুষের প্রবল বিক্রমে একদিন জাবের যুদ্ধে উমাইয়া রাজত্বের শেষ গৌরব রবি অস্তমিত হয়ে আব্বাসীয় যুগের সূচনা হয়েছিল, যাঁকে একদিন আবুল আব্বাস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—জাবের যুদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করতে পারলে আবুল আব্বাসের পর আব্দুল্লাহ একদিন খলিফা মনোনীত হবেন। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আব্বাস আজ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে আপন ভ্রাতা জাফর ও ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসাকে

উত্তরাধিকার মনোনীত করলেন। তাই অতি স্বাভাবিক কারণেই আব্দুল্লাহ সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবু জাফর আল-মনসুর পিতৃব্যের বিদ্রোহ দমনের জন্য আবু মুসলিমকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ সতেরো হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য-সহ নাসিবিন নামক প্রান্তরে আবু মুসলিমের সঙ্গে মিলিত হলেন। ৭৫৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আব্দুল্লাহ আবু মুসলিমের নিকট পরাজিত হয়ে বসরার শাসনকর্তা ও আপন ভ্রাতা সুলাইমানের নিকট আত্মগোপন করেন। আব্দুল্লাহকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে সুলাইমানের পদচ্যুতিও হয়। অতঃপর আল-মনসুর, আব্দুল্লাহ ও তাঁর পুত্রকে হাশিমীয়ার অদূরে একটি অস্বাস্থ্যকর দুর্গে কারারুদ্ধ করে রাখেন। সাত বছর দীর্ঘ কারা-যন্ত্রণার পর লবণের ওপর প্রতিষ্ঠিত কারা প্রাসাদটি প্রবল বৃষ্টিপাতে ধসে পড়লে হতভাগ্য আব্দুল্লাহ ও তাঁর পুত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে দীর্ঘ নরক-যন্ত্রণা হতে মুক্তি পান। ঠিক এইভাবেই একদিন কর্মবীর দ্বিতীয় মারওয়ান প্রাণভয়ে বসরার একটি পোড়ো গির্জায় আশ্রয় নিলে আব্দুল্লাহ কর্তৃক বিধৃত হয়ে অতি নৃশংসভাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। আব্দুল্লাহর পরিণতি তা অপেক্ষাও আজ জঘন্যতম হল। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর পুনরাবৃত্তি। আল মনসুর আপন বিবেকের প্রবল দংশনকে অগ্রাহ্য করেই শঠতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আপন পিতৃব্য আব্দুল্লাহকে হত্যা করে সিংহাসনকে কণ্টকমুক্ত করেন।

আবু মুসলিমের বিদ্রোহ ও পতন ঃ একথা সর্বজনস্বীকৃত আবু মুসলিম আব্বাসীয় রাজত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সুচতুর আবু জাফর আল-মনসুর একথা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন—আবু মুসলিম ও আব্দুল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনদিনই আব্বাসীয় রাজত্বের সূচনা সম্ভব হত না। সুতরাং আব্বাসীয় রাজত্বে তাঁদের প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল অসাধারণ। জনসমক্ষে অনেক সময় তাঁদের প্রভাবের উজ্জ্বলতা খলিফাকেও ম্লান করে দিত। আল-মনসুর মনের দিক থেকে এটাকে মোটেই সহ্য করতে না পেরে তাঁদের দুজনকেই একের পর এক ধরার মাটি থেকে একেবারেই সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনা মতোই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুললেন—নাসিবিনের যুদ্ধে দুজনকেই নামিয়ে দিলেন। এই যুদ্ধে আবু মুসলিম আব্দুল্লাহকে নিহত করে আপন প্রদেশ খোরাসানে প্রত্যাবর্তন করার কালে মনসুর বাদ সাধলেন। কেননা মনসুর জানতেন খোরাসানে আবু মুসলিমের প্রতিপত্তি অসাধারণ। সুতরাং তাঁর প্রতিপত্তির হরণার্থেই খলিফা তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে আবু মুসলিম তা অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে রাগ ও অভিমানবশত বড়ই ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেন। নাসিবিন যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুতের ব্যাপারেও খলিফার নিকট তিনি এই পরিচয়ে আরও ঘৃতাহুতি দিলেন। খলিফা তাঁর এই অতি অশোভন ও দাম্ভিকতাপূর্ণ ব্যবহারে ও ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তিতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁকেও ধরার বুক থেকেই অপসারণের পরিকল্পনা করতে থাকেন। আবু মুসলিম খলিফার মনোভাব

অনুধাবন করে আপন স্থান খোরাসানে ফিরে গেলেন। খলিফা খোরাসান-নায়ক আবু মুসলিমের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে কোন রূপ সুবিধা হবে না ভেবে, অন্য কৌশল অবলম্বন করে আবু মুসলিমকে সসম্মানে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজোচিত অভ্যর্থনায় ভূষিত করে কয়েকদিন চরম সমারোহে রাজ-আতিথ্য দান করে ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে গুপ্তঘাতকের দ্বারা লক্ষ লক্ষ উমাইয়া হত্যাকারী জল্লাদ ও আব্বাসীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাণপুরুষ আবু মুসলিমের জীবনের মতো সমর-সাধ মিটিয়ে দেন। প্রকৃতির পরিশোধ চুকে গেল।

উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতে আমর বিন আস, মুগিরা বিন শুবাহ্ ও যিয়াদ বিন মামিয়ার অবদান যেমন অপরিসীম, আব্বাসীয় রাজত্বেও আব্দুল্লাহ ও আবু মুসলিমের অবদান অনস্বীকার্য। জাবের যুদ্ধে আব্দুল্লাহর অবদান, রণনৈপুণ্য ও রাজত্বের সূচনাতে তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক সমগ্র আব্বাসীয় ইতিহাসকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছে, তাঁদের অসাধারণ যোগ্যতাই তাঁদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে আবু মুসলিমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, তীক্ষ্ন বিচক্ষণতা, তীব্র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সমগ্র ইসলামের ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে। তিনি ছিলেন উমাইয়া যুগের জল্লাদ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (উভয়েই সামান্য অবস্থা থেকে উত্তরণ করেছিলেন)। প্রবাদ আছে, আবু মুসলিম প্রায় ৬ লক্ষ উমাইয়াদের প্রাণদণ্ড দিয়ে আব্বাসীয় বংশের ভিতকে শক্ত করেন। অধ্যাপক মুইর বলেন—"তিনি (আবু মুসলিম) মাত্র ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, অপরিসীম কর্মদক্ষতা ও রাজনৈতিক মেধার দ্বারা ইসলামের অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করেন, এবং উমাইয়া বংশের ধ্বংসস্তূপে আব্বাসীয় বংশকে প্রতিষ্ঠা করেন।" রাজ-চরিত্র এমনি দুর্বোধ্য, যাঁরা প্রাণ দিয়ে রাজত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন, রাজা তাঁদের প্রেম দিয়ে বরণ করতে পারলেন না। প্রকৃতপক্ষে, আবু মুসলিমের হত্যার পর মনসুর নিজেকে একমাত্র শাহানশাহ্ ও খলিফা মনে করতে থাকলেন। দুদিকে দুই দুর্বার প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক যোগ্যতম সহযোগী আব্দুল্লাহ ও মুসলিমের অবস্থানে খলিফা নিজেকে যেন নিরাপদ মনে করতে পারেননি। তাই খলিফার অবিশ্বাস ও সন্দেহের চরম পরিণতি হল—দুজন যোগ্য সহকারীর জীবনাবসান।

সানবাদের বিদ্রোহ: খোরাসানের প্রিয় নেতা আবু মুসলিমের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত হত্যার প্রতিবাদে খোরাসান ও পারস্য সরব হয়ে উঠল। রাজনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দিল। নৈরাশ্যজনক চরম পরিস্থিতির উদ্ভব হল। অগণিত বিক্ষুব্ধ মানুষ এই পাশবিক হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে জনৈক সানবাদের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। মাজুসী সম্প্রদায়ের নেতা সানবাদ রাই হতে নিশাপুর পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। স্বয়ং খলিফার বিশাল বাহিনীর সাথে সানবাদের সরাসরি সংঘর্ষে বিদ্রোহী সানবাদ প্রাণ হারালেন। বিদ্রোহের আগুনও প্রশমিত হল। বিদ্রোহও প্রদমিত হল। আবু

মুসলিম খোরাসান ত্যাগের পূর্বে তাঁরই একজন বিশ্বস্ত অনুচর আবু নাসেরের হাতে শাসনভার অর্পণ করে যান। কিন্তু আবু মুসলিমের প্রাণনাশের পর আবু নাসের খলিফার নিকট বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করে পারস্যের মাটিতে আব্বাসীয় শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন : ৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আল-মনসুর পবিত্র হজ্ব সম্পন্ন করে জেরুজালেম গমন করেন। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন। রাওয়ান্দিয়া নামক একটি সম্প্রদায়, যাঁরা পুনর্জন্ম ও অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা খলিফার প্রাসাদকে ঘিরে বলতে থাকেন—"এইটাই আমাদের প্রভুর ঘর। যিনি আমাদের উপজীবিকা দিয়ে প্রতিপালন করেন।" এবং খলিফার দেহরক্ষীদের নায়ককে জিব্রাইল ফেরেশ্‌তার অবতার বলে ঘোষণা করল। খলিফা এই অনৈসলামিক প্রচারে বিচলিত হয়ে ২০০ জন রাওয়ান্দিয়াকে কারারুদ্ধ করেন। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে ৬০০ জন রাওয়ান্দিয়া খলিফার দর্শনপ্রার্থী হয়ে হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করলে মারওয়ানের বংশধর মায়ান-বিন জায়দার হস্তক্ষেপে খলিফা বিদ্রোহীদের কবল হতে মুক্তি পেলেন। একদিন এই মায়ানকে হত্যা করার জন্য খলিফা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, আজ সেই মায়ানের হস্তক্ষেপেই খলিফা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেয়ে মায়ানকে 'সিংহপুরুষ' উপাধি দান করে পরে ইয়ামামা ও সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর খলিফা রাজধানীতে অনৈসলামিক কার্যকলাপ একেবারেই বন্ধ করার জন্য রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়কে রাজধানী হতে বহিষ্কৃত করেন।

খোরাসানের বিদ্রোহ দমন : অনৈসলামিক রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়কে চিরতরে শান্ত করে খলিফা পুনরায় খোরাসানের প্রতি মনোসংযোগ করেন। খোরাসানের বিদ্রোহী নেতা আব্দুল জব্বার ৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলিফা এই বিদ্রোহের যোগ্য মোকাবিলা করার জন্য আপন পুত্র আল-মাহদী ও সেনাপতি খোজাইমাকে প্রেরণ করেন। হতভাগ্য বিদ্রোহী নেতা আব্দুল জব্বার পরাজিত ও বন্দী হয়ে রাজধানীতে প্রেরিত হলে প্রথম তাঁর হস্তপদাদি কর্তন করে পরে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে আগামী দিনের বিদ্রোহীদের জন্য জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। এবং তাঁর একটি পুত্রকে নির্যাতিত করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের উদ্দেশ্যে লোহিত সাগরের একটি দ্বীপে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। এইভাবে খোরাসান বিদ্রোহের মূলোৎপাটন ঘটে। অশান্তি ও গোল-যোগের নির্মূল হয়।

তাবারিস্তানে বিদ্রোহ দমন : খোরাসানের বিদ্রোহ দমনের পর খলিফা মনসুর তাবারিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে। বাইজান্টাইনদের সাথে যুদ্ধে মালাভিয়া ও মাসিসা

পুনরুদ্ধার হয়। বাকু অঞ্চলও এই সময় খলিফার পতাকাতলে আসে। কাসিয়ানের তীরবর্তী তাবারিস্তানে পুরানো পারসিক ইস্পাহানদের ইস্পাহবেদ উপাধিধারী পরিবার স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করছিলেন। তাঁরা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলিফা একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এবং ইস্পাহান পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেও কিছুদিনের মধ্যে আবার রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে আল-মাহদীর নেতৃত্বে ইরাক ও মসুলের সেনাবাহিনী দাইলামার দিকে অগ্রসর হয়ে এই বিদ্রোহের মোকাবিলা করে। এক বছর সংঘর্ষের পর এই বিদ্রোহ প্রদমিত হয়। ৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে খলিফা মনসুর খালিদ বিন বার্মাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি দেমাবন্দ পর্বতের পাদদেশটি দখল করে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই খালিদ একদিন আবু মুসলিম ও কাহতাবার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে খলিফার প্রশংসাভাজন হন এই সময় ভারত মহাসাগরের জলদস্যুগণকে দমন করার জন্য খলিফা সিন্ধুনদের মোহনায় নৌবহর প্রেরণ করলে কাশ্মীর ও কান্দাহার অধিকৃত হয়।

আলি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন: হজরত আলি ও বিবি ফতেমার বংশধরগণ আব্বাসীয়দের সরাসরি সাহায্য না করলে জগতের বুকে কোনদিন কি আব্বাসীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারত? এ কথা সকলেরই জিজ্ঞাসা। আব্বাসীয়গণ নির্বিবাদে, নির্বিচারে নিঃদ্বিধায় উমাইয়াদের বিরুদ্ধে হজরত আলির বংশধরদের অধিকারকে রাজনীতির মূলধনরূপে ব্যবহার করেন। সমগ্র জনসাধারণ এই দাবি বা মূলধনকে যুগ-যুগান্তর ধরে কালপ্রবাহে আপন আপন অন্তরে সুরক্ষিত করে আসছিলেন। এই মূলধনকে কার্যে পরিণত ও উমাইয়াদের পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য মদিনায় পরপর চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যে সভাগুলিতে মনসুর সহ বানু হাশেমের সকল প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, উমাইয়াদের পতনের পর ইমাম হাসানের বংশধর প্রপৌত্র সুযোগ্য ব্যক্তি মহম্মদকে খলিফা নিযুক্ত করা হবে। মহম্মদ তাঁর অসাধারণ চরিত্রের জন্য 'আন-নাফস-উজযাকিয়া অর্থাৎ পবিত্র আত্মা উপাধিও লাভ করেন। কিন্তু আব্বাসীয়গণ ক্ষমতালাভের পরই যে-ব্যবহার ও যে-রূপ ধারণ করলেন, তাকে নিয়তির নির্মম ও নিষ্ঠুর পরিহাস ব্যতীত আর কি বলা যাবে! এরই নাম হয়তো রাজ-চরিত্র ও রাজ চক্র, রাজনীতি বা কূটনীতি। যেখানে ন্যায় ও নীতির কোন বালাই নেই।

আব্বাসীয়গণ ক্ষমতালাভের পরই আলি বংশের ধ্বংসের জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন। এদিকে আলি বংশ অর্থাৎ ইমাম হাসানের বংশধরগণ রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করে সমগ্র সমাজের অসীম ভক্তি ও অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করে ইসলামের ক্রমবিকাশে ও ক্রমবিবর্তনের পুরোধা হিসাবে সমাজে ও জনমানসে যে প্রভাব বিস্তার করেন, তাতে আলি বংশের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল অভূতপূর্ব ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এই চিত্র সন্দিগ্ধচিত্ত খলিফা আল-মনসুরকে বিচলিত করে তুললে খলিফা আলি বংশের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করে অহেতুক দুই গোত্রের সম্পর্কের দূরত্ব ও ব্যবধান বাড়িয়ে তোলেন। ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে এই ব্যবধান আব্বাসীয়দের বিশ্বাসঘাতকতায় ও কপটতায় আলি বংশের বিদ্রোহে পরিণত হয়। অথচ উমাইয়াদের পতনের পর আবুল আব্বাস আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসাধক মহম্মদ কোন রূপ প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু দুর্বলচিত্ত ও সন্দিগ্ধমনা খলিফা আল-মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথম মদিনার অনুষ্ঠিত সভায় আলি সম্প্রদায়ের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ও অসামান্য জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বিচলিত খলিফা তাঁদের বিরুদ্ধে অহেতুক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এদিকে এরূপ পরিস্থিতির জন্য মহম্মদ ও তার ভ্রাতা ইব্রাহিম খলিফা পরিচালিত হজের কাফেলায় যোগদান না করায় খলিফার সন্দেহের মেঘ আরও ঘনীভূত হল। ঈর্ষার আগুন দাবানলে পরিণত হল।

মহম্মদ ও ইব্রাহিমের বিদ্রোহঃ খলিফা মনসুর আব্বাসীয় রাজত্বকে নিষ্কণ্টক করার জন্য আলি বংশের ধ্বংসের জন্য নানা কল্প কল্পনায় জড়িয়ে পড়েন। তিনি মহম্মদ ও ইব্রাহিমকে সরাসরি বন্দী করতে না পেরে ইমাম হাসানের পরিবারবর্গকে কারারুদ্ধ করে বহু নির্যাতনের ভোগী করেই নিষ্কৃতি দেননি, এমনকি অনেককেই মৃত্যু-যন্ত্রণাও ভোগ করতে হল। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে মদিনায় মহম্মদ ও বসরায় ইব্রাহিম প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতে বাধ্য হন। মহম্মদ মদিনার আব্বাসীয় শাসনকর্তাকে বন্দী করে মদিনা দখল করলে হেজাজ ও ইয়েমেনের সমস্ত মানুষ তাঁকে খলিফা বলে আনুগত্য প্রকাশ করে। এমনকি জগদ্বিখ্যাত ইমাম আজম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকও তাঁকে ন্যায়সঙ্গত খলিফা বলে ঘোষণা করেন। তখন খলিফা ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন মহম্মদের বিরুদ্ধে। মহম্মদ মাত্র ৩০০ জন অনুচর সহ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদতের গৌবরলাভ করেন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় উমাইয়া যুগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আব্দুল মালিকের সময় (৬৯২ খ্রীঃ) নিষ্ঠুরের দেবতা হাজ্জাজের নিকট মদিনার খলিফা হজরত আবু বকর (রাঃ)-এর নাতি ও আসমার পুত্র হজরত আব্দুল্লাহর শোচনীয় পরাজয় ও লোমহর্ষক মৃত্যুবরণ।

মহম্মদের মৃত্যুর ফলে আলি-গোত্র নিরাশ হলেও মহম্মদের ভ্রাতা ইব্রাহিম ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে খলিফার মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হন। খলিফা মনসুর এ সংবাদ শ্রবণমাত্র ঈশার নেতৃত্বে এক সুশিক্ষিত বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উভয়পক্ষের প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধে। প্রথমদিকে ইব্রাহিমের প্রচণ্ড আক্রমণে খলিফার সেনাবাহিনী পশ্চাদ্গমনে বাধ্য হয়, কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় ইব্রাহিম বাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। কেননা তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষ। অপরদিকে, খলিফার ছিল

সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী। ইব্রাহিমের পেছনে কোন রাজ-ভাণ্ডার ছিল না, কিন্তু খলিফার ছিল অপরিমিত রসদ। এই সমস্ত নানা কারণে ইব্রাহিম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন। খলিফার দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মূল হল।

আলি বংশের ইমামদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার : মহম্মদ ও ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর খলিফা তাঁদের সকল সমর্থকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। আলি বংশকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য খলিফা বদ্ধপরিকর হয়ে তাঁদের কুফা, বসরা ও মদিনায় সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। মদিনা-বাসীদের সকল সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করা হল, এমনকি মিশর হতে মদিনায় খাদ্য সরবরাহও বন্ধ করা হল। জগদ্বিখ্যাত ইমাম জাফর আস-সাদিকের সম্পত্তি অন্যায়-ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হলে, তিনি ন্যায়বিচারের জন্য খলিফার দরবারে প্রার্থনা করায় শুদ্ধচিত্ত, স্বনামধন্য পণ্ডিতকে প্রচণ্ড নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। একমাত্র মহম্মদ ও ইব্রাহিমের সত্য দাবিকে সমর্থন করার জন্য সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, তুলনাহীন পণ্ডিত ও সাধক ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-কে কারারুদ্ধ ও ইমাম মালিক (রাঃ)-কে বেত্রাঘাত করে খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর শুধু নিজ চরিত্রকে কলঙ্কিত করে নিজেকে একজন অত্যাচারী, স্বৈরাচারী শাহানশাহ্‌ বলেই পরিচিত করে যাননি, বরং সমগ্র রাজ-ইতিহাসকে কালিমা যুক্ত করে গেছেন। এতদ্ব্যতীত অগণিত আলি সমর্থকদের হোরাইবার দুর্গে কারারুদ্ধ অবস্থায় হত্যা করে খলিফা জালেমের পরিচয় রেখে যান। আলি বংশের সকলেই প্রায় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলতে যা বোঝায়—শঠতা, চতুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা. এক কথায় অমানুষিকতা তাঁদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। এই কারণে একদিন উমাইয়া রাজত্বেও তাঁরা নিজেকে রাজনীতির মঞ্চে তুলে ধরতে পারেননি। এঁরা সকলেই হজরত আলি (কঃ)-এর বংশধর, মুয়াবিয়ার নিকট স্বয়ং আলি (রাঃ) কেন পরাজিত হলেন, উমাইয়া যুগের ঐ অধ্যায় অধ্যয়ন করলে—এ সত্য সহজেই অনুধাবন করা যাবে।

উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ দমন : আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উমাইয়া রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যেমন আব্দুল মালিক, আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তেমনি আল-মনসুর। এঁদের দুজনের মধ্যে বহু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উত্তর আফ্রিকার বার্বার ও খারেজীগণ উভয় রাজত্বের প্রথমদিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। এই অঞ্চলে আব্বাসীয় প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য খলিফা মনসুর কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেও কৃতকার্য হতে না পারায় ৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ইয়েজিদ বিন হাসান মুহাল্লাদের নেতৃত্বে ৬০,০০০ সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে সমস্ত বিদ্রোহ নির্মূল করে ৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকায় আব্বাসীয় পতাকা উড্ডীয়মান রাখতে সক্ষম হন। উত্তর আফ্রিকার এই দুঃসাহসিক কায়বোয়ান অধিকারে এবং তথাকার প্রশাসন ও

সমরকুশলতায় সেনাপতি ইয়েজিদ যে বীরত্বের বিচক্ষণতার পরিচয় দেন, তা প্রশংসারও অতীত।

হিরাত ও মাসুলের বিদ্রোহঃ ৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে হিরাতের উস্তাদশিল নামক জনৈক ব্যক্তি নবুয়তের মিথ্যা দাবি করে সিজিস্হান ও হিরাতে বিদ্রোহ করে একটি বিশাল বাহিনী-সহ খোরাসান আক্রমণ করেন। খোরাসানও সিজিস্হানের বিরাট এলাকা বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়ে তথাকার বিদ্রোহ দমনে খলিফার বাহিনী বারবার পর্যুদস্ত হলে খলিফা ইবন খোজাইমার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে বিদ্রোহী নেতা উস্তাদশিলকে কারারুদ্ধ করে তথাকার বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হন। কথিত আছে, এই বিদ্রোহী নেতা নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার উস্তাদশিলের পরমাসুন্দরী পারস্য কন্যা 'মারাজিল' ছিলেন খলিফা হারুনের পত্নী ও খলিফা মামুনের মাতা। ৭৫০-৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে হামদানের আলি-পন্হীদের প্ররোচনায় ও কুর্দদের পরিচালনায় মসুলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটি বিদ্রোহী দল পারস্য ও সিন্ধুতে আধিপত্য বিস্তার করলে খলিফা আল-মনসুর অতি দৃঢ়তার সাথেই এর মোকাবিলা করে এই বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ-সহ বসরা শহরকে নির্মূল করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর সময়োচিত মূল্যবান উপদেশ শহর বসরাকে রক্ষা করে খলিফাকে মহাকালের কলঙ্ক হতে মুক্ত রাখে। এখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য খলিফা দুজন কঠোর মানুষ ইবন বার্মাকে মসুলে ও খালিদের পুত্র ইয়েজিদকে আজারবাইজানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। এইভাবে খলিফা রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহ, ধ্বংসমূলক কার্যকলাপ, ষড়যন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে শক্ত হাতে কোথাও নির্মূল করে, কোথাও মূলোচ্ছেদ করে, কোথাও সমূলে উৎপাটিত করে শুধু সারা রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলাই প্রতিষ্ঠিত করেননি, উমাইয়া খেলাফতের আব্দুল মালিকের ন্যায় নব প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খেলাফতকে দীর্ঘদিনের জন্য সুদৃঢ় ও সুসংহত করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার—তাবারিস্তান ও গিলান অধিকারঃ খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও নৈরাশ্যজনক রাজনীতির সুযোগ্য মোকাবিলা করে দেশকে ঘরে-বাইরে নিষ্কণ্টক করতে না পারলে আব্বাসীয় রাজবংশ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ইসলামের স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করতে পারত কিনা কে জানে। খলিফা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও নিরাপত্তার পূর্ণ বিধান করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তাবারিস্তানের অধিবাসীগণ ইস্পাহানদের নেতৃত্বে ৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানদের আক্রমণ করলে খলিফা ৭৬০ খ্রীস্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে তাবারিস্তান ও গিলান অধিকার করেন। অনুরূপভাবে দায়লাম অধিকৃত হলে মাজুস সম্প্রদায়ের লোকেরা খলিফার বশ্যতা স্বীকার করেন। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খলিফা শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট রাখার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে শত্রুর মোকাবিলা করেন।

এশিয়া মাইনর ঃ এশিয়া মাইনরের উপজাতীয়গণ নব প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খেলাফতের আনুগত্য স্বীকারে অবাধ্যতা প্রকাশ করলে খলিফা খালিদ বিন বার্মাকে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত করে ঐ অঞ্চলের জর্জিয়া, মসুল ও কুর্দিস্তান প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

স্পেন অভিযান ঃ উমাইয়া খেলাফতের স্বাধীনতা-রবি অস্তমিত হলে আবুল আব্বাস আস-সাফফা যখন নিধনযজ্ঞের ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠেন, সেই সময় হিশামের পৌত্র আব্দুর রহমান আত্মরক্ষার জন্য গোপনে সুদূর স্পেনে আশ্রয় নেন। পরে ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে তথায় একটি স্বাধীন উমাইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হন। খলিফা স্পেনে আব্বাসীয় আধিপত্যকে স্থাপন করার জন্য আফ্রিকার শাসনকর্তার নেতৃত্বে তথায় একটি বাহিনী প্রেরণ করলে (উমাইয়া সন্তান আব্দুর রহমানের নিকট) এই বাহিনীর শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণে পলাতক আব্দুর' রহমান আব্বাসীয় বাহিনীর সেনাপতির মস্তককে দেহ হতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের নিকট উপহার স্বরূপ উপঢৌকন পাঠান, তাতে খলিফা মনসুর আব্দুর রহমানের এই ঔদ্ধত্য ও নৃশংসতায় হতবাক হয়ে তাকে কুরাইশদের বাজপাখি বলে অভিহিত করেন। এইভাবে সমগ্র স্পেন বিজয় খলিফার নিকট দুরাশায় পর্যবসিত হলেও স্পেন ও আফ্রিকার কিছু অংশ ব্যতীত সমগ্র আরব সাম্রাজ্য আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনে আসে।

শাসনব্যবস্থা বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা ঃ খলিফা আল-মনসুর সকল বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে স্তিমিত কবে আব্বাসীয় খেলাফতকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার জন্য রাজ্য প্রশাসনে মনোনিবেশ করেন। সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা ও নিরাপত্তার জন্য তিনি একটি কেন্দ্রীয় সরকারও গঠন করেন। কর্মবীর খলিফা স্বয়ং নিজেই শাসন-কার্য পরিচালনা করতেন। আব্বাসীয় রাজত্বের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য 'হাশিমীয়া শহর' স্থাপন করেন। কিন্তু হাশিমীয়া শহর কুফা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত থাকায় আলি গোষ্ঠীর দ্বারা যে কোন সময় অতর্কিতে আক্রমণের সম্ভাবনায় খলিফা মনসুর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে একটি নিরাপদ স্থানে রাজধানীকে স্থানান্তরিত করার অভিপ্রায়ে ধীরস্থির ভাবে একটি আদর্শ স্থানের সন্ধানে শেষাবধি সাসানীয় বংশের প্রাচীন গ্রীষ্মনিবাস মাদাইন বা তেসিফোনের নিকটবর্তী টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে এক স্বভাব-সুন্দর মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত বাগদাদ গ্রামকে রাজধানীতে রূপান্তরিত করার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে সুন্দর স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশে বিশ্ববিখ্যাত বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা করে রাজনীতির বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার পরিচয়ে এক জগৎস্থাপত্য শিল্পের অধ্যায়ে চির-অমরত্ব লাভ করেন। ভৌগোলিক দিক থেকেও বাগদাদের অবস্থান অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ ছিল, টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত থাকায় নদীপথে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া আর্মেনিয়া, ও চীন এবং আরও বহু স্থানের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা খুবই বৃদ্ধি পায়। খলিফা মনসুর সুজলা-সুফলা, সুসমৃদ্ধ ও সুশোভিত বাগদাদ নগরীকে দার-উস-সালাম অর্থাৎ শান্তিনিকেতন নামে অভিহিত করলেন।

'বাগদাদ' শব্দের অর্থ 'খোদাদত্ত'। টাইগ্রীস বা দজলা নদী একে যেমন চীনের সাথে যুক্ত করল, অনতিদূরে ফুরাত নদীও একে অন্যের সাথে মিলিত করল। মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের একটি কালজয়ী কীর্তি ও অবিস্মরণীয় স্মৃতি বাগদাদ নগরী। পাঁচ বছর ১ লক্ষ স্থপতি, কারিগর ও বহু শ্রমিকের সাধনায় ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয়ে বাগদাদ নগরী গড়ে উঠল। এক শুভ-ক্ষণে পবিত্র কোরআন পাঠের পর জ্যোতিষীর নির্ধারিত সময়ে এর নির্মাণকার্য শুরু হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পূর্বে ভূমিতে সুন্দর ছক আঁকা হয়। নগরীকে দুর্ভেদ্য করার জন্য বৃত্তাকার বাগদাদের চতুর্দিক বেষ্টন করে প্রথম দুটো প্রাচীব, অতঃপর একটি গভীর পরিখা, তারপরও ছিল একটি অভ্যন্তরীণ প্রাচীর। প্রথম অর্থাৎ বাহির প্রাচীর এবং মধ্যবর্তী প্রাচীরের অন্তর্বর্তী স্থানে রক্ষবাহিনীর আবাসভূমি এবং মধ্যবর্তী প্রাচীর অভ্যন্তরীণ প্রাচীরের অন্তর্বর্তী স্থানে ছিল কর্মচারীদের বাসস্থান ও বাজার। এই প্রাচীর গাত্রের সমান ব্যবধানে চারটি সুউচ্চ তোরণ রাজ্যের চারটি প্রধান রাজপথের সাথে বাগদাদকে যুক্ত করে। নগরীর কেন্দ্রস্থলে নীল গম্বুজবিশিষ্ট মনোরম রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন জগদ্বিখ্যাত জুমা-মসজিদ অবস্থিত।

নগরীর বাইরে খলিফা 'কাসরুল খুলদ' এবং 'রুসাফা' নামক আরও দুটো প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রুসাফা তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র আল-মাহদীর জন্য নির্মিত হয়েছিল। এই নগরী শুধু যে সামরিক দিক থেকেই গুরুত্ব লাভ করেছিল তা নয়, একাধিক নানা কারণে বাগদাদ বিশ্ববিখ্যাত নগরীর খ্যাতিলাভ করে। উমাইয়াদের শক্তির উৎস ছিল সিরিয়া, সঙ্গে সঙ্গে কুফা ও বসরার অধিবাসীগণ বহুকাল যাবৎ রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে লিপ্ত ছিল। সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে বাগদাদের অবস্থান থাকায়, একদিকে যেমন বহিঃশত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হতে নিরাপদ ছিল, অন্যদিকে ঠিক তেমনিভাবে রাজ্যের সকল দিকে সহজে নজর দেওয়াও খলিফার পক্ষে সহজ হয়েছিল। জলপথে ও স্থলপথে দেশ-বিদেশের সাথে বাণিজ্য যোগাযোগ বাগদাদকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধশালী করে তোলে। বাগদাদের অনতিদূরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ও স্মৃতিকাগারে টেসিফোন, ব্যাবিলন, নিনিভা ও উবের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্মৃতি বাগদাদকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। বাগদাদ যেন তাদের উত্তরাধিকারীর গৌরব ও খ্যাতিলাভ করল। পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে পারস্যের ভাবধারা বাগদাদের জীবনযাত্রা, শাসন-প্রণালী এবং স্বয়ং খলিফার

দরবারে চাল-চলন, আদব-কায়দা, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিকে অনেকাংশেই প্রভাবান্বিত করে। খলিফা মনসুর ছিলেন মুক্ত মনের মানুষ, গোঁড়ামি, ভাঁড়ামিকে তিনি খুবই ঘৃণার চোখে দেখতেন। যেখানে যা কিছু সুন্দর, তাকেই তিনি খোলা মন-প্রাণে সাদরে বরণ করতেন। তিনি ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির একজন চরম গুণগ্রাহী ব্যক্তি। তাই গ্রীক ও পারস্য ভাষায় লিখিত জ্ঞানভাণ্ডারকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য বাগদাদ শহরে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর খুলে দেন। এদিক দিয়েও বাগদাদ হয়ে উঠল জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থকেন্দ্র। সুতরাং মানব সমাজের এমন কোন দিক নেই, যে দিককে বাগদাদ একদিন আলো দান করেনি।

৭৬২ হতে ৭৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর সমগ্র সাম্রাজ্যের সুদক্ষ কারিগর, শিল্পী ও স্থপতিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠল এই সুষমামণ্ডিত আরব্য উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ নগরী। তখন খলিফা আল-মনসুরের নামানুসারে রাজধানী বাগদাদকে মনসুরিয়া নামেও অভিহিত করা হত। মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন, তৎকালীন বিশ্বের বিস্ময়, আব্বাসীয় খেলাফতের অমর কীর্তি, ইসলামের ইতিহাসের অপূর্ব স্মৃতিগাথা এবং মধ্যযুগের সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণকেন্দ্র ছিল—বাগদাদ।

শাসন প্রণালী, গুপ্তচর ও বদলি প্রথা ঃ আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর শুধু রাজ্য বিস্তার ও বিদ্রোহ দমনই করেননি, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে কঠোর শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। গুপ্তচর প্রথার মাধ্যমে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ওপর নজর রাখতেন। সমাজ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রদেশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য খলিফা রাজধানী সিরিয়ার দামেস্ক হতে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে ইরাকের বাগদাদে স্থানান্তরিত করেন। পুরানো ও নতুন বিজিত প্রদেশগুলির সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে বিশ্বাসী, দক্ষ ও দায়িত্ব-সম্পন্ন শাসক নিয়োগ করে শাসনকার্যকে দুর্নীতিমুক্ত এবং বিদ্রোহের প্রবণতাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য প্রাদেশিক গভর্নরসহ সকল সরকারী কর্মচারীদের বদলী প্রথার প্রচলন করেন। তিনি পূর্ব প্রথা রহিত করে বিজিত দেশসমূহে আরবদের স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দেন এবং অন-আরবদের সাথে আরবদের বিবাহ প্রথাকেও উৎসাহিত করে খলিফা চরম উদারতার পরিচয় দিয়ে সকলেরই শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিতে সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি বর্ধনে সক্ষম হন।

পারস্য প্রভাব ঃ প্রাচীন পারস্যের শাসনব্যবস্থাকে খলিফা অতি উদার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তথাকার যা কিছু গ্রহণীয় ও বর্জনীয় সকল কিছুকে আপন শাসনব্যবস্থায় প্রবর্তিত করে সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামোকেই সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় করেন। হিট্টি বলেন—"বাগদাদে খলিফাগণ সাসানীয় খোসরুবাদের ভিত্তিতে একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেন। আরবী ইসলাম পারস্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত

হল। খেলাফত আরব শেখতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করল।" এক কথায়, বাগদাদ শহর পারস্যের সন্নিকটবর্তী হওয়ায় পারস্যের সাকা উপাধি, মদ, মহিলা, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক সকল কিছুই আব্বাসীয় খেলাফতে সসম্মানে স্থান লাভ করল। তাই আজও সমগ্র মুসলিম-জাহান এবং ইসলামি দুনিয়াতে আরবী ভাষার পর পার্শী ভাষার এত প্রভাব, এর মূলে আছে আব্বাসীয় যুগের অবদান।

খলিফা পারস্যের পোশাক-পরিচ্ছদকেও সাদরে বরণ করে তথাকার শিরস্ত্রাণকেও আপন মস্তকে ব্যবহার করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তার শাসনের পূর্বে ইসলামি রাষ্ট্রে কোথাও উজির বলে কোন পদ ছিল না। তাঁর সময়ে উজির নামে একজন প্রধান সরকারী কর্মচারীর পদ সৃষ্টি হয়। পারস্যবাসী খালিদ ইবন বার্মাকে খলিফা তাঁর প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করে সমগ্র পারস্যবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হতে আস্থাভাজনে উন্নীত হন।

বিচার বিভাগ ঃ খলিফা মনসুর রাজনীতিতে কোথাও বিশ্বাসঘাতক, কোথাও নিষ্ঠুর, কোথাও প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী, কিন্তু প্রশাসনিক বিচারে ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। নিম্নস্তর হতে আরম্ভ করে প্রাদেশিক স্তরে এবং রাজধানী বাগদাদে প্রধান কাজী নিযুক্ত করা হয়। মহম্মদ বিন আব্দুর রহমান নামক একজন প্রথিত-যশা জ্ঞানী ও গুণী প্রধান কাজীর পদ অলঙ্কৃত করেন এবং চরম যোগ্যতার সাথে একাধিকক্রমে ২০ বছর পর্যন্ত ঐ গুরুদায়িত্ব গৌরবের সাথে পালন করতে সক্ষম হন। তাঁর পরলোকগমনের পর খলিফা জগদ্বিখ্যাত ইমাম আবু হানিফাকে ঐ বিশেষ সম্মানীয় পদে নিয়োগ করার জন্যে দরবারে আহ্বান করলে জগদ্বরেণ্য ইমাম অনিচ্ছা প্রকাশ করেন একটি কথা বলে—'আমি এই পদের অযোগ্য।" তখন খলিফা বলেন—"আমি আপনাকে যোগ্য মনে করি।" উত্তরে ইমাম বলেন—"আপনার কথা সত্য হলে আমি মিথ্যাবাদী, এবং কোন মিথ্যাবাদী বিচারক হতে পারেন না। আর আমার কথা সত্য হলে, কোন অযোগ্য ব্যক্তিও বিচারক হতে পারেন না।" খলিফা জগৎ-মনীষার এরূপ উত্তরে একেবারেই নির্বাক ও নীরব হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর রাজরোষ সরব হয়ে ওঠায় বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম আবু হানিফাকে পরে কারা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এটা ছিল রাজ-চরিত্রের ব্যাপার, গূঢ় রহস্য খেয়ালীপনা। কিন্তু বিচারে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা পছন্দ করতেন। একবার কয়েকজন উটের মালিকের অভিযোগক্রমে মদিনার কাজী স্বয়ং খলিফাকে এজলাসে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে খলিফা অনতিবিলম্বে একমাত্র হাজিবকে সঙ্গে নিয়ে কাজীর দরবারে আসামীর কাঠগোড়ায় হাজির হন। কাজী খলিফাকে কোন-রকমের সম্মান প্রদর্শন না করে, না উঠে সরাসরি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়ে উভয়পক্ষের সমস্ত কিছু জানার পর ফরিয়াদীর পক্ষে রায় দেন। খলিফা কাজীর এই ব্যবহারে ও ন্যায়নিষ্ঠায় এতই খুশি হয়েছিলেন যে, রাজ-দরবারে ফেরার পর তাঁকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত ও পুরস্কৃত করেন।

জনহিতকর কার্যাবলী : খলিফার জীবনে প্রথম কাজ ছিল বিদ্রোহ দমন, তারপর শাসনব্যবস্থার দৃঢ়করণ, অতঃপর ছিল জনগণের মঙ্গল করা। এই মঙ্গল কাজের জন্য প্রথম তিনি রাজ্যের সমস্ত জমির জরিপ দ্বারা ভূমির পরিমাণ ও রাজস্ব নির্ধারণ করেন। কৃষির ও কৃষকের উন্নতির জন্য নানা খাল খননেরও কাজ সমাধা করেন। সমাজে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থে কড়া পুলিশবাহিনী গঠন করে সমাজকে আবিলমুক্ত করেন। তাঁর আমলে রাজধানী বাগদাদ হতে সমগ্র দেশ সুখ-শান্তিতে ভরে ওঠে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে খলিফা বাজারদর সর্বদাই কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তখনকার দিনে সেখানে ২৫ পয়সায় এক মণ গো-মাংস বা ৩০ সের খাসির মাংস বা ৫ সের মধু অথবা ৬ সের ঘি পাওয়া যেত। স্থাপত্যশিল্পেও খলিফার অবদান ছিল অপরিসীম। বাগদাদ-সহ বহু শহর তিনি নির্মাণ করে যান। জনসাধারণের মঙ্গলার্থে বহু রাস্তা, সরাইখানা, হাসপাতাল, শিক্ষাগার প্রভৃতি স্থাপন করে অমর কীর্তি রেখে গেছেন।

খলিফার মনোনয়ন : খলিফা মনোনয়নে উমাইয়া ও আব্বাসীয়াদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রায় সকলেই বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরও এই অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পাননি। আব্বাসীয় রাজত্বের জনক খলিফা আবুল আব্বাস মৃত্যুকালে তাঁর ভ্রাতা আবু জাফর ও ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশাকে যথাক্রমে পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন করে যান। কিন্তু আবু জাফর আব্বাসীয় খেলাফতকে সুদৃঢ় ও বিপদমুক্ত করার পর ঈশাকে খেলাফতের দাবি প্রত্যাখান করতে বাধ্য করেন। পরে খলিফা তাঁর আপন পুত্র মহম্মদকে আল-মাহদি উপাধিতে ভূষিত করে ৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে পূর্বকথা লঙ্ঘন করে শঠতার পরিচয় দেন। উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া যেমন আপন দরবারে সকলকে ডেকে অযোগ্য পুত্র ইয়েজীদের পক্ষে জনমত গঠন করেছিলেন, খলিফা মনসুরও জীবিতকালে ঠিক তাই করলেন। অভিজ্ঞ জ্ঞানী খলিফাগণ ভাবী উত্তরাধিকার মনোনয়নে কোন স্থির নীতি অবলম্বন না করায় পরবর্তীকালে গৃহবিবাদ তুঙ্গে উঠল এবং আব্বাসীয় খেলাফতের পতনকেও ত্বরান্বিত করল। এই উত্তরাধিকার মনোনয়নে উমাইয়া হতে আব্বাসীয় পর্যন্ত কোন খলিফাই বিচক্ষণতার, দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা মুক্ত করে জাতীয় স্বার্থকে রাহুমুক্ত করতে পারেননি।

খলিফার মৃত্যু : ৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে খলিফা বার্ষিক হজ্ব পালন করার জন্য কাবা অভিমুখে রওনা হয়ে পথিমধ্যে পীড়িত হয়ে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে সামান্য সুস্থতা লাভ করে। তারপর যাত্রা করে মক্কার সন্নিকটবর্তী বির মায়মুনা নামক স্থানে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৬৫ বছর বয়সে দীর্ঘ ২২ বছর রাজত্ব করে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করে শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সমাধিক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী শোনা যায়, যাতে শত্রুকুল খলিফার সমাধিটিকে অপবিত্র ও ধ্বংস করতে না পারে সেইজন্য একশোটি সমাধি তৈরি করে গোপনে একটিতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কেননা এই আব্বাসীয়গণ ক্ষমতালাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই উমাইয়া খলিফাদের একমাত্র মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় উমর ব্যতীত কারো সমাধিকেই অক্ষত রাখেননি। ধ্বংস-কারীদের মধ্যে খলিফা আবু জাফরও অন্যতম একজন ছিলেন। তাই আজ তিনি তাঁর আপন সমাধিকেই রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে অতি গোপনে সমাধিস্থ হলেন। যত বড়ই শক্তিধর মানুষ হন, অর্বাচীনের পরিণতি এইরূপই হয়। এইজন্যই এই ইতিহাসকে ইসলামের ইতিহাস না বলে মুসলিম-ইতিহাস বলা উচিত। কেননা ইসলাম কোন মতেই সমাধি ধ্বংস করতে বলে না, বরং জিয়ারত বা মৃতের জন্য মঙ্গল কামনা বা প্রার্থনা করতে বলে। কিন্তু উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণের প্রত্যেকেই যাঁর যা ইচ্ছা তিনি তাই করে গেছেন, যা পুরোপুরি অনৈসলামিক।

চরিত্রঃ খলিফা আল-মনসুর দীর্ঘকায়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পাতলা দেহ ও পাতলা দাড়িবিশিষ্ট সুপুরুষ ছিলেন। খলিফা ছিলেন দৃঢ়মনা কঠোর পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণ ও মিতব্যয়ী। তিনি খলিফা হওয়ার পর ঘরে-বাইরের বিপদে এত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন যে, কথিত আছে তিনি খলিফার হওয়ার পূর্বে তাঁর মাথার চুল সবই কালো ছিল, কিন্তু খলিফা হওয়ার পরে মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই তাঁর একটি চুলও আর কালো ছিল না। এই ছিল তাঁর কঠোর কর্মময় জীবন। পূর্বাহ্নে রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সমাধা করে অপরাহ্নে পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং সন্ধ্যার পর রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের আবেদন-নিবেদন শুনতেন। পরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সারা দিনের সমস্ত কিছুকে নিয়ে উজিরদের সাথে গোপন পরামর্শ করতেন। এইভাবে শয়নে তাঁর অধিক রাত্রি হলেও অতি প্রত্যূষেই শয্যা ত্যাগ করতেন। এরপরও তিনি স্বয়ং সেনাবাহিনীরও সর্বময়কর্তা ছিলেন। সেনাবাহিনীর প্রতি খলিফার তীব্র নজর ছিল, তাদের সুবিধা-অসুবিধা সমস্ত কিছুই আপন নজরে পরিদর্শন করে আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বিচারেও ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ হলে খলিফা নিজেকেও অন্যান্য আসামীর ন্যায় বিচারকের কাঠগড়াতে দাঁড় করাতেও দ্বিধা বোধ না করে চরম ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এটা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। তিনি এতই মিতাচারী ছিলেন যে, এতকিছু করার ও গড়ার পরও এত অর্থ সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন, যা তাঁর পুত্রের পরবর্তী ১০ বছরের ব্যয় নির্বাহের জন্য ছিল যথেষ্ট। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে অনিবার্যভাবেই খলিফাকে—পরিশ্রমী, জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, দূরদর্শী, প্রজাবৎসল ও আদর্শ নরপতি বলা যায়।

অপরদিকে, এই খলিফাকেই আবার বিশ্বাসঘাতক, কপট, অত্যাচারী, অকৃতজ্ঞ

ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য এবং স্বৈরাচারী সম্রাট বলা যায়। এই সমস্ত দোষে কেন খলিফা দুষ্ট; তিনি তাঁর আপন পিতৃব্য আব্দুল্লাহ, যাঁর একমাত্র রণনৈপুণ্যে একদিন উমাইয়া খেলাফত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং যে ধ্বংসস্তূপের ওপর আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা হয়, সেই বৃদ্ধ আব্দুল্লাহকে যেভাবে দীর্ঘ সাত বছর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে পরিশেষে যে ভাবে তাঁর জীবনাবসান করেন, সেখানে খলিফা বিশ্বাস-ঘাতক, কপট, অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ। আবার যে আবু মুসলিমের অসামান্য অবদান ব্যতীত আব্বাসীয় খেলাফত কোনদিনই সূর্যের আলো দেখত কি না সন্দেহের কথা, সেই মুসলিমকেই অসাধারণ যোগ্যব্যক্তি ভেবে ও তাঁর ভয়ে, পাছে কোনদিন শত্রুতা করেন, শুধু এই সন্দেহজনক অমূলক আশঙ্কাতেই আবু মুসলিমের মতো মানুষকে গভীর ষড়যন্ত্রে হত্যা করে খলিফা চরম অকৃতজ্ঞের ও শঠতার পরিচয় দেন। সর্বোপরি যে হজরত আলি বংশের দাবিকে তাঁরা তাঁদের রাজনীতির মূলধন করে সংগ্রামে সফলতা অর্জন করলেন, সেই আলি বংশকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য যেভাবে মহম্মদ ও ইব্রাহিমকে হত্যা করা হয়, তা খলিফার চরম কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় বহন করে। খলিফা মনসুর খুবই ভাল ভাবে জানতেন জগদ্বরেণ্য পণ্ডিতগণ কোনদিনই রাজনীতিতে নামবেন না। তবুও তাঁরা শুধু সত্য ও ন্যায়কে সমর্থন করায় খলিফা তাঁদের প্রতি যে অমানুষিক ব্যবহার করেন, তাতে সমগ্র মুসলিম-জাহান ব্যথিত ও মর্মাহত। ইমাম আবু জাফর আস-সাদেক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের প্রতি খলিফার যে নির্মম ব্যবহার, তা শুধু তাঁদেরকেই কষ্ট দেয়নি, সমগ্র মুসলিম-সমাজের অনুভূতিতে আঘাত হেনে খলিফাকে অমানুষেরই পর্যায়ে নামিয়েছে।

খলিফা আল-মনসুর এই সমস্ত যা কিছুই স্বজ্ঞানে করেছেন, তা করেছেন শুধু আব্বাসীয় খেলাফতকে স্থায়ী ও দৃঢ় করতে। রাষ্ট্রের কল্যাণ, স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি খলিফাকে করেছিল দুর্বার। আব্বাসীয় খেলাফতকে স্থাপন করতে আল আব্বাস যত কিছু নিন্দনীয় কাজ করেছিলেন সেই রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। ঐ সমস্ত কাজের প্রতিধ্বনি পাই খলিফা মনসুরের মধ্যেও।

আবার ঐ একই চরিত্র লক্ষ্য করি ধর্মীয় আচরণে। ধর্মের দৈনন্দিন আচার-আচরণ পালনে খলিফা ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। এখানে সাধারণ মানুষ সকলেই জানত খলিফা ধার্মিক মানুষ, ধর্মপালন করেন। শুধু তা-ই নয়, কোন রকমের কোন অনৈসলামিক কাজ তাঁর দরবারকে কলুষিত করতে পারেনি। এখানেও ছিলেন আদর্শ নরপতি ও আদর্শ মুসলমান।

তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আমীর আলি বলেন—"নির্মম, স্বার্থান্বেষী ও অবিবেচক খলিফা মনসুর তাঁর নিজের অথবা তাঁর বংশের স্বার্থের পরিপন্থী বা বিপজ্জনক মনে করলে তিনি কাউকেই রেহাই দিতেন না।" অধ্যাপক মুইর বলেন—"সর্বগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য ইতিহাসের

রায় মনসুরের বিরুদ্ধে যাবে। যদি আমরা তাঁর চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার নিকৃষ্ট গুণটি ভুলে যাই, তাহলে মনসুরের কৃতিত্ব অন্যভাবে বিচার হবে।"

রাজা হিসাবে, বাদশাহ হিসাবে, রাজ্য সংরক্ষণে ও রাজ্য বৃদ্ধিতে, প্রজাবৎসল রাজা হিসাবে, প্রশাসক হিসাবে, কূটনীতি-রাজনীতিবিদ হিসাবে খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর যে মেধা ও প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন, সেখানে তিনি জগদ্বিখ্যাত ও অমর কৃতিত্বের ইতিহাস স্রষ্টা।

আল-মনসুরের কৃতিত্ব-প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা: আবু জাফর আল-মনসুরকে বিশেষ কয়েকটি কারণে আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। প্রতিটি রাজবংশের পেছনে এইরূপ এক একটি ক্ষণজন্মা পুরুষকে দেখা যায়—কেউ বা জন্মদাতা, কেউ বা প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আমরা উমাইয়া রাজত্বেও এটা লক্ষ্য করেছি। মুয়াবিয়া ছিলেন জন্মদাতা। আবুল মালেক ছিলেন প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। আব্বাসীয় রাজত্বের জন্মদাতা ছিলেন আব্দুল আব্বাস আস-সাফফা এবং সেই পাঁচশো বছর রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—আবু জাফর আল-মনসুর। যে কয়েকটি কারণে তিনি প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করেছেন, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান কঠোর হস্তে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন দ্বারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়, রাজ্য সম্প্রসারণ এবং সেই রাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার প্রচলন। তৃতীয়, সুযোগ্য প্রশাসক। সকাল হতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত খলিফার দৈনন্দিন কর্মসূচী লক্ষ্য করলে জানা যায়—তিনি ছিলেন একজন নিরলস প্রশাসক ও চরম প্রজাহিতৈষী সম্রাট। চতুর্থ, তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের সম্মান দান করেছে। পঞ্চম, তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষা, স্থাপত্য ও কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এই সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় কেন আবু জাফর আল-মনসুর পাঁচশো বছরের আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

বিদ্রোহ দমন: আবু জাফর সিংহাসন লাভের পূর্বেই ইরাকের শাসনকর্তা রূপে সমগ্র দেশের বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আব্বাসীয় রাজত্বের জনক ও প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস চার বছর রাজত্ব করার পরও দেশের বিদ্রোহী শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে সক্ষম হননি। তাই আবুল আব্বাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সমস্ত বিদ্রোহের দাবানল আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সম্মুখীন হলেন নতুন খলিফা আবু জাফর। পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন এবং পূর্বে পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ খলিফাকে একেবারেই বিচলিত করে তোলে। কোথাও বিভিন্ন মতাবলম্বী ধর্মীয় আন্দোলন, কোথাও রাজনৈতিক গোষ্ঠী আন্দোলন, কোথাও বা রাজবংশীয় আন্দোলন, কোথাও বা স্বার্থান্বেষী শাসকবর্গের বিদ্রোহ, গোপন

ষড়যন্ত্র ইত্যাদি খলিফার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুললে তিনি অত্যন্ত কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমনে মনোসংযোগ করেন। যেখানে তাঁকে নিষ্ঠুর হতেও নিষ্ঠুর হতে হল, এবং নির্মম হতেও নির্মম হতে হল, যার ফলে প্রাণ হারালেন খলিফার উচ্চাভিলাষী পিতৃব্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল্লাহ, প্রাণ দিলেন আব্বাসীয় রাজত্বের জন্মলগ্নের মহাসাধক আবু মুসলিম, প্রাণ হারালেন মাজুস দলপতি সানবাদ, খোরাসানের বিক্ষুব্ধ শাসনকর্তা উস্তাদ শীস, প্রশমিত হল ধর্মদ্রোহী রাওয়ান্দিয়া গোষ্ঠী, উত্তর আফ্রিকার বর্বর ও খারেজী সম্প্রদায়। সবের ঊর্ধ্বে যাঁদের নামে প্রচারনা চালিয়ে আব্বাসীয় খেলাফত জনসমুক্ষে দানা বাঁধার সুযোগ পেল সেই আলি-পন্থী দলনেতা মহম্মদ ও ইব্রাহিমকেও হত্যা করা হল। এইভাবে একের পর এক সকল বিদ্রোহকে খতম করে খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর রাষ্ট্রকে শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হন। এই সকল বিদ্রোহকে সমূলে ধ্বংস করতে না পারলে আব্বাসীয় খেলাফত অঙ্কুরেই বিনাশ হত। তাই খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরকে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

রাজ্য সম্প্রসারণঃ খলিফা অতি কঠোর হস্তে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রশমিত করে সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে সক্ষম হন। বিদ্রোহের উৎস-গুলিকে মূলোৎপাটন করে খলিফা রাজ্য সম্প্রসারণে ধীর ও স্থিরভাবে মনোসংযোগ করেন। তাঁরই দ্বারা তাবারিস্তান, আর্মেনিয়া, কুর্দিস্থান ও উত্তর আফ্রিকা আব্বাসীয় খেলাফতের পতাকা শোভাবর্ধন করে। খলিফা মনসুরের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব তিনি রোমান সম্রাটের আক্রমণ প্রতিহত করে তাঁকে কর দিতে বাধ্য করেন। উমাইয়া রাজত্বের ধ্বংসস্তূপের ওপর আব্বাসীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনে প্রতিদ্বন্দ্বী উমাইয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খলিফা মনসুরের পক্ষে সেখানকার আইবোরিয়ান উপদ্বীপ পুনর্দখল করা আর সম্ভব হয়নি। এটা ছিল তাঁর কূটনীতি। তিনি স্পেনের উমাইয়াগণকে বিচলিত করতে ইচ্ছাও করেননি, কেননা তাঁরা বিচলিত হলে তাঁকেও বিব্রত হতে হবে এটা তিনি জানতেন। এই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বলে ধীরে ধীরে তিনি আপন রাজ্যকে একটা সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করেন। এই রাজ্যের স্থিতিশীলতার জন্য সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বহু সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় রেখে যান।

দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞঃ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য খলিফা আল-মনসুর প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তাঁর শাসনকার্যে ধর্ম ও রাজনীতির যুগল অশ্বকে এক সাথে ধাবমান করার শক্তিধারণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। উমাইয়া রাজত্বের সামান্য দু'-একজন খলিফা ব্যতীত কেউই ধর্মের কোন সম্পর্ক না রেখে পরবর্তীকালে নিজেদের পাপাত্মাতে পরিণত করে অগণিত জনগণের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই দুর্ভাগ্য খলিফা মনসুরের

ভাগ্যে ঘটেনি। তিনি 'আমীর-উল-মো'মেনীন' (বিশ্বাসীদের নেতা) উপাধি গ্রহণ করে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করে আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গ ও পার্থিব নেতৃবর্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হন। এইভাবে খলিফা ইহকাল ও পরকাল দুকালেরই ফসলকে দু হাতে তুলে নিতে সক্ষম হন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে জগদ্বিখ্যাত—'সুন্নী মতবাদ'। এই সমাজেই ইসলাম ধর্মের বিখ্যাত চার মজহাবের (চারটি চিন্তাধারা—হানাফী, শাফী, মালেকী, ও হাম্বলী) দুটি—হানাফী ও মালেকী মজহাবের উৎপত্তি হয়। ফলে খলিফা মনসুর আজ শুধু পার্থিব-জগতের সম্রাট রূপেই সীমাবদ্ধ থাকলেন না, ধর্মগুরুর আসনও লাভ করলেন। এই সুন্নী মতবাদকে আব্বাসীয়-বিরোধী মতবাদ শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবন্ধক হিসাবে ব্যবহার করতেও সক্ষম হন, এবং শাসনতন্ত্রের প্রকৃত রূপও দান করতে সক্ষম হন, যে পথ বহুকাল যাবৎ তাঁর বংশধরদের সসম্মানে পরিচালনা করে। হিট্টি বলেন—"মুয়াবিয়ার প্রশাসন নীতি যেভাবে উমাইয়াদের পথ প্রদর্শন করে, ঠিক তেমনি ভাবে আল-মনসুরের প্রশাসন নীতিও তাঁর বংশধর আব্বাসীয়গণদের বহুকাল পরিচালিত করে।" ইহকাল ও পরকালের যুগল অশ্বকে এক সাথে সমান বেগে ধাবমান করার মতো সম্রাট ইতিহাসে বিরল, আব্বাসীয় রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আল-মনসুর ইতিহাসের সেই বিরল ব্যক্তি।

সুযোগ্য শাসক ঃ এক কথায় খলিফা আল-মনসুরকে একজন অসাধারণ কর্মবীর পুরুষ বলা চলে। তাই আমীর আলি বলেন—"রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও শাসক হিসাবে আল-মনসুর এক প্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।" খলিফার দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী হতে এ কথা অতি স্পষ্টাক্ষরে অনুমান করা যায়—তিনি কতখানি কর্মদক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন, এবং কতখানি সততা ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতেন। ঐতিহাসিক ইবন আল-আসীর বলেন—"তিনি পূর্বাহ্নে অধিকাংশ সময় যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে কাটাতেন, তার মধ্যে ফরমান জারি, কর্মচারী নিয়োগ ও পদচ্যুতি, সৈন্য ও সীমান্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তা বিধান, প্রজাদের অবস্থা ও বাসস্থানের উন্নতি বিধান, আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ইত্যাদি কাজে অতিবাহিত করতেন। মধ্যাহ্নে সামান্য বিশ্রাম নিতেন। পরে অপরাহ্নে সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে কাটাতেন। মাগরিবের নামাজের পর অর্থাৎ সন্ধ্যা হতে কিছু রাত্রি পর্যন্ত তিনি দরবারে বসে সারা দিনের সংবাদ শ্রবণ করতেন। অতঃপর রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মন্ত্রীবর্গের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কাজে নিমগ্ন থাকতেন। ফজরের নামাজের জন্য অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করতেন। তিনি প্রত্যহ স্বয়ং সেনাবাহিনী পরিদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনবোধে সীমান্ত দুর্গগুলিও পর্যবেক্ষণ করতেন। সেনাবাহিনীকে তিনি বিভিন্ন সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত

করেছিলেন। তিনি নিজে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করতেন। যার জন্য অনেকে তাঁকে 'আদ-দাওয়ানাফী' অর্থাৎ হিসাবরক্ষক বলতেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার পর রাজ্যবিস্তারে মনোসংযোগ করেন, এবং আব্বাসীয় খেলাফতকে সুদৃঢ় ও সুসংঘবদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তৎকালীন বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট গোলাকৃতি দুর্গনগরী বাগদাদ নির্মাণ করেন। সামরিক স্থাপত্যশিল্পে এর দুর্ভেদ্যতা আজও বিস্ময়ের বস্তু। এতদ্ব্যতীত মাহদীয়া নামে অপর শহরটিও তাঁর স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন বহন করে। প্রজাবর্গের সুবিধার জন্য বহু মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, খাল, পয়ঃ-প্রণালী প্রভৃতি স্থাপন করেন। অন্যদিকে পুলিশবাহিনী, গুপ্তচর প্রথা, কাজী নিয়োগ, জমি জরিপ, আদম সুমারি প্রভৃতি কাজ দ্বারা শাসনব্যবস্থাকে পূর্ণ রূপ দিতে সক্ষম হন। তাই মুইর বলেন—"তাঁর শাসনব্যবস্থা বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য বহন করে।"

আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ঃ খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর আব্বাসীয় খেলাফতের ভিত্তিকে যেমন সুদৃঢ় করেছিলেন, তার স্থায়িত্বকেও তেমনি সুনিশ্চিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে তাঁরই বংশধরগণ বহুকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমীর আলি বলেন —"খলিফা আল-মনসুর এশিয়ায় জনপ্রিয়তা অর্জনকারী এক গৌরবোজ্জ্বল খেলাফতের সূচনা করেন।" উমাইয়া যুগের খলিফা আব্দুল মালিকের চার পুত্র পরবর্তীকালে খলিফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করায় আব্দুল মালিককে 'রাজেন্দ্র' (Father of Kings) বলা হয়।, এইদিক থেকে খলিফা আল-মনসুর অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। কেননা হিট্টি বলেন—"আস-সাফফার (আবুল আব্বাস) স্থলে তিনিই (মনসুর) নতুন রাজবংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, পরবর্তীকালে যে পঁয়ত্রিশ জন আব্বাসীয় তাঁর উত্তরাধিকারী হন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁরই বংশধর।" সুতরাং সকল দিক থেকেই এক বাক্যে স্বীকার করা যায়—খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর ছিলেন আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির গুণগ্রাহী মনসুর ঃ যে আব্বাসীয় রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন আবুল আব্বাস, সেই রাজত্বের সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট আল-মনসুর। শিক্ষা বিস্তারের জন্য সম্রাটের হস্ত ছিল চির মুক্ত। তাঁর সময়ে দেশে অসংখ্য মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মিত হয়। ইসলাম ধর্মে তথা মুসলমান-সমাজে সাধারণত চারটি মজহাব (দল) পরিলক্ষিত হয়—হানাফী, শাফী, মালেকী, হাম্বলী। ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর সময় হতে খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া রাজত্বকাল (৫৭০—৭৫০ খ্রীঃ) পর্যন্ত এগুলির কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে এদের জন্ম।

বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ যে হানাফী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সেই হানাফী মজহাব ও মালেকী মজহাব খলিফা আল-মনসুরের সময় গড়ে ওঠে।

পারস্য প্রভাব : উমাইয়া রাজত্বকাল পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজ-দরবার হতে সমাজের সর্বস্তরে আরবীয় প্রভাব একচ্ছত্রময়। আল-মনসুরের সময় আরব-সমাজের নদীতে ঐ প্রভাবের ভাটা পড়ল। পরক্ষণে নতুন জোয়ারে আরব যেন তার শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, পোশাক-পরিচ্ছদ শাসনে-সংস্কারে নব-জীবন লাভ করল। কোন দেশের সংস্কৃতি কোনদিনই একাকী বলীয়ান হয়ে উঠতে পারেনি। আল-মনসুরের সময় আরবের পারস্য জয় পূর্ণতা লাভ করল। একদিন আরব পারস্যের মাটিকে জয় করেছিল, আজ পারস্যের মনকেও জয় করল। পারস্য-প্রভাবে প্রভাবান্বিত আরব সম্রাট আজ পরিধান করলেন পারস্য-শিরস্ত্রাণ। পারস্যবাসীগণ আজ যেন সম্রাটকে আপন বলেই গ্রহণ করতে পারলেন। পারস্যের প্রাচীন শাসন প্রথানুযায়ী উজির নামে একটি নতুন পদও সৃষ্টি হল খলিফার দরবারে। এই উজির কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থাও যথেষ্টভাবে প্রভাবান্বিত হল। খালিদ বিন বার্মাক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর বহু পারস্যবাসী রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়ারও সুযোগ লাভ করলেন। পরবর্তীকালে এই বার্মেকী বংশ আব্বাসীয় রাজত্বে বহু বিশিষ্ট অবদান রেখে যায়।

আব্বাসীয় সভ্যতার জনক : একটি মানুষের অভাবনীয় গুণ ও যোগ্যতা না থাকলে অভাবনীয় কৃতকার্যতাও লাভ করতে পারে না। খলিফা মনসুর যেমন কাব্য-রসিক ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য। তাঁর রাজত্বকাল ও রাজদরবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণায় সাধনা-মন্দিরে পরিণত হয়েছিল। খলিফা নিজে ছিলেন কাব্য-রসিক, অবসর সময়ে প্রাচীন আরবী কবিতাসমূহ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে ওগুলিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য অবদান রেখে যান। কোথাও কোরআনের ব্যাখ্যা, কোথাও তাঁর যথার্থ টীকা-টিপ্পনী-সহ কোরআনের তফসীর চর্চা, কোথাও মহানবীর বাণী—হাদিসের সংরক্ষণ ও সংকলন ব্যবস্থা খলিফার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বিদ্যোৎসাহী নরপতি শুধু দেশের পর দেশ জয় করে তাদের ধন-রত্নগুলি আহরণ করাকেই সম্পদ লাভের একমাত্র পথ ও পন্থা বিবেচনা করেনি, তিনি সেই সমস্ত দেশের সংস্কৃতজাত সম্পদকেও লাভ করে আপন রাজত্বের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাঁর সৃষ্টিকে কালের ইতিহাসে সাক্ষী রূপে রেখে যান। সম্রাটের অকুণ্ঠ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত কোনদিনই প্রাচীন গ্রীক, পারসিক ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়ে আরবী সাহিত্য ভাণ্ডারকে অসামান্য অবদান দান করত না। ঠিক এই সময়েই সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, দর্শন, চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের

অসামান্য উন্নতি লক্ষণীয়। ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জ্যোতিষ বিদ্যার গ্রন্থগুলি আরবী ভাষাতে অনূদিত হয়ে আরব জ্যোতিষী-জগৎকে শক্তিশালী করে। ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ বিদ্যার গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তকে' আরব মনীষী মহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম সংস্কৃত হতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরব জ্যোতির্বিদ্যাকে জগদ্বিখ্যাত করেন। সে যুগের অন্যতম জ্যোতিষ ছিলেন অগ্নি-উপাসক আল-মুকাফফা। গুণগ্রাহী সম্রাট আল-মুকাফ্‌ফাকে রাজদরবারে পাওয়ার জন্য তাঁর প্রতি এরূপ সহানুভূতিপূর্ণ ও সম্মানজনক ব্যবহার করেন যে, জ্যোতিষী মুকাফফা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খলিফার রাজদরবারে যোগদান করে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। পরবর্তীকালে এই মুকাফফাই ছিলেন খলিফার রাজজ্যোতিষ। তিনি পাহলবী ভাষা হতে বিশ্ব-বিশ্রুত 'কালিলা ও দীমনা' (পশুপক্ষীর গল্প) আরবী ভাষাতে অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পাহলবী ভাষা হতে 'খুদাইনামা' নামক আর একটি রূপকথার গ্রন্থকেও সিয়ার আল্-মুলক-আল-আজম নাম দিয়ে আরবী ভাষায় অনূদিত করেন। এটি ব্যতীত গ্রীক ভাষা হতে তিনি বহু গ্রন্থ আরবী ভাষাতে অনুবাদ করে অমর কৃতি রেখে যান। বিশেষ করে দার্শনিক অ্যারিস্টটল, ইউক্লিড, টলেমী প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের কালজয়ী গ্রন্থগুলিকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরবী ভাষাকে কম অবদান দেননি। এইভাবে খলিফা মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব জ্ঞানভাণ্ডার বিপুল সম্পদলাভ করে ইসলামের সভ্যতার ও স্বর্ণযুগের শুভ সূচনা করে যায়।

স্থাপত্য ও কারুশিল্প ঃ খলিফা আল-মনসুরের রাজত্বকালে পারস্য স্থাপত্য-শিল্পের প্রভাব আরব স্থাপত্যশিল্পে আনলো এক দিগন্তকারী প্রভাব। তদানীন্তন জগতের সুরম্য বাগদাদ নগরী তার জ্বলন্ত প্রমাণ। পারস্য প্রভাবান্বিত বাগদাদ নগরীর—ফটক, ভল্ট, খিলান, অলংকার পদ্ধতি নিঃসন্দেহে সে যুগের জগৎ স্থাপত্যশিল্পকে ম্লান করে দেয়। এটি ছাড়াও কাসরুল-খুলদ (অনন্তধাম) ও রাজকুমার মাহদির জন্য রুসাকা নামেও বিখ্যাত দুটো রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন তুলে ধরেন। ক্রেসওয়েলের মতে, ৭৭২ খ্রীস্টাব্দে খলিফা রাক্কায় একটি মনোরম রাজপ্রসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন।

খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের জীবন বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার সাক্ষী, বহু অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সাক্ষী, বহু অনাসৃষ্টি ও সৃষ্টির সাক্ষী, সবের ঊর্ধ্বে স্বীকার করতে হল, তিনি আব্বাসীয় রাজত্বের শ্রেষ্ঠতম খলিফার গৌরব অর্জন করতে না পারলেও, নিঃসন্দেহে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল মাহদী আল-হাদী

(৭৭৫-৭৮৬ খ্রীঃ)

আল-মাহদী (৭৭৫—৭৮৫ খ্রীঃ)

উদারনীতিঃ খলিফা মনসুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-মাহদী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন মহানুভব, প্রজাবৎসল ও নম্র স্বভাবের মানুষ। তাই পিতার কঠোর ও নির্মম নীতি পরিত্যাগ কবে উদার ও শান্তিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করে অতীতের সকল কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের মুক্তি দান করে আপন মহানুভবতার চিরপরিচয় রেখে গেছেন। বিশেষ করে ইমাম হাসানের বংশধর ইব্রাহিমের পুত্র হাসানকে কারাগার হতে মুক্তি দান ও তাঁকে উপযুক্ত ভাতা প্রদান করা তাঁর উদারতারই চরম পরিচয়। রাজকোষেব সঞ্চিত অর্থ থেকে তিনি সকল প্রকার দ্বেষ-বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে বহু জনহিতকর ও মহৎ কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান। বহু জ্ঞানী-গুণী ও অভাবগ্রস্তকে সাহায্য দান করেন। তিনি বহু মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণ করে গুণগ্রাহী বাদশাহর পরিচয় দেন। সঙ্গে সঙ্গে মক্কা ও মদিনার মসজিদকে সংস্কার ও সুশোভন করে তোলেন। প্রতি বছর কাবা শরীফে খলিফার পক্ষ হতে একটি মূল্যবান গেলাফ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, পরবর্তীকালে যা সকল খলিফার অনুশীলনের বস্তুতে পরিণত হয়। ৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে হজ্বের সময় খলিফা হেজাজের দীন-দুঃখী মানুষের মধ্যে তিন কোটি দিরহাম মুক্ত হস্তে দান করে কালজয়ী দাতার গৌবব অর্জন করে গেছেন। এবং একমাত্র মক্কার গরিব মানুষের মধ্যে ১,৫০,০০০ জামা বিতরণ করেন। কাদেসীয়া হতে জাবালা পর্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে সরাইখানা নির্মাণ করে তিনি প্রজাবৎসল খলিফার পরিচয় দেন। এবং ঐ রাস্তার পথচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকেও সুদৃঢ় করেন। তিনি ঐ সমস্ত রাস্তাগুলির মাধ্যমে দূর-দূরাঞ্চলের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। তিনি মদিনা হতে ৫০০ জন আনসারকে বাগদাদে আনয়ন করে আপন দেহরক্ষীর বিভাগে নিযুক্ত করে আনসারদের যথাযোগ্য সম্মান দান করেন। বৃদ্ধ, অসহায় শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল' তিনি একদিকে যেমন দাতা ছিলেন, অন্যদিকে বড়ই সহিষ্ণুও ছিলেন। সৎ মানুষদের প্রতি যেমন তিনি সদয় ছিলেন, দুরাচারদের প্রতি তেমনি কঠোরও ছিলেন। খলিফা হারুণ রশিদের সময় বাগদাদে সাহিত্য-দর্শন-ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চরম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, তার শুভসূচনা পিতা আল-মাহদীর সময়। খলিফা হারুণ-আর-রশিদের সময়ের উন্নতির চরম উৎকর্ষের মূলটা পূর্বতন বীজ রূপে যদি পিতা আল-মাহদীর সময় না হোত, তাহলে খলিফা হারুণ-আর-রশিদ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়' এতখানি স্থান পেতেন কিনা তা কে জানে।

বিদ্রোহ দমন—মুকান্নার বিদ্রোহঃ খলিফা আল-মাহদীর খেলাফতে কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা যায়। খলিফা কঠোর হস্তে সেগুলিকে দমন করতে সক্ষম হন। কদাকার, খর্বাকৃতি ও অতি কুৎসিত চেহারার অধিকারী হাশিম বিন হাকিম সর্বদা একটি সোনালি মুখোশ পরে থাকত বলে তাঁর নাম দেওয়া হয়—'মুকান্না' বা আবৃত। তিনি নিজেকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করে সমাজে অবতারবাদ প্রচার করতেন। তিনি মানুষদের শিক্ষা দিতেন বিশ্বস্রষ্টা মানুষদের মধ্যে আদম-নূহ ও আবু মুসলিমের রূপ ধরে আবির্ভূত হন। তিনি তাঁর শিষ্যদের বহু গর্হিত কাজে উৎসাহিত করতে থাকায় মানুষ দলে দলে তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় যোগদান করে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করে। ফলে তিনি বহুবার খলিফার ছোট ছোট সেনাদলকেও পরাজিত করেন। অবশেষে খলিফা একটি সুগঠিত বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে তাঁর সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটন করেন। পরিশেষে হাশমি পরাজয়কে নিশ্চিত ভেবে কাঁশ নামক শহরে দলবল-সহ এক অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন। তাঁর অনুচরবৃন্দ সাদা পোশাক পরিধান করতো বলে তাদের মুবাইয়েস্তা বা মুবাইয়ী অর্থাৎ শ্বেতাম্বর বলা হত।

জিন্দিকের বিদ্রোহঃ কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বদিকে জুরজান ও গুর্গাও নামক স্থানে জিদিক নামক এক ধর্মাদ্রোহী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, তারা লাল কাপড় পরিধান করত বলে তাদের মুহাম্মির বা রক্তাম্বর বলা হত। প্রাচীন পারস্যে দু'জন নেতা ছিলেন মাজদাক ও মনী। প্রথমজন ছিলেন বল্গাহীন জীবনযাত্রার পক্ষপাতী ও দ্বিতীয়জন ছিলেন নাস্তিকবাদী দার্শনিক। তাদের নেতৃত্বে মানুষের নীচ কামনা-বাসনা ও হীন প্রবৃত্তি অত্যন্ত ত্বরান্বিত হয়ে উঠেছিল। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে সম্রাট খসরুর নওসিরওয়ানের রাজত্বকালে মাজদাকের আবির্ভাব হয়। পারস্য সম্রাট তাঁকে কঠোর হস্তে দমন করলেও তাঁর দলবল প্রাচীন নাস্তিকবাদী দার্শনিক মনীর চিন্তাধারার সাথে মিশে যায়। খলিফা আল-মাহদীর সময় জিন্দিক দল প্রাচীন মাজদাক ও মনীর মতাবলম্বী হয়ে উঠলে খলিফা একজন বিচক্ষণ রাজকর্মচারীর অধীনে সাহিবুজ-জানদিকা নামক একটি বলিষ্ঠ বিভাগ প্রবর্তন করে ঐ দলকে চিরতরে প্রদমিত করেন। পরবর্তীকালে আধুনিক যুগের কার্ল মার্কস, মাও, লেলিন-স্ট্যালিন প্রমুখ সমাজবিশারদ ও রাজনীতিবিদদেরও প্রাচীন পারস্যের ঐ নাস্তিকতাবাদী দার্শনিক মনীর নাস্তিকতাবাদী-সাম্যবাদে (Old Nihilistic Communisim) প্রভাবান্বিত হতেও দেখা যায়।

বাইজাণ্টাইন বিদ্রোহঃ খলিফা আল-মাহদীর রাজত্বকাল বাইজাণ্টাইনদের সাথে বহু সংঘর্ষের সফলতার সাক্ষী। বাইজাণ্টাইনগণ স্বাক্ষরিত চুক্তিভঙ্গ করে বারবার মুসলিম রাজ্য আক্রমণ ও লুঠতরাজ আরম্ভ করলে খলিফা স্বয়ং সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য এক লক্ষ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী-সহ ফুরাত-নদী অতিক্রম করে আলেপ্পো শহরে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন।

৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে সেখান হতে খলিফা আপন পুত্র হারুনকে বসফোরাসের দিকে প্রেরণ করে অভিজ্ঞ খালিদ বার্মেকিকে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এর সঙ্গে ছিলেন বহু বিশ্বস্ত আব্বাসীয় সেনাপতি। বসফোরাসের তীরে বাইজান্টাইন বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। সেই সময় রানী আইরিন তাঁর পুত্র ষষ্ঠ কনস্টান্টাইনের অভিভাবক রূপে সাম্রাজ্য পরিচালনা করছিলেন। বিজয়ী আরব শিবিরের দিনের উদ্যম ও রাতের আলোকমালা রানী মাতার মনে ভীতির সঞ্চার করে সন্ধির মনোবাসনা জাগিয়ে তোলে। ইতিমধ্যে আরব-বাহিনী কনস্টান্টি-নোপলের প্রাচীন প্রান্ত হতে দুয়ারে হাজির। ৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী আইরিন বার্ষিক বিপুল কর প্রদানে স্বীকৃত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেন। এই যুদ্ধে খলিফা তাঁর পুত্র হারুণের সাফল্যের ও কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে 'আর রশিদ' (ন্যায়নিষ্ঠ) উপাধি দান করেন।

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন: খলিফা আল-মাহদীর রাজরানী খায়জুরান তাঁর স্বামীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এমনকি খলিফার রাজদরবারও রাজ-মহিষীর প্রভাবে অনেকখানি প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিল। এই মহিয়সী মহিলাই শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের স্ত্রী মাজুনাকে রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তার পদমর্যাদার উপযোগী বাসস্থান নির্ধারিত করে শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক চাকর-বাকরেই পরিবেষ্টিতা করে রাখেননি। বরং রাজ-মহিষী তাঁর প্রতি এমন ব্যবহার করতেন, যার ফলে সমগ্র রাজপরিবারটিই ছিলেন তাঁর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল। এটা ছিল রাজমাতা খায়জুরানের বংশগত রাজ-পরিচয়। তিনি রাজকার্য পরিচালনায় খলিফাকে যথেষ্ট সাহায্য করে প্রকৃত বিদুষী মহিলার পরিচয় রেখে গেছেন। খলিফা আল-মাহদীর পর খেলাফতের পরবর্তী দাবিদার ছিলেন খলিফার আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা। কিন্তু রাজরানী আপন পুত্রদ্বয় মুসা ও হারুণের অনুকূলে ঈশার খেলাফতের দাবিকে প্রত্যাহার করার জন্য বিশেষ চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর কূটনীতি কার্যকরী হয়েছিল। অতঃপর খলিফা বিনাদ্বিধায় পুত্র মুসা ও হারুণকে খেলাফতের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন।

পুত্র হারুণ পিতা-মাতা উভয়েরই খুবই প্রিয় ছিলেন। তাই মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে খলিফা আল-মাহদী হারুণকেই উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার নিমিত্ত গুর্গাওয়ে যুদ্ধরত পুত্র মুসাকে (হাদী) রাজদরবারে আনয়ন করে হারুণের পক্ষে তাঁর খেলাফতের দাবিকে প্রত্যাহার করতে বলায় মুসা পিতার ঐ নির্দেশের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ না করেই নীরব থেকে যান। পুত্র মুসার এই ব্যবহারে পিতা আল-মাহদী বিরক্তবোধ করে দ্বিতীয় পুত্র হারুণকে সহ যুদ্ধক্ষেত্র গুর্গাওয়ে যাত্রা করে পথিমধ্যে ৪ আগস্ট, ৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪৩ বছর। ফলে অমীমাংসিত অবস্থায় মুসার

খেলাফতের দাবি অপরিবর্তিতই থেকে গেল। খলিফা আল-মাহদীর দশ বছরের শাসনকাল আব্বাসীয় যুগের শুধু সুসংহত ও সমৃদ্ধিই বৃদ্ধি করেনি, বরং সূচনা করেছে স্বর্ণযুগেরও।

আল-হাদী (৭৮৫-৭৮৬ খ্রীঃ)

সিংহাসন লাভঃ পিতা-মাতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ মনোনয়নক্রমে মুসা ২৪ বছর বয়সে আল-হাদী (পদ-প্রদর্শক) উপাধি ধারণ করে ৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভ্রাতা হারুণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে পিতার সিলমোহর ও রাজদণ্ড মুসার নিকট গুর্গাওয়ে পাঠিয়ে দেন।

বিদ্রোহ দমনঃ আল-হাদীর স্বল্পকালীন খেলাফতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিল। মেসোপটেমিয়ার খারেজীগণ এবং মক্কা ও মদিনার আলি-পন্থীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মদিনার বিদ্রোহ দমনকালে ইমাম হাসানের প্রপৌত্র ইব্রাহিম ও মুহম্মদের এক ভ্রাতা জনৈক ইদ্রিস যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রাণভয়ে তানজিয়ারে পলায়ন করেন। সেখানে দূরে পশ্চিমে আফ্রিকায় (মাগরিব-উল-আকসা) ইদ্রিস বংশীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই আলাবীদের প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র নামে পরিচিত। ধর্মদ্রোহী মনীরপন্থী বিদ্রোহী হলে তাদেরও খলিফা কঠোর হস্তে দমন করেন।

হাদী ও মাতা খায়জুরানঃ মাতা খায়জুরান পূর্বমতো রাজকার্যে ও রাজদরবারে প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে পুত্র আল-হাদী সেটাকে অন্য নজরে দেখতেন। হাদী মাতার এই অনধিকার চর্চা পছন্দ করতেন না। এমনকি রাজ-দরবারের আমীর-ওমরাহদের ওপর মাতার প্রভাবকে যথেষ্ট খর্ব করে দেন। এইভাবে রাজমাতা রাজদরবারের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিতা হয়ে ক্ষোভে, দুঃখে ও অনুশোচনায় জীবনের বাকি কয়েকটি দিন কাটাতে থাকেন। পুত্র হাদী শুধু মাতার প্রতি এই আচরণ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি ভ্রাতা হারুণকে ভাবী খেলাফতের দাবিদার থেকে বঞ্চিত করে পুত্র জাফরকে খলিফা মনোনয়ন করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে হারুণের উস্তাদ ও উপদেষ্টা ইয়াহিয়া ইবনে খালিদ বার্মেকিকে ও অন্যান্য বহু রাজকর্মচারীকে বন্দী করে এক নিদারুণ পরিবেশের সৃষ্টি করেন। এই সময় রাজমাতার সঙ্গে পুত্র হাদীর যথেষ্ট মনোমালিন্য দেখা যায়। এই তিক্ত পরিবেশে হারুণ নিজেকে টেকাতে না পেরে দরবার ছেড়ে চলে যান। কিছুদিনের মধ্যেই হাদী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অন্তিম শয়নে কৃত অপরাধের জন্য মাতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। এবং পিতা-মাতার ইচ্ছানুসারেই ভ্রাতা হারুণকে ভাবী খলিফা মনোনীত করেন। এইভাবে ৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে হাদী পরলোকগমন করলে হারুণ স্বাভাবিক ভাবেই খলিফার পদ বরণ করেন।

বাগদাদের স্বর্ণযুগ : হারুণ-আর-রশিদ
(৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ)

স্বর্ণযুগ : ভ্রাতা (মূসা) হাদীর মৃত্যুর পর ২৫ বছর বয়সে হারুণ-আর-রশিদ ৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইসলামের ইতিহাস যেন নতুন দিকে মোড় নিল। সকল ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন হারুণের পূর্বে ইসলামের ইতিহাস কোনদিনই এরূপ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করতে পারেনি। উমাইয়া খেলাফতকালে খলিফা প্রথম ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রীঃ) রাজত্বকাল যেমন ইসলামের ইতিহাসকে রাজ্য বিস্তারের দিক থেকে চূড়ান্ত মর্যাদা দিয়ে গেছে, তেমনি ইসলামের ইতিহাসে হারুণের রাজত্বকালে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছে। তাই এই যুগটিকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়। বার্নার্ড লুইস বলেন—"মনসুর কর্তৃক স্থাপিত সাম্রাজ্যে নানারূপ বিদ্রোহ সংঘাত হওয়া সত্ত্বেও হারুণের রাজত্ব পর্যন্ত সংঘবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়, এবং পরবর্তী শাসনে (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) আব্বাসীয় ক্ষমতা চরম শিখরে উপনীত হয়।"

প্রাথমিক কার্যাবলী : একদিন খলিফা হারুণ-আর-রশিদের পিতা খলিফা আল-মাহদি পারস্য তনয় ইয়াহইয়া ইবনে খালিদ বার্মেকিকে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। পরে তাঁর কার্যাবলীতে খলিফা এতই মুগ্ধ হন, তিনি তাঁকে পুত্র হারুণের গৃহশিক্ষকেরও মর্যাদা দান করেন। ইয়াহইয়ার পদোন্নতির মূলে আমরা প্রধানত দুটো জিনিস লক্ষ্য করি—এক তাঁর আপন জ্ঞানগরিমা, অন্যটি ছিল খলিফার পারস্যপ্রীতি। খলিফার এই পারস্যপ্রীতির মূলে ছিল তাঁর বেগম খায়জুরান। খায়জুরান মূলত ছিলেন পারস্য মহিলা। এইভাবে রাজদরবার হতে বেগম মহল পর্যন্ত পারস্যপ্রীতি স্থানলাভ করে।

খলিফা আল-হাদী সিংহাসন লাভ করে পিতার পূর্ব মনোনয়নকে বাতিল করে ভ্রাতা হারুণের স্থলে আপন পুত্র জাফরকে মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা করলে মাতা খায়জুরান ও উপদেষ্টা ইয়াহইয়া ঘোর বিরোধিতা করেন। ফলে খলিফা ইয়াহইয়াকে বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে খলিফা হারুণ-আর-রশিদ সিংহাসন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই আপন শিক্ষককে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে ভুল করেননি। তিনি শুধু তাঁকে কারামুক্তই করালেন না, বরং তাঁর জ্ঞান গরিমাকে পিতার ন্যায় যথাযথভাবে কাজে লাগালেন। ইয়াহইয়া খলিফার দরবারে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা লাভ। করলেন খলিফা একদিকে মা, অন্যদিকে বাল্য শিক্ষককে প্রভূত সম্মান দেখাতে থাকেন। ফলে রাজমাতা খায়জুরানের পৃষ্ঠপোষকতায় খলিফার প্রধানমন্ত্রী ইয়াহইয়া ও তাঁর বংশধরেরা রাজদরবারে বার্মেকি প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হন। খলিফা হারুণ-আর-রশিদ যেদিন সিংহাসন লাভ করেন, ঐদিনই

ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সৃষ্টিকারী খলিফার জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ (আল মামুন)-এর জন্ম হয়। পরবর্তীকালে ইয়াহইয়ার চার পুত্র ও খলিফার দরবারকে অলংকৃত করেন। শুধু এটিই নয়, খলিফা আল-মনসুরের সময় হতেই ইয়াহইয়ার রাজদরবার হতে বেগম মহলের খায়জুরান পর্যন্ত ছিল অবাধ যাতায়াত। সেই সুবাদে ইয়াহইয়ার সুযোগ্য পুত্রগণেরও অবাধ মেলামেশা থেকে যায়। এমনকি উভয় পরিবারের পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে কোন পার্থক্যই ছিল না। ইসলামের পর্দা প্রথার অবমাননায় পরবর্তীকালে এর ফলও অবিমিশ্র হয়নি—আব্বাস ও জাফরের জীবনে (যদি তা সত্য হয়)।

বিদ্রোহ দমন (৭৮৭-৮৮ খ্রীঃ)

মসুলে বিদ্রোহঃ ৭৮৭-৮৮ খ্রীঃ মসুলে খারেজী বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করলে খলিফা সিংহাসনে আরোহণ করে খারেজীদের সর্বাত্মক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। মেসোপটেমিয়ার আব্বাসীয় শাসনকর্তা আবু হুরাইরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম না হলে খলিফা আবার এক বাহিনী দ্বারা একে প্রশমিত করেন।

ওয়ালিদ ও লায়লার বিদ্রোহঃ নিসিবিনে ওয়ালিদ ইবনে তারিখের নেতৃত্বে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও মেসোপটেমিয়ার হলওয়ান পর্যন্ত চরম অরাজকতা চলতে থাকলে খলিফা হারুণ-আর-রশিদ এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে রাষ্ট্রদ্রোহী ওয়ালিদকে পরাজিত ও নিহত করেন। ওয়ালিদের মৃত্যুতেও বিদ্রোহের এই আগুন চিরতরে নির্বাসিত হল না, কেননা ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তাঁর ভগ্নী বীরশ্রেষ্ঠা লায়লা নতুন ভাবে খারেজী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। শুধু তাই নয়, লায়লা একদিকে যেমন ছিলেন বীরাঙ্গনা, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন বিদুষী মহিলা। উভয়া গুণসম্পন্না নারী শোকাভিভূত লায়লা ভ্রাতার রোমাঞ্চকর অভিযানের শোকগাথা রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন এবং জনগণকে যথেষ্টভাবে উৎসাহিত করেন। এমনকি তাঁর পরিচালনায় খারেজী-গণ ইরাকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন। কয়েকটি সংঘর্ষে উপর্যুপরি খলিফার বাহিনী পর্যুদস্ত হলে অবশেষে খলিফা এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে বীরশ্রেষ্ঠা লায়লাকে পরাজিত করেন। চরম শৌর্যবীর্যের জন্য লায়লাকে "আরবীয় জওয়ান আব আর্ক" ("Arabian Joan of Ark") বলা হয়। যদিও ফ্রান্সের জওয়ানের মতো লায়লার শেষ পরিণতি এক ছিল না। খলিফা হারুণের সেনাপতির নিকট পরাজিত হলে লায়লাকে নারীসুলভ জীবনযাত্রা যাপন করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলে লায়লা পরে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আপন ঘর-সংসারে মনোনিবেশ করেন। ৭৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দে অপর একটি খারেজী বিদ্রোহ পারস্যে অরাজকতার সৃষ্টি করলে শাসনকর্তা আলি ইবন ঈসা কঠোর হস্তে তা দমন করেন।

গ্রীক বিদ্রোহ: খাজারগণ ৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে গ্রীক দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আর্মেনিয়া আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ নির্যাতন ও ধ্বংস দ্বারা অরাজকতার সৃষ্টি করলে খলিফা দুজন সুদক্ষ সেনাপতি প্রেরণ করে বর্বর উপজাতিদের দমন করতে সক্ষম হন। পরে আর্মেনিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলিপন্থীদের বিদ্রোহ: একথা সর্বজনবিদিত যে, আব্বাসীয় খেলাফতে আলিপন্থীদের বিদ্রোহ বা বিরোধিতা খুবই ন্যায়সঙ্গত ছিল। কেননা আলিপন্থীদের শুভেচ্ছা, সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা হত কি না যথেষ্ট সন্দেহের কথা ছিল। পরবর্তীকালে আল-আব্বাস ও মনসুর কর্তৃক আলিপন্থীগণ চরমভাবে প্রবঞ্চিত, নির্যাতিত হন। এমনকি খলিফা আল-মনসুর আলি বংশীয় মহম্মদ ও ইব্রাহিমকে হত্যা করলে আলিপন্থীদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এবং তাঁদের অপর ভ্রাতা ইয়াহইয়া দাইলাম অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। পরবর্তী খলিফা হারুণের রাজত্বকালে ইয়াহইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করলে জুরজান ও পারস্যের বার্মেকি শাসনকর্তা ফজলকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। বার্মেকি পরিবার পারস্যসম্ভূত থাকায় আলিপন্থীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই ইয়াহইয়াকে খলিফার নিকট বশ্যতা স্বীকার করতে প্ররোচিত করা হয়। পরে এক চুক্তির মাধ্যমে খলিফা এবং ইয়াহইয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইয়াহইয়া চুক্তির অবমাননা করে বা সন্দিগ্ধমনা খলিফা আপন সন্দেহবশে বিদ্রোহের উৎসকে নির্মূল করার জন্য ইয়াহইয়াকে কারারুদ্ধ করেন। সন্দেহমনা খলিফা শিয়াদের বিদ্রোহে শঙ্কিত হৃদয়ে অনেক নিরপরাধ পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও বন্দী করে আপন চরিত্রকে কলঙ্কিত করেন। সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ও পণ্ডিত ব্যক্তি মুসা আল-কাজিমকে বন্দী করে বাগদাদে সিন্ধি-ইবন-শাইকের ভগ্নীর প্রহরাধীনে রাখেন। এই সাধকশ্রেষ্ঠ কয়েক বছর কারাবরণের পর ৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। কথিত আছে, মুসা আল-কাজিম শিয়া সম্প্রদায়ের দ্বাদশ ইমামের সপ্তম ইমামও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্যতম পুত্র আলি-আর-রাজি শিয়াদের ইমাম নিযুক্ত হন, তিনিও পিতার ন্যায় যুগশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও সাধক ছিলেন।

মুদারীয় ও হিমারীয় বিদ্রোহ: ৭৯২ খ্রীস্টাব্দে মুদারীয় ও হিমারীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীতের আগুন আবার প্রজ্বলিত হয়ে উঠলে, খলিফা সেনাপতি মুসাকে সিরিয়ায় ও দাউদ মুহাল্লবীকে সিন্ধি অঞ্চলে প্রেরণ করলে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হয়ে শান্তি দেখা দেয়। মসুলেও ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে আতাফের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দিলে খলিফা স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে মসুল শহরের প্রাচীরগুলিও ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।

আফ্রিকায় আগলাবি শাসন: ৭৮৫-৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে খলিফা আল-হাদির সময় উত্তর আফ্রিকার তানজিয়ারে মুসলিম সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে

ইদ্রিসী বংশ স্থাপিত হওয়ায় সেখানে সর্বপ্রথম একটি স্বাধীন রাজবংশের সৃষ্টি হল। আফ্রিকার আব্বাসীয় গভর্নরগণের বারবার শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইদ্রিসী বংশ সসম্মানে কায়েম ছিল। আব্বাসীয় সাম্রাজ্য হতে তানজিয়ার বিচ্ছিন্ন হলে এর প্রতিশোধার্থে খলিফা আল-মনসুর ৭৭২-৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়েজিদ-বিন-হারসামাকে সেখানকার শাসনকর্তার পদে বহাল রাখেন। খলিফা হারুণ-আর-রশিদ ও প্রখ্যাত সেনাপতি হারসামাকে উত্তর আফ্রিকায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় তিন বছর অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করে সেখানে শান্তি ও সংহতি ফিরিয়ে আনেন। ঠিক এই সময় দক্ষিণ আলজেরিয়ার জাব অঞ্চলের শাসনকর্তা ইব্রাহিম ইবনে আগলাব ঐ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে খলিফার প্রশংসাভাজন হন। এই প্রদেশের ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থার কথা ইব্রাহিম খলিফার কর্ণগোচর করলে খলিফা তাঁর দক্ষ সেনাপতি হারসামার সঙ্গে পরামর্শ করে বছরে ৪০,০০০ দিনার কর প্রদানের অঙ্গীকারে ঐ প্রদেশের শাসনভার ও সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ইব্রাহিম ইবন আগলাবের ওপর ন্যস্ত করেন। এইভাবে ৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহিম উত্তর আফ্রিকায় বংশানুক্রমিক আগলাবি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ৯০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই আগলাবি বংশ কায়রোয়ানের নিকটবর্তী আব্বাসীয়ায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করেন। তখনকার দিনে মুসলিম সাম্রাজ্যে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল—শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় যে খোতবা (বক্তৃতা) পাঠ করা হত, সেখানে খলিফার নামে প্রশংসা ও তাঁর শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করা হত। তাই আগলাবি রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানকার খোত-বাতে আর খলিফার নাম উচ্চারণ না করে আগলাবি রাজার নাম উচ্চারিত হত। কিন্তু একটি শর্ত ছিল, আগলাবি রাজাদের রাজা উপাধি দেওয়া হয়নি। তাঁদের আমীর পদবিতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এইভাবে উত্তর আফ্রিকা স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় পরিণত হয়।

মন্ত্রী ও মনোনয়ন ঃ ৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে খলিফা হারুণের মাতা খায়জুরানের মৃত্যু হলে বার্মেকি বংশের প্রতিনিধি ইয়াহইয়া অত্যন্ত আঘাত পান। বয়সের ভার ও মানসিক ভারসাম্যকে আর রক্ষা করতে পারল না। রাজমাতা খায়জুরানের প্রভাবে ইয়াহইয়া একদিন গৃহশিক্ষক হতে প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রীর আসনও অলংকৃত করেন। আজ সেই মানুষটির তিরোধানে তিনি যেন অত্যন্ত নিরুৎসাহ বোধ করতে থাকলেন। তাই খলিফা হারুণ-আর-রশিদ তাঁর স্থলে তাঁরই দুই সুযোগ্য পুত্রদ্বয় ফজল ও জাফরকে পর্যায়ক্রমে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

৭৯১ খ্রীস্টাব্দে বেগম জুবাইদা ও তাঁর ভ্রাতা ঈসার প্রভাবে খলিফা হারুণ তাঁর পাঁচ বছরের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদকে 'আল-আমীন' উপাধি দানে সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। এর সাত বছর পর খলিফা হারুণ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহকে 'আল-মামুন' উপাধি দান করে ৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় উত্তরা-

ধিকার মনোনয়ন করেন। তৃতীয় উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন তাঁর তৃতীয় পুত্র কাশিমকে 'মুতামিন' উপাধি দান করে। এবং শর্তও রেখে যান—কাশিম অযোগ্য প্রমাণিত হলে মামুন তাঁকে অপসারিত করতে পারবেন। খলিফা হারুণের জীবদ্দশায় মামুন পূর্বাঞ্চলে, আমিন পশ্চিমাঞ্চলে এবং মুতামিন মেসোপটেমিয়া ও সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

হজ্জব্রত পালন ঃ খলিফা হারুণ তাঁর দুই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য পরিশেষে হজব্রত পালনের সিদ্ধান্ত নেন। ৮০২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী জুবাইদা ও দুই পুত্র আমিন ও মামুনকে সঙ্গে করে খলিফা হজব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। আমিনের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা স্মরণ করে খলিফা উভয় ভ্রাতার মাঝে একটি শর্তসাপেক্ষ দলিল সম্পাদন করেন এবং ঐ অঙ্গীকার পত্রটির যাতে ভবিষ্যতে কোনরকম রদবদল করা না যায়, সেইজন্য খলিফা দলিলটিকে মক্কার পবিত্র কাবাগৃহে সংরক্ষিত করেন। এই হজের এইটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অন্য একটি দিকও বিধৃত হয়, মক্কাবাসীগণ পানীয় জলের অভাবে খুব কষ্ট পেতেন, সম্রাজ্ঞী জুবাইদা তাঁদের কষ্ট লাঘব করার জন্য এক লক্ষ দিনার ব্যয়ে একটি খাল খনন করেন। অদ্যাবধি সেই খাল 'নহর জুবাইদা' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে কাবাগৃহে সংরক্ষিত খলিফার ঐ দলিল আমিন ও মামুনকে বন্ধুত্বে পরিবেষ্টন করতে পারেনি। কেননা, আমিন চরিত্র ছিল বড়ই দুর্বল ও মামুন চরিত্র ছিল অতি উজ্জ্বল।

মুসলিম-বাইজাণ্টাইন যুদ্ধ, আইরিনের সন্ধিপত্র, হারুণের 'রশিদ' উপাধি লাভ ঃ খলিফা হারুণ-আর-রশিদের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনা ছিল বাইজাণ্টাইনদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ। হারুণের পিতা মাহদির সময় শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ পুনরায় শুরু হয়। দামেস্ক হতে রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হওয়া মাত্র বাইজাণ্টাইন সম্রাট সুযোগ বুঝে প্রথম কনস্টাণ্টাইন, পরে আর্মেনিয়া ও এশিয়া মাইনরের মুসলিম রাজ্যের বিভিন্ন সীমানায় অতর্কিত আক্রমণ চালান। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য মাহদি তদীয় পুত্র যুবরাজ হারুণ ও খালিদ বার্মেকির সেনাপতিত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী চরম সাফল্যের সাথে বসফোরাস অধিকার করে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধের প্রস্তুতি নিতে থাকলে চতুর্থ লিওর বিধবা সম্রাজ্ঞী আইরিন ভীত ও শঙ্কিত হয়ে খলিফার নিকট সন্ধি প্রার্থনা করায় খলিফা বছরে তাঁকে ৭০ হাজার হতে ৯০ হাজার দিনার কর দানের স্বীকৃতি ও সন্ধিপত্রে সম্রাজ্ঞী আইরিনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। বাইজাণ্টাইনদের সাথে এই ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে হারুণ চরম বীরত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিলে খলিফা মাহদি পুত্র হারুণকে 'রশিদ' (ন্যায়নিষ্ঠা) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাদির পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। খলিফা হারুণকেও এই বাইজাণ্টাইনদের সাথে কম

যুদ্ধ করতে হয়নি। তাই আমীর আলি বলেন—"হারুণ-আর-রশিদের সাথে বাইজান্টাইনদের যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁর রাজত্বকালের এক চমকপ্রদ ঘটনা।"

বাইজান্টাইনদের বিপর্যয়ঃ খলিফা হারুণকে সিংহাসনে আরোহণ করে প্রায়ই বাইজান্টাইন ও অন্যান্যদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিরুদ্ধাচারণের সম্মুখীন হতে হয়। খলিফা বাইজান্টাইনদের প্রতিনিয়ত আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য একটা স্থায়ী চিন্তা করে একজন সুযোগ্য তুর্কী সেনাপতির নেতৃত্বে তারসাসে একটি শক্তিশালী পৃথক সরকার গঠন করেন। এবং প্রতিদিনের প্রতিনিয়ত সংঘর্ষকে খলিফা প্রতিহত করতে সক্ষম হন। মাঝে মাঝে সেনাবাহিনীকে উৎসাহ দান করার জন্য নিজেও যুদ্ধে যোগদান করতেন। ৭৯১-৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে নৌ-বাহিনীর সহায়তায় ক্রীট ও সাইপ্রাস অধিকৃত হলে বাইজান্টাইন সেনাপতি বন্দী হন। অতঃপর ৭৯৭-৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে খলিফা স্বয়ং একটি বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে ইফিসাম ও আনসিরা দখল করেন। পরে স্কুটারির কাছে খলিফা হারুণ তাঁবু ফেললে বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী আইরিন (৭৯৭-৮০২) কর দানে সম্মত হয়ে খলিফার সঙ্গে চার বছরের জন্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত করেন। যুদ্ধবন্দী বিনিময় হওয়ায় ৪০০০ মুসলিম সৈন্যকে সসম্মানে ফেরত দেওয়া হয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে এটিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আব্বাসীয় প্রচেষ্টা।

আইরিনের সিংহাসনচ্যুতিঃ ৮০২ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বাসঘাতক কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাস (Nicphorus) সম্রাজ্ঞী আইরিনকে (Irene) অত্যন্ত শঠতার সাথে সিংহাসনচ্যুত করে বাইজান্টাইনের সম্রাটরূপে নিজেকে কনস্টান্টিনোপলে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিজ শক্তির মাদকতাকে পরিমাপ করতে না পারায় ক্ষমতালোভী স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন অবিবেচক দাম্ভিক নাইসিফোরাস চরম ঔদ্ধত্যবশত খলিফা হারুণকেও (বিধবা আইরিন ভেবে) ৮০৩ খ্রীস্টাব্দে একটি অবমাননাকর ও অপমানজনক পত্র লেখেন। পত্রটি ছিল এইরূপ—

নাইসিফোরাসের পত্রঃ "রোমক সম্রাট নাইসিফোরাসের নিকট হতে আরবের নৃপতি হারুণের নিকট—আমার পূর্ববর্তী সম্রাজ্ঞী আপনাকে অহেতুক প্রভূত মর্যাদা দান করে স্বীয় প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করেন এবং নারীসুলভ দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য আপনাকে স্বীয় ঐশ্বর্য দান করেন। সুতরাং আপনি অবিলম্বে পত্রপাঠ মাত্র কালবিলম্ব না করে পাওয়া অর্থের (সুদসহ) দ্বিগুণ অর্থ আমার দরবারে পাঠিয়ে দেবেন, অন্যথায় মনে রাখবেন তরবারই আপনার ও আমার মধ্যে মীমাংসা করবে।"

প্রত্যুত্তরঃ দাম্ভিক নাইসিফোরাসের চরম অশালীন ও ঔদ্ধত্যমূলক পত্রপাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে খলিফা হারুণ-আর-রশিদ এরূপ উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হলেন যে দরবারের সভাসদগণ ভয়ে পাথরের ন্যায় নীরব ও নিশ্চল হয়ে গেলেন। সকলেই যেন সম্রাটের সম্মুখে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন প্রত্যুত্তরে সম্রাট এরূপ চিঠি পাঠান—

"বিশ্বাসীগণের নেতা খলিফা হারুণ-আর-রশিদের নিকট হতে রোমানদের কুকুর নাইসিফোরাসের নিকট—হে নাস্তিক মাতার সন্তান, পত্রের উত্তর কানে শুনতে হবে না। অবিলম্বে স্বচক্ষেই অবলোকন করবে।"

প্রথম যুদ্ধাভিযান ঃ পত্র প্রেরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই খলিফা স্বয়ং এক বিশাল বাহিনীকে নিয়ে দাম্ভিক বাইজান্টাইন সম্রাটের দাম্ভিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার নিমিত্ত কনস্টান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে কোনরূপ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন না হয়ে তিনি হিরাক্লিয়া ও টেরানা অধিকার করেন। যথা সময়ে খলিফা রোমান সম্রাট নাইসিফোরাসকে অতি শোচনীয়ভাবেই যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করলে নিরুপায় নাইসিফোরাস আরব সম্রাটের নিকট প্রাণভিক্ষা করে শান্তি ও সন্ধির প্রার্থনা করলেন। সহৃদয় ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা কর প্রদানে বাধ্য করে রোমান সম্রাটের দর্পকে খর্ব করে তাঁর প্রাণভিক্ষা ও সন্ধি প্রার্থনা মঞ্জুর করে চরম উদারতার পরিচয় দেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযান ঃ যুদ্ধ শেষে খলিফা রাক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে বিশ্বাসঘাতক নাইসিফোরাস পুনরায় সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে আক্রমণ করলে খলিফা দ্বিতীয়বার যুদ্ধ পরিচালনা করে তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দেন। গীবন বলেন—"নাইসিফোরাসের অভিসন্ধিমূলক যুদ্ধনীতি ধূলিসাৎ হয়ে গেল এবং চল্লিশ হাজার নিহত গ্রীক সৈন্যের রণক্ষেত্র হতে বিশ্বাসঘাতক নাইসিফোরাস তিনটি ক্ষতচিহ্ন-সহ পলায়ন করেন।" এবার বাইজান্টাইন সম্রাট কর দানে সম্মত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করলে সহৃদয় খলিফা মঞ্জুর করেন।

তৃতীয় যুদ্ধাভিযান ঃ যখন খলিফা ট্রান্সক্সিয়ানায় বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই কপট ও ধূর্ত নাইসিফোরাস সময়ের সুযোগ নিয়ে দু'বারের চুক্তি-ভঙ্গ করে মুসলিম সীমান্ত আক্রমণ করেন। খলিফা হারুণ নাইসিফোরাসের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার সৈন্য-সহ তিনি রায় হতে তৃতীয় বারের মতো রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে উত্তরে বিথীনিয়া এবং পশ্চিমে মাইসিয়া ও কারিয়া পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া মাইনর জয় করে খলিফা হারুণ সম্মুখভাগে অগ্রসর হতে থাকেন। সেনাপতি ইয়েজিদ বিন মাখলাদ ইউফেসাস ও লিডিয়া সুহরাবিল সফোলায়ে, থিরাসা, সিডারোপোলস ও নাইসিয়া অধিকার করেন। খলিফার বাহিনী নাইসিফোরাসের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হিরাক্লিয়া দখল করে। নাইসিফোরাস তৃতীয়বার পরাজিত হয়ে খলিফার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করলে এবার খলিফা ক্ষমা করলেন সর্তসাপেক্ষে। খলিফা এবার বর্ধিত কর ছাড়াও স্বয়ং সম্রাট নাইসিফোরাস এবং তাঁর রাজ-পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে কর দানে বাধ্য করেন।

ফলাফল ঃ অধ্যাপক মুইর বলেন—"খলিফা হারুণ সর্বদা অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় নাইসিফোরাস তাঁর সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেন এবং প্রতিবারেই পরাজিত হন।"

আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না—নাইসিফোরাস বারবার ধৃষ্টতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা করলেও খলিফা বারবার তাঁকে ক্ষমা করলেন কেন। এখানে খলিফার দয়া-মায়ার সঙ্গে অদূরদর্শিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা সেই সময় বাইজান্টাইন যদি কপট-অদক্ষ শাসকের হাত হতে মুক্তি পেয়ে সুযোগ্য শাসক মুসলিম খলিফার করতলগত হত, তাহলে সেখানকার শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেত, প্রজাবৃন্দও সুখী হত। সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর ইতিহাসও অন্যভাবে লিখিত হত। তাই আমীর আলি বলেন—"বাইজান্টাইন শাসনের অবসান ঘটলে এবং মুসলমানগণ কনস্টান্টিনোপল দখল করলে এটি পৃথিবীর শান্তি ও সভ্যতার জন্য কল্যাণকর হত।" কেননা মুসলিম-বাইজান্টাইন সংঘর্ষ যত দীর্ঘায়িত হল, উভয় পক্ষের মানুষের মাঝে ধর্মীয়-দ্বন্দ্ব ততই প্রলম্বিত হল, অনিবার্য হল। রাজা-বাদশাহদের খাওয়া-খাওয়ি সাধারণ মানুষকেও জড়িয়ে ফেলল। এটি বিশ্ব-শান্তি ও সভ্যতার জন্য বড়ই ক্ষতিকর ছিল। সমাজের সকল স্তরেই এটা চির পরীক্ষিত সত্য। কোন সমাজের নেতৃবৃন্দের কলহ বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের কলহ যদি সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে জড়িয়ে ফেলে, তাহলে ঐ সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির মৃত্যুবাণ কেউই আর রক্ষা করতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে মুইর বলেন—"এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের তিক্ত পরিণতি ছিল ধর্মীয় ঘৃণাকে পুনরুজ্জীবিত করা।" এই কারণেই পরবর্তীযুগে উভয়পক্ষের এই ঘৃণাক্ত মনোভাবই সম্ভবত পরবর্তীকালে মুসলমানদের সঙ্গে খ্রীস্টানদের ক্রুসেডের যুদ্ধ সংঘটিত করতে সাহায্য করে।

বার্মেকি বংশের উত্থান ও পতন

উত্থান—জাফর বার্মেকি ঃ জনৈক জাফর নামক এক ব্যক্তি বলখের বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তাঁর উপাধি ছিল—বার্মাক। জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদ-সহ ৭০৫ খ্রীস্টাব্দে কোতাইবা বিন মুসলিম কর্তৃক খলিফা আব্দুল মালিকের খেলাফতকালে মধ্য এশিয়া বিজয়ের সময় যুদ্ধবন্দী রূপে বিধৃত হন। হিট্টি বলেন—"কোতাইবা বিন মুসলিমের বলখ অধিকারের সময় খালিদের মাতা বন্দিনী হন এবং তাঁর পিতা বার্মাক ছিলেন সেখানকার বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।" পরবর্তীকালে তাঁরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে বন্দীদশা হতে মুক্তি-লাভ করেন। আমীর আলি বলেন—"তেরো বছর বার্মেকি পরিবার অকৃত্রিম বিশ্বস্ততা ও অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে খলিফা হারুণের সেবা করে।" গিলমান বলেন—আবুল আব্বাসের খেলাফতে সুদূর খোরাসান হতে জাফর নামে বার্মেকি পরিবারের একজন প্রতিনিধি রাজদরবারে আগমন করে খলিফাকে বিষধারণের উপযুক্ত একটি আংটি প্রদান করে বিপদে এর উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন হতেই তিনি জাফর বার্মেকি নামে পরিচিত।

খালিদ বিন জাফর ঃ জাফর বার্মেকির পুত্র খালিদ বার্মেকি আব্বাসীয়

খেলাফতের সূচনাকালেই যে কর্মদক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন, তা পরবর্তীকালে বার্মেকি বংশকে এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দান করে। আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠাতে আবু মুসলিমের অবদান অনস্বীকার্য। সুযোগ্য খালিদ সেই আবু মুসলিমের বাহিনীতে যোগদান করে আব্বাসীয় প্রচারণাকে তুঙ্গে তোলেন এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অসামান্য কর্মকুশলতা ও আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার অবদানস্বরূপ আবুল আব্বাস তাঁকে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। খলিফা মনসুরের রাজত্বকালেও তিনি উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শুধু তাইই নয়, তিনি তাঁর আপন যোগ্যতাবলে উত্তরোত্তব পদোন্নতিও লাভ করে বার্মেকি বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তদানীন্তন বিশ্বের লীলাভূমি ও নব প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অতুলনীয় দুর্গপ্রাসাদ বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা পরিকল্পের তিনিই ছিলেন পরিচালক। অতঃপর মাহদিয়া নামক অপর একটি নগরীর নির্মাণকার্য তিনিই পরিচালনা করেন। এই সময় তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য তিনি মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তার পদও লাভ করেন। ৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে খলিফা আল-মনসুর তাঁকে শিয়াদের বিদ্রোহ দমনের জন্য তাবারিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি মসুলেও একটি উপজাতীয় বিদ্রোহ দমনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলে সেখানকার শাসনকর্তার পদ লাভ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানে বহাল ছিলেন। খালিদ একদিকে চরম ধার্মিক, অন্যদিকে অসাধারণ বাগ্মী, সত্যভাষী ও সাহসী ছিলেন। এইভাবে তাঁর চরিত্রমাধুর্য সকলকেই মুগ্ধ করে তুলেছিল। এমনকি তিনিই ছিলেন খলিফার প্রধান উপদেষ্টা। তাই ঐতিহাসিক গিলমান বলেন—"পরিবারটির অফুরন্ত ঐশ্বর্য ছিল এবং খালিদ তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় অধিক ধার্মিক, বাগ্মী, সত্যভাষী ও সাহসী ছিলেন। খালিদের প্রভাব এত মাত্রাধিক ছিল যে, একদিন আল-মনসুর বাগদাদ নির্মাণ কালে উচ্ছ্বাসভরে মাদায়ানের খসরুর প্রাসাদসমূহ হতে অপূর্ব স্তম্ভরাজি ও সামগ্রী সংগ্রহ করার প্রস্তাব করলে তিনি যুক্তিতক -সহ তাঁর পরিকল্পনার সরাসরি বিরোধিতা করতে সাহসী হন।" খালিদ বার্মেকির কাল পর্যন্ত কোন প্রধান-মন্ত্রীর পদ ছিল না, তাই তিনি খলিফা আল-মনসুর ও মাহদির আমলে প্রধান উপদেষ্টার পদ লাভ করেন। আল-মাহদির রাজত্বকালে তিনি যুবরাজ হারুণের সঙ্গে বাইজান্টাইনের সম্রাজ্ঞী আইরিনের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ পরিচালনা করে সেখানকার সুরক্ষিত দুর্গ দখল করেন। এই অভিযানের পরই হারুণ পিতা মাহদি কর্তৃক 'রশিদ' উপাধি লাভ করেন। খালিদ জীবনে মাহদিরও শিক্ষক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই সমস্ত নানাদিক পর্যালোচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খালিদ বার্মেকি ছিলেন প্রখ্যাত বার্মেকি উজির পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

ইয়াহইয়া বিন খালিদঃ খালিদ বার্মেকির মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ইয়াহইয়া বার্মেকি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। খলিফা মনসুরের সময়ও ইয়াহইয়া আপন কর্মদক্ষতার জন্য আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। বালক হারুণের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে পিতা খলিফা আল-মাহদি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ইয়াহইয়াকে হারুণের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ইয়াহইয়া হারুণকে এতই স্নেহ করতেন যে হারুণ তাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন। এবং শৈশবে ইয়াহইয়ার স্ত্রীর স্তনপানও করতেন। অকৃত্রিম সদ্ভাব ও ভালবাসা না থাকলে একটি রাজ-পরিবারের সাথে এই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। আল-মাহদির মৃত্যুর পর আল-হাদি সিংহাসনে আরোহণ করে পিতার মনোনয়নকে উপেক্ষা করে হারুণের স্থলে তাঁর আপন পুত্র জাফরকে মনোনীত করার চেষ্টা করলে রাজমাতা খায়জুরান ও উপদেষ্টা ইয়াহইয়া তাঁর ঘোর বিরোধিতা করেন। প্রকাশ্যভাবে বিরোধিতা করার জন্য আল-হাদি ইয়াহইয়াকে বন্দী করেন। পরে হারুণ-আর-রশিদ সিংহাসন লাভ করেই ইয়াহইয়াকে মুক্তি দেন। পারস্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত বার্মেকিগণ প্রথম আব্বাসীয় খেলাফতে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেন। এবং হারুণ ইয়াহইয়াকে সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। হারুণ রশিদ ইসলামের ইতিহাসে যে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেন, তার মূলে ছিল এই মার্জিত, বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল বার্মেকি পরিবারের অসামান্য অবদান। যে কোন খলিফা, যে কোন সম্রাট যতই বিচক্ষণ ও বাহাদুর হন না কেন, তাঁর রাজ-সভা, শাসনযন্ত্র, সামরিক বাহিনী সবকিছু একযোগে সমান তৎপরতার সাথে কাজ না করলে কোন সম্রাট বা খলিফাই উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করতে পারেন না। খলিফা হারুণ-আর-রশিদের রাজত্বকালে এই বংশটি ছিল সবকিছুর সার্থক যোগসূত্র। এবং এই যোগসূত্রেরই সার্থক ফসল হল—স্বর্ণযুগ। বহু কর্মীর বিচক্ষণতা, বহু ব্যক্তির বদান্যতা ও বহুজনের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে গড়ে ওঠে একটি যুগ। ইয়াহইয়া ছিলেন এই যুগের পুরধা ব্যক্তি। সদাই প্রজামঙ্গল, রাজ্যের উন্নতি, রাজাকে সুপরামর্শ দান, উন্নত কর্মপন্থা গ্রহণ ইত্যাদি কাজ হারুণের রাজত্বে বার্মেকিদের একদিকে অসামান্য প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলে ও অন্যদিকে তাঁদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত করে। ৭৮৬-৮০৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বছর একটানা অসামান্য যশের অধিকারী প্রধানমন্ত্রী ইয়াহইয়া রাজমাতা খায়জুরান মৃত্যুমুখে পতিত হলে তিনিও যেন ধীরে ধীরে আপন কর্ম-স্পৃহা হারাতে থাকেন, বয়সের ভারও তাঁকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। তিনি স্বেচ্ছায় খলিফার কাছে রাজকীয় সিলমোহরাদি প্রত্যর্পণ করে অবসর জীবন-যাপনের প্রস্তাব দেন। খলিফা সানন্দে তাঁর মূল্যবান প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁরই যোগ্য পুত্র ফজলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করেন। ইয়াহইয়া ৮০৫ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ফজল বিন ইয়াহইয়া ঃ ইয়াহইয়ার চার পুত্র ফজল, জাফর, মুসা ও মহম্মদ। এই চার ভ্রাতাই আপন আপন জ্ঞান-গরিমার জন্য সবিশেষ ধন্য ছিলেন। বিশেষ দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার জন্য তাঁরা প্রত্যেককেই হারুণের রাজত্বের প্রথম দিক হতেই বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে তাঁদের একটি গুণগত পার্থক্য ছিল এই যে—সকলেই আপন আপন ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য খুবই সচেষ্ট ছিলেন এবং এইটাই খুবই স্বাভাবিক কথা। কিন্তু ফজল-ভ্রাতাগণ ব্যক্তিস্বার্থের অনেক উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। এইটাই ছিল তাঁদের অস্বাভাবিক উন্নতির ও পদোন্নতির গোপন চাবি কাঠি। তাঁরা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে অতীব যোগ্যতার সাথে একান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে আব্বাসীয় খেলাফতের সেবা করে তার গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে খলিফার চির বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফজল হারুণের বাল্যসাথী ছিলেন, শৈশবে একত্রে খেলাধুলা করে উভয়েরই মধ্যে চরম হৃদ্যতা জন্মায়। খলিফা হারুণ তাঁকে আজীবন সসম্মানে 'ভাই' বলে ডাকতেন। এর পশ্চাতে আরো একটি বিশেষ কারণ ছিল—হারুণ শিশুকালে ফজলের মায়ের স্তনপানও করেন। এতে হারুণের পিতা খলিফা আল-মাহদির ও মাতা খায়জুরানের কোন আপত্তিও ছিল না। বরং তাঁরা এটাকে সানন্দে বরণ করেছিলেন। এখানেই বোঝা যায়, উভয় পরিবারের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল চরম পর্যায়ে। ফজল প্রথম খোরাসানের শাসনকর্তা হিসাবে ৭৯১ খ্রীস্টাব্দে ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর তিনি মিশরের শাসনকর্তা হিসাবেও প্রভূত খ্যাতির মালিক হন। তিনি তাঁর আপন যোগ্যতাবলেই পিতা বার্ধক্যবশত অবসর গ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেন। তিনি ইসলামজগতে অনেক নতুন জিনিসের প্রবর্তন করেন। হিট্টির মতে—২৭ রমজান-রজনীতে মসজিদে বাতি জ্বালাবার প্রথা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। আজও সারা পৃথিবীতে সমগ্র মুসলিম-জাহানে প্রতিটি মসজিদে ২৭ রমজান-রজনী মুসলমানগণ সমগ্র রমজান মাসে তারাবির নামাজ সহকারে পবিত্র কোরআন পাঠ খতম করে আপন আপন সাধ্যানুসারে মসজিদগুলিকে বর্ণাঢ্য রূপ দান করেন। তাই এই পবিত্র স্মৃতিটির সাথে ফজল বিন ইয়াহইয়ার নাম চিরদিন বিজড়িত থাকবে।

জাফর বিন ইয়াহইয়া ঃ ভ্রাতা ফজলের মতো জাফর ও হারুণ-আর-রশিদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বাল্য সহচর ছিলেন। এই জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিকে খলিফা তাঁর পুত্র মামুনের শিক্ষক নিযুক্ত করায় মামুনের জীবন গঠন এক অসাধারণ পথে এগিয়ে যায়। জাফর শুধু মামুনের শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি যুবরাজের অভিভাবকও ছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে মামুনের ওপর জাফরের প্রভাব অতিমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। জাফর অত্যন্ত যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কয়েকটি প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করলে খলিফা তাঁকে সিরিয়ার গভর্ণর

নিযুক্ত করেন। সেখানে জাফর হিমারীয় ও মুদারীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে নিজ প্রতিভার পরিচয় দেন। পিতা ইয়াহইয়া মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্র ফজল ও জাফরের ওপর রাজকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করে যান। পুত্রদ্বয় অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই সে কার্য পরিচালনা করে প্রভূত যশের অধিকারী হন। জাফরের নেতৃত্বে বার্মেকি বংশ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিপুল ক্ষমতালাভ করল। এই বংশের দু'টি বিশেষ দিক লক্ষ্য করা যায়—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যোগ। এই দু'টির যোগই বংশটিকে অসামান্য মর্যাদা দান করে। বার্মেকি বংশ ধনসম্পদ সংগ্রহে যেমন আগ্রহী ছিলেন, শিক্ষা-দীক্ষাতেও তেমন উৎসাহী ছিলেন। যেমন তাঁরা সীমাহীন ঐশ্বর্য সংগ্রহ করলেন, ঠিক তেমনি শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও জনকল্যাণকর কার্যকলাপের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যার ফলে বংশের সম্পদ কোনদিনই অভিশাপে পরিণত হয়নি, সঞ্চিত সম্পদ বংশধরকে বিপথগামী করেনি। এর মূলে ছিল জাফরের অবদান। জাফর নিজে ছিলেন অসাধারণ কাব্য প্রতিভার ও বাগ্মিতার অধিকারী। তখনকার দিনে তাঁকে সেদিনের লেখকগোষ্ঠীর জনক বলে আখ্যায়িত করা হত। জাফর ছিলেন অত্যন্ত রুচিবান সুপুরুষ। জ্ঞান-গরিমায়, ধনে-জনে, মানে-সম্মানে বিধাতা যেন তাঁকে বিপুল ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। এবং তিনি সেই ভাণ্ডারের সদ্ব্যবহারও করতে পেরেছিলেন। বাগদাদে বার্মেকি বংশ অতুলনীয় প্রাসাদ তৈরি করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে থাকেন। জাফর নিজে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে আল-জাফরা ভবন নামে এক অতুলনীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে স্থাপত্যশিল্পের চরম নিদর্শন রেখে যান। মামুনের সময় একদিন এই অনিন্দ্যসুন্দর বাসভবনকে কেন্দ্র করেই একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে। তাঁরা শুধুমাত্র আমোদ-প্রমোদেই দিনপাত করেননি, চর্চা করেছিলেন—জ্ঞানের, চেষ্টা করেছিলেন—ধনের। এবং দুই-ই করতলগত হয়েছিল। বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, খাল, সরাইখানা প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে তাঁরা মুক্তহস্তে দান করতেন। তাই পরবর্তীকালে 'বার্মেকি' শব্দটা বদান্যতার প্রবাদবাক্য রূপে ব্যবহৃত হত। জাফর ছিলেন অসাধারণ এক ক্ষণজন্মা পুরুষ, অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি। তিনি শুধু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেই অসামান্য অবদান রেখে যাননি; মানুষের নিত্যনতুন রীতিনীতি, বেশভূষা নানাদিকে নতুনত্বের প্রবর্তন করে কালজয়ী প্রতিভার পরিচয় রেখে যান। উচ্চকলাসম্পন্ন পরিধেয় বস্ত্র তিনিই প্রথম রাজদরবারে প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত নানাদিক দিয়ে জাফর ছিলেন একজন যুগান্তকারী ব্যক্তি।

মূসা ও মহম্মদ: বার্মেকি বংশের অপর দুই ভ্রাতা মুসা ও মহম্মদ হারুণ-আর-রশিদের খেলাফতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও সংহতিকে সুদূরপ্রসারী করেন। বার্মেকি বংশের একটানা দীর্ঘ ১৭ বছরের একনিষ্ঠ শাসনব্যবস্থা খলিফা হারুণ-আর-রশিদের রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগে পরিণত করে। বার্মেকি বংশ রাজত্বের সর্বত্র জ্ঞানী ও

গুণীর মর্যাদা দিতে যেমন ভুল করেননি, তেমনি যোগ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করে রাজ্য পরিচালনাকে চরম সুষ্ঠুতা দান করেন। তাই গিলমান বলেন—"বার্মেকিগণ শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, জ্ঞানী ও ব্যক্তিদের সদাই উৎসাহিত করতেন।"

বার্মেকিদের পতন ঃ বার্মেকি বংশের উত্থান যেমন ছিল আকস্মিক, তেমনি তার পতন ছিল আচম্বিত। প্রাকৃতিক নিয়মেও উত্থান যত উচ্চ হয়, পতনও তত গভীর হয়। বার্মেকি বংশও এই সত্য হতে নিষ্কৃতি লাভ করেনি। দীর্ঘ ১৭ বছর যাঁরা অবিচল অনুগত্য ও আত্মত্যাগ, একান্ত নিষ্ঠা, অসাধারণ কর্মনৈপুণ্যের দ্বারা খলিফা হারুণের রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগে পরিণত করলেন, সেই স্বর্ণযুগের স্রষ্টাদের পতন কেন রহস্যাবৃত, তা জানার জন্য ঐতিহাসিকগণ বার বার চেষ্টা করছেন। এই অতুলনীয় বংশের অভাবনীয় পতন ইতিহাসে সত্যিই যেন নজির-বিহীন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ বার্মেকি বংশের পতনের মূলে বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ

প্রথম—অনৈসলামিক প্রভাব ঃ ইসলামে নব দীক্ষিত বার্মেকি পরিবার মনের দিক থেকে ইসলামের প্রতি অনুদার বা অসম্মানজনক ভাব মাঝে মাঝে প্রকাশ করে বলে অনেকেই অভিযোগ করেন। এর মূলে ছিল এক নিগূঢ় সত্য। বার্মেকি বংশের প্রথম ব্যক্তি জাফর বার্মেকি বলখের বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বা বার্মাক ছিলেন। তিনি উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের রাজত্বকালের (৭০৫ খ্রীঃ) সেনাপতি কোতাইবা বিন মুসলিম কর্তৃক সপরিবারে বন্দী হলে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নয়, বরং প্রাণরক্ষার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। যিনি প্রাণের বিনিময়ে আপন পৈতৃক ধর্মকে বিসর্জন করতে পারেন, তিনি নব দীক্ষিত ধর্মকেও অন্য কিছুর পরিবর্তে ত্যাগ করতেও পারেন। তাই ধর্মের ব্যাপারে তাঁর মানসিকতা ছিল দোদুল্যমান। এই কারণেই (প্রথম) জাফরের পুত্র খালিদ বার্মেকির পারস্য জাতীয়তাবাদের প্রতি ছিল যথেষ্ট দুর্বলতা। এবং আপন পূর্বপুরুষের অনৈসলামিক ভাবধারা হতে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। বার্মেকি বংশ রাজদরবারে প্রভাব বিস্তার করার পূর্ব পর্যন্ত আব্বাসীয় দরবারে আরব প্রভাব পরিলক্ষিত হত। কিন্তু বার্মেকি বংশের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারে বিভিন্ন পারস্য আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, নানা রীতিনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। এবং আব্বাসীয়গণ পারসিকরণ হতে থাকেন। এমনকি আল-মনসুর সর্বপ্রথম পারস্য-পাগড়ি ব্যবহার করেন। হাজিব, উজির-নজির, পেশকার প্রভৃতি নানা পারসী শব্দে রাজদরবারে আমদানিকৃত হল। হারুণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মামুনের মাতা ছিলেন পারস্য তনয়া মারজিলা। কিন্তু এই সমস্তের জন্য কাউকেই কোন দোষারূপ করা যায় না, কেননা মানবসমাজের বিশ্ব-সংস্কৃতির উন্নতিকে এই পথেই প্রভাবিত হতে দেখা যায়।

সমাজ ও সংস্কৃতি যতই উদার ও উন্নতমনা হবে, ততই তার শ্রীবৃদ্ধি। যত সে সংকীর্ণ হবে ততই তার ক্ষয়। এইদিক থেকে বার্মেকি বংশ পারস্য প্রভাব আমদানি করে অন্যায় কিছুই করেননি। অন্যায় শুধু একটি স্থানেই লক্ষ্য করা যায়, যা পরবর্তীকালে খলিফার চোখে বিধৃত হল মহা অপরাধ বলে। আব্বাসীয় দরবারে পারস্য অনুপ্রবেশ দোষণীয় ছিল না, দোষণীয় ছিল ঐ অনুপ্রবেশের সাথে অনৈসলামিক ভাবধারা। এটি ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের মনে আঘাত হানে। এবং সকলের ধারণা এই অনৈসলামিক অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী ছিল পারস্যের ভূতপূর্ব বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বার্মেকি পরিবার। এই দায়ই ছিল তাঁদের পতনের প্রথমত কারণ।

দ্বিতীয়—শিয়া প্রবণতা: ঐতিহাসিক জুরজী জায়দান বলেন—"বার্মেকিগণ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং আলির ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী দাবিকে সমর্থন করতেন।" তখনকার দিনে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল পারস্য। আজও সারা বিশ্বে পারস্যই একমাত্র শিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। উমাইয়া ও আব্বাসীয়া প্রতিটি খলিফাকেই এই শিয়া সম্প্রদায় কম বিচলিত করেনি, তাই তাঁদের প্রত্যেককেই শিয়াদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করতে হয়েছিল। যে কারণেই হোক খলিফা মনসুরের খেলাফতে আলি বংশীয় মহম্মদ ও ইব্রাহিমের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পিতৃব্য আব্দুল্লাহর অমানুষিকভাবে প্রাণনাশ, ইমাম জাফর আস-সাদিককে নির্যাতন, ইমাম মুসা আল-কাজিমের কারাবরণ প্রভৃতি অমানুষিক ঘটনাবলী শিয়া সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জুরজী জায়দানের মতে, এদিকে পারস্য হতে উদ্ভূত বার্মেকি বংশ শুধু শিয়া মতাবলম্বীই ছিলেন না, বরং গোপনে কোথাও কোথাও শিয়া আলাবিদের সাথে আব্বাসীয় বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। জাফরের কৃতী সন্তান খালিদ তাঁদের প্রকাশ্যভাবেও সমর্থন করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। জাফরের প্রাসাদে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা নিয়মিত সমবেত হয়ে আব্বাসীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে রীতিমতো ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনা করতেন। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাজও দায়িত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। জাফর প্রধানমন্ত্রী হয়েও কি করে কোন জ্ঞানে তিনি খলিফার বিরুদ্ধচক্রকে আপন প্রাসাদে স্থান দিতেন, তা বোঝা শক্ত। এইটাই ছিল প্রধানমন্ত্রী জাফরের ক্ষমাহীন ত্রুটি ও অমার্জনীয় পাপ। যে পাপই বার্মেকি বংশের পতনের প্রধান ও মূল কারণ, এবং জাফরেরও প্রাণদণ্ডের মূল কারণ। এখানে খলিফা নির্দোষ।

তৃতীয়—সুন্নী মতবাদের বিরোধিতা: বার্মেকিদের অনৈসলামিক ও শিয়া প্রবণতার ফলে সুন্নী আব্বাসীয় খেলাফতের বিভিন্ন অধ্যায়ে সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ইত্যাদিতে অনৈসলামিক ভাব অনুপ্রবেশ করতে থাকে ধীরে ধীরে। খলিফা মনসুর সর্বপ্রথম 'আমিরুল মুমেনীন' উপাধি ধারণ করে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয়

জগতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু খলিফা মনসুর কোথাও ব্যক্তি-স্বার্থে সামান্য আঘাত লক্ষ্য করলে নিদারুণ শাস্তি দিতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। সেখানে তাঁর ধর্মীয়ভাব অতি গৌণ ছিল। তা না হলে জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিগণ (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক প্রমুখ) নির্যাতন ভোগ করতেন না। তবে নিছক অধর্মীয় বা ধর্মের বিরুদ্ধভাব কোনদিনই পছন্দ করতেন না। পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র খলিফা হারুণ ও পিতার প্রকৃতিকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে বসলেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা হারুণ যেন লক্ষ্য করলেন তাঁর খেলাফতে কোথায় যেন কোরআন-হাদিসের পরিপন্থী মতবাদ প্রচারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এবং সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কথা, ওটা সম্ভব হয়েছিল বার্মেকি বংশের তৎপরতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়। খলিফা হারুণ এই তথ্য জানতে পেরে রাগে ও ক্ষোভে অগ্নি-শর্মা হয়ে উঠলেন। এবং আরো জানতে পারলেন, ঐ বংশ সুন্নী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করছেন। অথচ খলিফা নিজেই ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। এদিক থেকেও বার্মেকি বংশ খলিফার বিরাগভাজন হলেন। খলিফা আরো বুঝতে পারলেন—বার্মেকি বংশ একেশ্বরবাদী ছিল না, ছিল ঈশ্বরবাদী (Thiest)। এইভাবে সুন্নী ইসলামের ধারক ও বাহক খলিফা হারুণ বার্মেকি বংশের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন।

চতুর্থ—অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য : প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে—বার্মেকিগণের পতনের অন্য একটি প্রধান কারণ ছিল। সেটা ছিল তাঁদের অপরিমিত ঐশ্বর্য ও অপারিসীম প্রভাব। এই ঐশ্বর্য ও প্রভাবকে তাঁরা যথাযথ প্রয়োগ না করে তাদের অপব্যবহারই করেছিলেন। কোথাও কোথাও বা কোন কোন সময় এই অপব্যবহারের পাত্র ছিলেন স্বয়ং খলিফা নিজেই। বার্মেকিগণ বিপুল ঐশ্বর্যবিভব, অসীম প্রতিপত্তি প্রকৃতির মোহে স্থান-পাত্র-কালের ব্যবধানও যেন ভুলে গিয়েছিলেন। ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল। তাই বার্মেকিগণ উভয় দিক থেকেও বিরল ইতিহাসের সৃষ্টিকারী ছিলেন। এত জ্ঞান গরিমার অধিকারী হয়েও তাঁরা সীমালঙ্ঘন করেছিলেন, কেননা শেষের দিকে তাঁদের সর্বজনবিদিত জ্ঞানের সাথে গর্ব মিশে গিয়েছিল। এই গর্বই তাঁদেরকে সীমালঙ্ঘন করিয়ে পতনের গহ্বরে নিয়ে গেল। তাঁরা সুপণ্ডিত হলেও কোরআনের ঐ অমোঘ বাণী দুটোকে দেখে বিস্মৃত হয়েছিলেন—সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" · ···"পৃথিবীতে গর্ব ভরে চলো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গর্বকারীকে পছন্দ করেন না।" প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন—"তাঁরা যে প্রকারে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং রাজস্ব ব্যয়ের সকল দিককে হস্তগত করে, তাতে স্বয়ং খলিফা হারুণ রশিদকেও তাঁদের নিকট অর্থ প্রার্থনা করতে হত, কখন কখন সামান্য পরিমাণ অর্থও খলিফার জন্য মঞ্জুর হত না।" রাজকোষের সমস্ত কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে তাঁরা

খলিফাকেও নাজেহাল করতে ছাড়েননি। এটা নিশ্চয় সীমালঙ্ঘন ছিল। বার্মেকিদের প্রভাব ও খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের সামরিক ও বেসামরিক সকল দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিই পূর্ণ হত বার্মেকি বংশের লোক দ্বারা বা তাঁদের একান্ত অনুগামীদের দ্বারা। ইবনে খালদুনের মতে—হারুণের খেলাফতে কম করে ২৫০ জন বার্মেকি বংশের পদস্থ কর্মচারী কাজ করেন। রাজ্যের সমস্ত মানুষ তাঁদেরই মুখাপেক্ষী ছিল। তাঁদের দেখা মাত্র সকলের মাথা অবনত হয়ে যেত। সকলেই নিশ্চিতভাবে জেনেছিল—সকলের দরখাস্ত ও প্রার্থনা একমাত্র তাঁদেরই দ্বাবা পূর্ণ হতে পারে। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে ও সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাঁরাই দান করতেন। সুতরাং সকলের মুখে মুখে তাঁদের স্তুতিবাক্য ধ্বনিত হত। সকলের মুখ তাঁদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, সকলের মাথা তাঁদের সম্মুখে হেঁট হল, সকল আবেদনকারী ও প্রার্থীর আশা-ভরসা কেবলমাত্র তাঁদেরই ওপর ন্যস্ত হল। খলিফা হারুণ এই অত্যধিক ও অবাঞ্ছিত প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। কারণ তিনি অনুভব করলেন ১৭ বছর প্রকৃত ক্ষমতা হতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। অবশেষে তিনি অভিভাবকত্ব হতে মুক্তি-লাভের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, একগুঁয়ে স্বভাবের খলিফা হারুণের জন্যই বার্মেকিগণ এতদূর উঠেছিলেন, আবার সেই একগুঁয়ে খলিফা মনোস্থির করলেন তাঁর খেলাফতে দুটো সূর্য থাকতে পারে না। সুতরাং বার্মেকিদের দমন আজ খলিফার মনের কোণে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ানোর ফলে তাঁদের পতন ত্বরান্বিত হল।

পঞ্চম—আরব আমীরদের অসন্তোষ ও ঈর্ষা ঃ বার্মেকিদের জাঁকজমক-পূর্ণ জীবনযাত্রা, বদান্যতা, পরোপকারিতা, অপূর্ব জনপ্রিয়তা সকল কিছু একযোগে আরব আমীর ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা শুধু সামান্যতম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। খলিফার মনের গতিধারাকে লক্ষ্য করে আব্বাসীয় খেলাফতে পারস্য বার্মেকি বংশের প্রতিদ্বন্দ্বী আরব অভিজাত সম্প্রদায় প্রচণ্ড প্রচারণা আরম্ভ করেন। আরব ও পারস্যের ভাবধারা এবং প্রভাবের দ্বন্দ্ব ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। রাজ গৃহাধ্যক্ষ (হাজিব) ফজল বিন রাবী আরব আমীরদের নেতৃত্ব দিলেন। এই দ্বন্দ্বের মূলে কয়েকটি কারণ ছিল—প্রথমত, পারস্য উদ্ভূত বার্মেকির্গণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করলে আরব গোষ্ঠী রাজদরবারে যথেষ্ট প্রভাব হারায়। রাজকোষ বার্মেকিদের হস্তগত হওয়ায় তাঁদের ঐশ্বর্য বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল, এটাও ছিল আরবদের ঈর্ষার প্রধানতম কারণ। উমাইয়াদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে আরব প্রভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, অন্যদিকে পারস্য প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। দ্বিতীয়ত, সমস্ত সামরিক ও আধা-সামরিক বিভাগের উচ্চ পদগুলিতে বার্মেকিগণ জাঁকিয়ে বসায় আরব অভিজাত রুষ্ট হয়। তৃতীয়ত, আরব অভিজাতের ধারণা ছিল পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর পদ পাবেন আরব-তনয়

ফজল বিন রাবী। কিন্তু কার্যত তা না হওয়ায় সকল আরব প্রধান অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন। ফজল বিন রাবী ব্যক্তিগতভাবে মর্মাহত হন। কিন্তু সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন। পঞ্চমত, স্বয়ং খলিফার মনের গতিবিধিকে লক্ষ্য করে বিচক্ষণ ফজল বিন রাবী কার্য আরম্ভ করেন বার্মেকিদের বিরুদ্ধে। সুন্নী আরব গোষ্ঠী সঙ্ঘবদ্ধ হল ফজল বিন রাবীর নেতৃত্বে বার্মেকির বিরুদ্ধে। ফজল অতি সূক্ষ্মভাবে খলিফার কানে ইন্ধন জোগালেন বার্মেকিদের শিয়া প্রবণতার বিরুদ্ধে। খলিফা যে সমস্ত জিনিসগুলিকে অপছন্দ করছিলেন, ফজল বিন রাবী সেইগুলিকে অতি তৎপরতার সাথে খলিফার কর্ণগোচর করতে থাকেন। আরব গোষ্ঠী সময়ের এই সুযোগকে হাত ছাড়া না করেই একযোগে বার্মেকি বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

ষষ্ঠ—আব্বাসা ও জাফরের গোপন প্রণয় ঃ মানুষের মন সন্দেহ বা কল্পনাপ্রবণ, একথা চিরসত্য। মানুষ কল্পনাকে ভালবাসে, তাই সৃষ্টি করে কল্পনাজগৎকে। অনেক সময় অনেক ছোটখাটো ইতিহাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বানিয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু ইতিহাস দূর অতীতের অতি বাস্তব চিত্র। বিগত সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপ ও ছাপ। ইতিহাস সমাজ-নদীর প্রশান্ত সলিল-সমাজের সূক্ষ্মাতীত বাস্তব দলিল। কোন ঐতিহাসিক খলিফা হারুণের 'হারেমের' একটা ঘটনাকে বার্মেকিদের পতনের প্রধান কারণ বলে মনে করেন। রাবী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলেন—খলিফা হারুণের ভগ্নী রাজনন্দিনী আব্বাসার সাথে বার্মেকি বংশীয় প্রধানমন্ত্রী জাফরের নাকি গোপন প্রণয় ছিল। কেউ কেউ বলেন—তাঁদের মধ্যে নামে মাত্র বিবাহও নাকি সম্পন্ন হয়। খলিফা স্বয়ং নাকি এটিকে অনুমোদন করেছিলেন, এবং ফরমানও জারি করেছিলেন যে, তাঁরা উভয়ে খলিফার সাক্ষাৎ ব্যতীত কোথাও নির্জনে গোপনে মিলিত হতে পারবেন না। এ কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তববিরোধী। বিবাহের প্রথম অর্থই হল নর-নারীর নির্জনবাস বা গোপন মিলন। তাই ঐ কথাটা আদৌ সত্য নয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ঐতিহাসিক এম. এম ইমামুদ্দীন মনে করেন—পরিশেষে আব্বাসা নাকি একটি অবৈধ সন্তানও প্রসব করেন। অবৈধ গর্ভধারণের পর তাঁদের মধ্যে নাকি বিবাহও সম্পন্ন হয়। এবং আব্বাসা ঐ অবৈধ সন্তানও প্রসব করলে তাঁকে খলিফার ক্রোধ হতে রক্ষা করার নিমিত্ত নাকি মক্কায় প্রেরণ করা হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে খলিফা নাকি জাফরের প্রতি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে কোন সত্য, সারবস্তু না থাকায় জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক জুরজী জায়দান ও ইবনে খালদুনের মতো ঐতিহাসিক এই ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, সাজানো, উদ্দেশ্যমূলক ও বিভ্রান্তিকর বলে অভিমত প্রদান করেছেন। স্বয়ং ইবনে খালদুন এই ঘটনাটির কোন মূল ভিত্তি না পেয়ে মতামত দেন—"আল-আব্বাসার ধার্মিকতা, বংশ-কৌলিন্য, বিচক্ষণতা ও আপন পদমর্যাদার সঙ্গে এই অপবাদ সামঞ্জস্যহীন।" সত্যিকারই কোন নর-নারীর বা যুবক-যুবতীর মধ্যে গোপন প্রণয় দানা বেঁধে

থাকলে, সেখানে ঐ প্রণয় ও প্রেমের কাছে—মানুষের ধর্ম, বংশ, সাহস, আদর্শ, ভয়, লজ্জা সকলই পরাস্ত। এমনকি প্রাণের বিনিময়েও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে। কিন্তু এখানে আব্বাসা ও জাফরের মধ্যে কোন প্রেমই বিনিময় হয়নি। তাই প্রেমের অপরিমিত শক্তির এখানে কোন কথাই ওঠে না। সুতরাং আব্বাসা ও জাফরের কাহিনী অলীক, অবাস্তর ও কষ্টকল্পনা মাত্র। এই সাজানো কাহিনীর সাথে বার্মেকি বংশের পতনেরও কোন সম্পর্ক নেই।

সপ্তম-খোদ খলিফার রোষদৃষ্টিঃ বার্মেকি বংশের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল—খোদ খলিফার রোষদৃষ্টি ও সন্দেহপরায়ণতা। খলিফা মনে মনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, যে ভাবেই হোক তিনি বার্মেকি বংশকে একেবারেই জাহান্নামে পাঠাবেন। খলিফার এতখানি রোষদৃষ্টি বোধহয় বার্মেকি বংশ অনুধাবন করতে পারেননি। তাই কোন সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টাও করেননি। ৮০৩ খ্রীস্টাব্দে খলিফা হঠাৎ একদা রাত্রে প্রধানমন্ত্রী বাল্যসাথী জাফরকে হত্যার ফরমান জারি করলেন। মসরুর নামে যে অনুচর খলিফা ও জাফরের সাথে নৈশভ্রমণে বের হতেন, খলিফার নির্দেশে সেই মসরুর জাফরের শিরশ্ছেদ করলেন। ঐতিহাসিকদের মতে—জাফরের ছিন্ন মস্তক ও দ্বিখণ্ডিত দেহ জনসাধারণের অবলোকনের জন্য বাগদাদের প্রধান সেতুর ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হল। বৃদ্ধ পিতা ইয়াহইয়া-সহ ভ্রাতা ফজল মুসা ও মহম্মদকে কারাবরণ করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে বার্মেকি বংশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদেরও একই শোচনীয় অবস্থা দেখা দিল। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর পরিহাস বার্মেকি বংশকে গ্রাস করলো। ৩০,৬৭৬,০০০ দিনার মূল্যের বার্মেকি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। এক নজরে মনে হবে বার্মেকি বংশ যেন ঝড়ে এল এবং তুফানে গেল। বিশ্বের ইতিহাসে এ ঘটনা যেন নজির-বিহীন হয়ে থাকল। ৮০৫ খ্রীস্টাব্দে বৃদ্ধ অনুতপ্ত ইয়াহইয়া দূরে অতীতের বহু করুণ স্মৃতিকে বুকে নিয়ে কারাগারেই প্রাণত্যাগ করলেন। ৮০৬ খ্রীস্টাব্দে খলিফার দুধ ভাই ফজলও কারাগারে প্রাণত্যাগ করলেন। অন্য ভ্রাতৃদ্বয় মুসা ও মহম্মদ পরবর্তী খলিফার আমলে মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘদিন পরে ৮১৪ খ্রীস্টাব্দে খলিফা মামুনের সময় বার্মেকিদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে খলিফা হারুণ-আর-রশিদ ন্যায়বান খলিফা। তিনি এতখানি নিষ্ঠুর না হলেও পারতেন, তিনি তাঁদের সতর্কতা ও সাবধানবাণী শুনিয়ে সংশোধনের একটি সুযোগও দিতে পারতেন। তাই সতেরো বছর যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা আব্বাসীয় সাম্রাজ্য সুদৃঢ় হল, স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করল, তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা ন্যায়বান খলিফার চরিত্রে কালিমা লেপন করেছে। তাই আমীর আলি বলেন—"তিনি সন্দেহের অন্ধরোষে অবিরত অপবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বহু যুগের বিশ্বস্ত সেবার কথা ভুলে গেলেন।" এবং তিনি হঠকারিতার সাথে যা করলেন তা তাঁর গৌরবোজ্জ্বল শাসনকালকেই শুধু ম্লান

করেনি, পরবর্তীকালে তাঁর জীবনকেও চরম অনুশোচনায় ভরিয়ে তুলেছিল। তাই আমীর আলি বলেন—"এই ঘটনা শুধু হারুণ-আর-রশিদের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালের জ্যোতিকেই ম্লান করেনি, বরং তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে অনুশোচনা ও কৃতঘ্নতাজনিত বিবেকের দংশনে তমসাচ্ছন্ন করে রেখেছিল।"

এই ঘটনার পর বার্মেকি বংশকে আর কোথাও দেখা যায়নি। উত্থান যত উন্নত ও উচ্চ ছিল, পতনও ততই গভীর হল। যাই হোক যাঁদের জন্য ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা আজও বিশ্বের দরবারে ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগের অধিকারী, গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের অধিকারী, সেই বংশটিকে যে কোন কারণেই হোক একেবারে ইতিহাস থেকে, ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষে নির্মূল ও নির্বংশ করে কোন সমালোচকের চোখেই ভাল কাজ করেননি। এই ধৈর্যশীল সম্রাটই রোমানদের নাইসিফোরাসের মতো ধূর্ত, ধড়ীবাজ, ধৃষ্ঠতাপূর্ণ বিশ্বাসঘাতককে কতবারই না ক্ষমা করে আপন চরিত্রের মহানুভবতা দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনাকে মহানুভব খলিফর মহান চরিত্রের বিপরীতমুখী কাজ বলেই মনে হয়। নিঃসন্দেহে বার্মেকিগণ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলেন, এবং সেই বাড়াবাড়ির ঠিক যথাযথ উত্তর দিতে গিয়ে খলিফা যে উত্তর দিলেন, যে পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন, তা তাঁর মহানুভবতার ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু ও অশোভন হয়ে থাকল। বার্মেকিগণ ইতিহাসে তলিয়ে গেলেন, তাঁদের কথা আর কেউ কোনদিন তুলবে না। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা হারুণ রশিদ ততদিনই মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন, যতদিন ইসলামের ইতিহাস বেঁচে আছে। ততদিন তাঁর অমরত্ব কেড়ে নেয় মহাকাল আজও সে শক্তি অর্জন করেনি।

রাফির বিদ্রোহ : হারুণ-আর-রশিদের রাজত্বের শেষের দিকে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সমরকন্দে রাফির নেতৃত্বে এক আশ্চর্য ধরনের বিদ্রোহ দেখা দিলে সম্রাট তার যোগ্য উত্তর দান করে অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। সমরকন্দের এক সম্পদশালিনী মহিলা বাগদাদে তাঁর স্বামীর সহিত বসবাসকালে রাফি-বিন লাইসের প্রতি আসক্ত হয়ে অবৈধভাবে রাফির সহিত জীবনযাত্রা আরম্ভ করলে তাঁর স্বামী খলিফার দরবারে নালিশ জানান। খলিফার বিচারে রাফি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু রাফি কৌশলে কারাগার হতে পলায়ন করে ঐ অবৈধ স্ত্রীর বাসভূমি সমরকন্দে উপস্থিত হয়ে সেখানকার শাসনকর্তাকে অতর্কিতে নিহত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে পরবর্তী অঞ্চল বলখের শাসনকর্তা ভীরু আলি-ইবনে-ঈশা প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করলেন। ফলে সমগ্র এলাকাটাই সাময়িকভাবে বিদ্রোহী নেতার করতলগত হলে খলিফা এই সংবাদে তাঁর যোগ্য সেনাপতি হারসামাকে এক বিরাট বাহিনী-সহ প্রেরণ করলে হারসামা প্রথমেই আলিকে বন্দী করে তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে রাক্কায় খলিফার দরবারে প্রেরণ করেন। আর বিদ্রোহী রাফিকে জীবনের মতো সমুচিত শিক্ষা দিয়ে সমগ্র অঞ্চল পুনর্দখল

করে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে সেনা হারাসামা সগৌরবে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

হারুণের জীবনাবসান: সমরকন্দে বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ৮০৮ খ্রীস্টাব্দে খারেজিরা বিদ্রোহ আরম্ভ করলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে খলিফা তাঁর পুত্র কাশেমকে রাক্কায় ও আমিনকে বাগদাদে রেখে নিজেই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হলেন। যুবরাজ মামুন পিতা ও খলিফার স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য করে অভিযানে পিতার সহিত রওনা হলেন। পারস্যে প্রবেশ করেই খলিফা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পুত্র মামুনকে সেনাবাহিনীর একাংশ নিয়ে দ্রুত মার্ভের দিকে পাঠিয়ে দেন, এবং নিজে ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু তাঁর শরীর এতই খারাপ ছিল যে তিনি তুস নগরীর নিকট সামাবাদ পল্লীতে পৌঁছান মাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং খলিফা তাঁর জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে পরিবারবর্গ সকলেরই নিকট সংবাদ পাঠালেন। মাত্র দুদিন অসুস্থ থাকার পর ৮০৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ২৩ বছর ৬ মাস গৌরবের সহিত রাজত্ব করার পর মাত্র ৪৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

হারুণের চরিত্র—ধর্মভীরুতা: হারুণ-আর-রশিদকে আরবের শ্রেষ্ঠতম ও পৃথিবীর অন্যতম সম্রাট বলে আখ্যায়িত করা হয়। খলিফা ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীল, ধর্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ। ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলি তিনি শুধু পালনই করতেন না, গতানুগতিক ধর্মের ঊর্ধ্বে তিনি বহু কিছু করতেন। ইসলামধর্মে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত (বার) নামাজ অতি অবশ্যই পালনীয় (ফরজ)। খলিফা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পালন করার পরও প্রতি রাত্রে অতিরিক্ত একশো রাকাত নফল নামাজও পড়তেন। সম্রাট হয়েও প্রতি বছর রমজান শরীফের রোজা রাখতেন। ফকির-মিসকিন বা গরিব মানুষকে খাইয়ে রোজা রাখা হতে নিষ্কৃতিলাভের কোনদিনই চেষ্টা করতেন না। সমগ্র দিন একবিন্দু পানিও স্পর্শ না করে সম্রাট তাঁর জীবনে প্রমাণ করে গেছেন—ধর্মপালন কাকে বলে। তেইশ বছরের রাজত্বে তিনি নয়বার হজব্রত পালন করেন। প্রতিবারেই একশো আলেম-উলেমাকে সঙ্গে নিতেন। কোন কারণে হজ্ব পালনে খলিফা অসমর্থ হলে তিনি তিনশো ব্যক্তিকে হজ্ব পালনের জন্য পাঠাতেন। নিষ্ঠা, সততা, উদারতা, ধর্মপরায়ণতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। গিলমান বলেন—"হারুণ নিজেও অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন এবং ধর্মীয় অনুশাসনগুলি পালনে যেরূপ যত্নবান ছিলেন, সেইরূপ লঙ্ঘন করতেও ইতস্তত করতেন না।"

বদান্যতা: কখনও কখনও রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য খলিফা নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। পরম বিশ্বস্ত বার্মেকি পরিবারের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করা ব্যতীত কোন উপায়ই ছিল না। খলিফা যদি ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রদ্রোহী বার্মেকিদের প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা

গ্রহণ না করতেন তাহলে তাঁর চরিত্র চরম দুর্বলতার দোষে দুষিত হত, রাজ্যেরও পরিণাম ভয়ংকর হত। তিনি তাঁর চরম বদান্যতার জন্য বার্মেকিদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বার্মেকিগণ নিজেদের স্থান ও মান যথাযথভাবে নির্ণয় করতে না পারায় মহানুভব খলিফাকে ঐ পথ ধরতে হয়। তাঁর বদান্যতার কোন সীমা ছিল না। আরব উপন্যাসে তাঁর বদান্যতার কথা কথায় কথায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ছদ্মবেশে লোকচক্ষুর আড়ালে বাগদাদের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। ঐতিহাসিক তাবারি বলেন—"খলিফা হারুণ জাকাত ব্যতীত প্রতিদিন ১০০ দিরহাম গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন। হজ্বের সময় তিনি অনেক ধার্মিক গরিব মুসলমানের হজ্বের ব্যয়ভার বহন করতেন।

বৈচিত্র্যে ভরা চরিত্র : প্রতিটি রাজা-বাদশার চরিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় তা বৈচিত্র্যে ভরা। হারুণ রশিদের চরিত্রও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। তাঁর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। একদিকে তিনি ধার্মিক, নিষ্ঠাবান, মিতব্যয়ী, দানশীল ও নিরহংকার ছিলেন। আবার অন্যদিকে রাজকীয় আড়ম্বর ও জাঁকজমকও খুব ভালবাসতেন। আমীর আলি বলেন—"তিনি ধর্মীয় কর্তব্য পালনে ছিলেন নিষ্ঠাবান, মিতব্যয়ী, সাধু ও নিরহংকার, আবার রাজকীয় জাঁকজমকে পরিবেষ্টিত থাকার অসাধারণ মোহও তাঁর ছিল। উভয় দিক হতে তিনি সমাজে তাঁর চরিত্রের প্রভূত ছাপ রেখে গেছেন।"

সন্দেহপ্রবণতা : সন্দেহপ্রবণতাও প্রায় প্রতিটি রাজচরিত্রের আবশ্যিক বস্তু। প্রাণ আছে বলেই মানুষের প্রাণনাশের স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। ধন থাকলে ধনীরও তাই হয়। রাজা-বাদশার জীবনেও ঠিক ঐ একই কথা প্রযোজ্য। রাজদরবারে যেমন অনেককেই বিরাগভাজন হতেই হয়, রাজাকেও তেমনি প্রায-সময় সন্দেহভাজনও হতে হয়। খলিফা হারুণের চরিত্রেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন—বিজ্ঞ, দানবীর, গুণগ্রাহী, বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ এবং মহানুভব। আবার অন্যদিকে ধৈর্যহীন, সন্দেহপ্রবণ। রাজোচিত সমস্ত গুণাবলী তাঁর চরিত্রে থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। খলিফার পিতা মনসুর একদিন ঈর্ষান্বিত ও সন্দেহজনক ভাবেই তাঁর চাচা আব্দুল্লাহর যে ভাবে জীবনাবসান করলেন, তা সত্যিই বড়ই বেদনাদায়ক। পিতৃতুল্য একটি বৃদ্ধের প্রতি তাঁর কোন মমতাও জাগল না, রাজমোহ এমনি অন্ধ। খলিফা মনসুর শুধু সন্দেহের বশে যাঁরা আব্বাসীয় খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, প্রাণ দিলেন, সেই মহম্মদ ও ইব্রাহিম এবং আবু মুসলিমকে যেভাবে হত্যা করলেন, তার কোন জবাব নেই। হৃদয়হীনতার এর চেয়ে নির্মম নিষ্ঠুর পরিচয় আর কি হতে পারে! ঠিক অনুরূপভাবেই পুত্র হারুণ মুসা আল-কাজমের মতো জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতকে যেভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন এবং যেভাবে তিনি (৭৯৯ খ্রীঃ) সেখানে মৃত্যু-

বরণ করলেন, সে কথার শোকগাথা রচনা করলে তার কোন শেষ নেই। বহুদিনের সেবক ও রাজভক্ত সমগ্র বার্মেকি পরিবারটিকে শাস্তি দিলেন সংশোধন না করে। সংশোধিত হওয়ার কোন সুযোগ না দিয়েই খলিফা যেভাবে বংশটিকে নির্মূল করলেন, তা সত্যিই মর্মান্তিক, হৃদয়বিদারক। এই দু' একটি নিষ্ঠুরতা ব্যতীত হারুণের চরিত্রে আর কোন নিষ্ঠুরতার নজির পাওয়া যায় না। আমীর আলি বলেন—"হারুণ-আর-রশিদের চরিত্রে প্রধান দোষ ছিল তাঁর আকস্মিক সন্দেহপ্রবণতা অথবা ধৈর্যহীনতা।" এইসব সত্ত্বেও হারুণকে প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরাচারী সম্রাট বলা যাবে না। কারণ তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও সদ্‌গুণাবলী তাঁর চরিত্রের সকল দোষকে অতিক্রম করে খলিফাকে মহানুভবতা দান করেছে। অন্যথায় খলিফা ইসলামের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে পারতেন না। মুইর বলেন—"আব্বাসীয় বংশের মধ্যে সম্ভবত হারুণই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। মিতব্যয়িতা ব্যতিত হারুণের চরিত্রের সহিত তাঁর সংযোগ ছিল। হিট্টি বলেন—"ইতিহাস এবং উপাখ্যান সম্মিলিত ভাবে হারুণ রশিদের খেলাফতে বাগদাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা করে।"

হারুণ-আর-রশিদের কৃতিত্ব—শ্রেষ্ঠত্বঃ খলিফা হারুণ-আর-রশিদ শুধুমাত্র আব্বাসীয় খেলাফতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিভাবান খলিফাই ছিলেন না, বরং সমসাময়িক পৃথিবীর নৃপতিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সমরকুশলী, প্রজারঞ্জক, বিদ্যোৎসাহী ও সুযোগ্য শাসক। আল-মনসুরের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ নগরী হারুণের আমলে গৌরবের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হয়। হিট্টি বলেন—"নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্বপরিক্রমায় দুজন নৃপতি ভাস্বর হয়ে রয়েছেন—পাশ্চাত্যে শার্লিমেন এবং প্রতীচ্যে হারুণ-আর-রশিদ। তবে উভয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে হারুণ অধিকতর সক্ষমতাশালী ও সংস্কৃতিবান ছিলেন।"

সমরকুশলী—অভ্যন্তরীণ নীতিঃ হারুণের অভ্যন্তরীণ নীতির প্রধান মূলমন্ত্র ছিল—বিদ্রোহের উৎসগুলিকে কঠোর হস্তে নির্মূল করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই একদিন তিনি মুসা-ইবনে-কাজিমের মতো পাণ্ডিত্যকেও বন্দী করেন এবং তিনি কারাগারেই প্রাণত্যাগ করেন। যার ফলে শক্তিশালী শিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্তিমিত হয়ে গেল। আল-মাহদির খেলাফতেও তিনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে তাঁদের সমুচিত শিক্ষা দেন। সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরজকতাও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য কখনও কখনও স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করতেন। তাঁর অসামান্য দক্ষতা, রণ-কুশলতা, সাহসিকতা ও তেজস্বিতা শত্রুদের দমন করে বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কায়েম করে। আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, মসুল ও এশিয়া মাইনরে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হলে খলিফা সকল বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করতে সক্ষম হন। এমনকি মৃত্যুর পূর্বেও

আপন শারীরিক অবস্থা ভাল না থাকা সত্ত্বেও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করার নিমিত্ত খলিফা স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে পথিমধ্যে তুসনগরীর নিকটবর্তী সানাবাদ নামক পল্লীতেই প্রাণত্যাগ করেন। মুইর বলেন—"হারুণের পূর্বে অথবা পরে কোন খলিফাই ধর্মীয় কাজে, হজব্রত পালনে, শাসনব্যবস্থায় ও যুদ্ধাভিযানে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে এত উদ্যমশীলতা ও কর্মতৎপরতা প্রকাশ করতে পারেননি।"

বৈদেশিক নীতি : বাইজাণ্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে খলিফা একটি বলিষ্ঠ ও ন্যায়সঙ্গত বৈদেশিক নীতির প্রবর্তন করেন। মুসলিম সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ মনে করে খলিফা বিশ্বাসঘাতক বাইজাণ্টাইন নৃপতি নাইসিফোরাসকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও বিশাল বাহিনী তৈরি করেন। যুবরাজ হিসাবে তিনি সম্রাজ্ঞী আইরিনের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। যুবরাজের বীরত্বে, রণনৈপুণ্যে ও বিচারে প্রীত হয়ে আল-মাহদি ভ্রাতা হারুণকে 'আর রশিদ' অথবা ন্যায়নিষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে তিনবার কৃতঘ্ন নাইসফোরাসকে পরাজিত, বশ্যতা ও কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু তাঁর উদারতা ও মহানুভবতার সহজ সুযোগ নিয়ে প্রতিবারেই বাইজাণ্টাইন সম্রাট পবিত্র সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেন। ঐতিহাসিক গিবনও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নাইসিফোরাসের নিন্দা করেন ও বলেন—"রণক্ষেত্রে ৪০ হাজার সৈন্যকে ফেলে তিন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত বাইজাণ্টাইন সম্রাট নাইসিফোরাস পলায়ন করেন। কৃতঘ্ন নাইসিফোরাসকে বারবার ক্ষমা প্রদর্শনে খলিফার অদূরদর্শিতার পরিচয়ও ফুটে উঠেছে। আমীর-আলি বলেন—"নাইসিফোরাসের প্রতি উদারতা প্রকাশ করে হারুণ অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন।" বৈদেশিক আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করার জন্য তিনি সীমান্তের দুর্গগুলিকে সুরক্ষিত করেন, এবং স্থানে স্থানে সৈন্যশিবিরও খোলেন। সেনা বাহিনীর একদিকে শারীরিক ও অন্যদিকে নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বিনা কারণে পররাজ্য আক্রমণ তাঁর বৈদেশিক নীতি-বিরুদ্ধ ছিল। বৈদেশিক নীতিতে তিনি উমাইয়া যুগের পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন খলিফা দ্বিতীয় ওমরের সাথে তুলনীয় হতে পারেন। যদিও দ্বিতীয় ওমরের মানবতা ও মহানুভবতা সারা বিশ্বের বিস্ময় ছিল। মানব মাত্রই যাঁর নীতিতে স্তম্ভিত হয়েছেন, এই দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত সমগ্র আরব-জাহান কোন যুগের কোন খলিফাকেই এই পবিত্র সুমহান উপাধি "পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন" উপাধি দান করেননি।

সংগঠক : শাসনব্যবস্থা, জনকল্যাণকর কার্যকলাপ, নহর-ই-জুবাইদা, বিমারিস্তান, ব্যবসা-বাণিজ্য।

শাসনব্যবস্থা : এ কথা সর্বজনবিদিত যে খলিফা হারুণের সুষ্ঠু শাসন

ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর শাসনব্যবস্থার মূলে দুটো নীতি প্রধানত লক্ষ্য করা যায়—উদারতা ও প্রজামঙ্গল। এই শাসনব্যবস্থার পরিচালনার ভার মূলত যাঁদের ওপর ন্যস্ত ছিল, তাঁরা ছিলেন পারস্যের শিয়া মতাবলম্বী বার্মেকি পরিবার। খলিফার চব্বিশ বছর রাজত্বের দীর্ঘ সতেরো বছর বার্মেকিগণ পরিচালনা করে সাম্রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি, শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশের জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন ছিল, তা তাঁরা সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হয়েছিলেন। বার্মেকিদের মাধ্যমে খলিফার রাজত্বে পারস্য প্রভাব বিপুলভাবে প্রবেশ করে। দরবারে প্রধানমন্ত্রী ও হাজিব প্রভৃতি পদের প্রবর্তন হল, ব্যবহৃত হল শিরস্ত্রাণ ও অন্যান্য নানা ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ। বহু আরব অনুষ্ঠানও স্থানলাভ করল। এ সমস্তই বার্মেকি পরিবারের অবদান। তবে যাঁদেব অনিবার্য সাহায্যে বার্মেকিগণ আপন পদ্ধতির প্রয়োগে কৃতকার্য হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন সময়ে খলিফাদের বেগমমহল। এই বেগমদের অধিকাংশই ছিলেন পারস্য তনয়া। শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শানুযায়ী প্রতিটি প্রদেশে কর্মচারী নিয়োগ ও প্রতিটি কার্যের পর্যবেক্ষণ করা হত। এতদ্ব্যতীত খলিফা স্বয়ং রাত্রিবেলায় ছদ্মবেশে বেরিয়ে প্রজাবৃন্দের অবস্থা অবলোকন করতেন। খলিফা হারুণ-আর-রশিদের শাসনে একটি জিনিস ফুটে উঠেছিল অতি পরিষ্কার ভাবেই—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। সারা রাজ্যে জনসাধারণ, ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রীগণ যাতে অবাধে সারা দেশে পরিভ্রমণ করতে পারেন, তার জন্য সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুলার বলেন—"পারস্য প্রথার ভিত্তিতে পৃথক বিভাগ (দেওয়ান) বিশেষভাবে সৈন্যবাহিনী, রাজস্ব, আয়কর, ডাক ও প্রদেশসমূহ নিয়ে একটি সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নবম ও দশম শতাব্দীতে এই ব্যবস্থা আরো সম্প্রসারিত হতে থাকে।" বিদেশী আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করার নিমিত্ত খলিফা সীমান্তে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটির ব্যবস্থা করেন। জোসেফ হেল বলেন—"হারুণ রশিদেব আমলে সম্পূর্ণরূপে সামরিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি সীমান্ত প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়, বাসগৃহ ও স্থায়ী ছাউনিও নির্মিত হয়। তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময়ে সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে ক্রমাগত যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং জনমানবশূন্য এলাকাগুলি নতুন জীবন এবং উদ্দীপনায় মুখর হয়ে ওঠে।"

জনকল্যাণকর কার্যকলাপ ঃ প্রজারঞ্জক, জনদরদী এবং মহানুভব খলিফা হিসাবে খলিফা হারুণ-আর-রশিদ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। হারুণের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জুবাইদা হজব্রত পালনের জন্য মক্কা গমন করলে সেখানকার মানুষ ও আগত হজযাত্রীদের পানীয় জলেব কষ্ট দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং কেউ বলেন দশ লক্ষ, কেউ বলেন এক লক্ষ দীনার ব্যয়ে ২৫ মাইল দূর হতে একটি খাল

খনন করে পবিত্র মক্কা নগরীতে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করেন। এই কাজে খলিফা মুগ্ধ হয়ে খালটির নাম দেন—'নহর-ই-জুবাইদা। এই কাজে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর জনদরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রজাবৃন্দের সুবিধার জন্য খলিফা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, সেতু, কূপ খনন, এতিমখানা, সরাইখানা, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি অসংখ্য কাজের দ্বারা জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। খলিফা তাঁর প্রজাবাৎসল্যের অপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন 'বিমারিস্তান' (হাসপাতাল) নির্মাণ করে। হিট্টি বলেন—"খলিফা হারুণই সর্বপ্রথম জনসাধারণের সুচিকিৎসার জন্য বিমারিস্তান নির্মাণ করেন।" পরবর্তীকালে সমগ্র রাজ্যে কমপক্ষে ৩৪টি হাসপাতাল গড়ে ওঠে। এছাড়া অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলা হয়। বিশেষ রোগের জন্য বিশেষ ধরনের হাসপাতালও নির্মাণ করা হয়। খলিফা হারুণের সময় ভ্রাতা আল-মাহদি কর্তৃক প্রবর্তিত জনসাধারণের অভিযোগ দূরীকরণ বিভাগ (নজর-ই-আল-মজালিস) আরো সম্প্রসারিত হয়। এই বিভাগ দ্বারা গরিব ও অসহায় জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছিল। হিট্টি বলেন—"ডিলেসেপের এক হাজার বছর পূর্বে হারুণ নামে একজন আরব খলিফা সুয়েজের অন্তরীপ দিয়ে একটি খাল খননের পরিকল্পনা করেন।" গরিব দীন-দুঃখীদের জন্য, অসহায় নর-নারীর জন্য, এতিমদের জন্য তিনি নিয়মিত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সারা রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইবনে খালদুন বলেন—"রশিদ মিতব্যয়িতা ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে তাঁর পিতামহের (আবুল আব্বাস) পদক্ষেপ অনুসরণ করেন। কিন্তু দানশীলতা ও মহানুভবতায় অপর কোন খলিফাই রশিদকে অতিক্রম করতে পারেননি।"

কূটনীতিবিদ ঃ খলিফা হারুণ-আর-রশিদ সহাবস্থানে বিশ্বাসী সম্রাট ছিলেন। কোথাও অত্যাচার ও আক্রমণ পছন্দ করতেন না। অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া এবং আক্রমণ করা ও আক্রান্ত হওয়া উভয়টিকেই তিনি অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন। তাই আব্বাসীয় রাজত্বে খলিফা হারুণের রাজত্বকাল শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, সারা বিশ্বের ইতিহাসেও একটি রোমাঞ্চকর ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। তাঁর সহাবস্থান নীতি তাঁকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজ্যের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী করে। তিনিই সর্বপ্রথম মুসলিম খলিফা যিনি চীনের সম্রাট ফাগফু (Faghfu)-র প্রেরিত দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে নবম শতাব্দীতে হারুণ যে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তা সত্যিই বিরল। চীন ও ভারতবর্ষের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে উভয় দেশের মধ্যে নানা উপঢৌকনে ও মত বিনিময়ে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফ্রান্সের নৃপতি

শার্লিমেন (Charlimane) ও খলিফা হারুণের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মূলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল। বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে খলিফা হারুণকে মিত্র হিসাবে পাওয়ার জন্য নৃপতি শার্লিমেন যতটুকু ব্যগ্র ছিলেন, খলিফা হারুণও স্পেনের নব প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া রাজত্বের বিরুদ্ধে শার্লিমেনকে মিত্র হিসাবে পাওয়ার জন্য ততটুকুই উৎসুক ছিলেন। হিট্টি বলেন—"তবুও এই দুজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে হারুণ অধিকতর ক্ষমতাশালী ও সংস্কৃতমনা ছিলেন।" উভয় সম্রাট শান্তিতে বসবাসের জন্য দূত বিনিময়ও করেন। খলিফা যে সমস্ত উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ, সুগন্ধি দ্রব্য ও জল-ঘড়ি (Water Clock) উল্লেখযোগ্য। খলিফা ৭৯৭ হতে ৮০৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নানা দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে ভরা বাগদাদঃ খলিফা আল-মনসুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ নগরী একদিন বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই বিশ্বদৃষ্টিকে চির বিস্ময় দান করল খলিফা হারুণ-আর-রশিদের বাগদাদ। আব্বাসীয় খলিফা হারুণ যেমন রূপকথার রাজকুমারের ন্যায় খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁর আমলে বাগদাদ নগরী তেমনি ঐশ্বর্যে, বৈভবে, প্রাচুর্যে, সৌন্দর্যে সুষমামণ্ডিত হয়ে একটি স্বপ্নপুরীর মর্যাদা লাভ করে। ঐতিহাসিক খাতিব বলেন—"সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে এই নগরীর জোড়া ছিল না।" (A city with no pair through out whole world.) এক কথায় আল-মনসুরেব প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ নগরী হারুণের রাজত্বে আরব্যোপন্যাসের খ্যাতি অর্জন করে। আল-মনসুরের গোলাকৃতি বাগদাদ শহরের এক-তৃতীয়াংশে সুরম্য রাজপ্রাসাদ, সুসজ্জিত হারেম, জাঁকজমকপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন এবং আমীর ওমরাহদের প্রাসাদ হর্ম্যরাজি নগরীকে ভূস্বর্গে পরিণত করেছিল। প্রাচ্যের জাঁকজমক পাশ্চাত্যকে ঝলসিয়ে তুলেছিল খলিফা হারুণের রোমাঞ্চকর রাজত্বকালে। সম্রাজ্ঞী জুবাইদা এরূপ সৌখিনা ছিলেন যে, রত্ন-খচিত স্বর্ণ অথবা রৌপ্যনির্মিত পাত্র ব্যতীত তিনি কোন তৈজসপত্র ব্যবহার করতেন না। তিনিই প্রথম বত্ন-খচিত জুতার ব্যবহার প্রচলন কবেন। কপালের একটি দাগ ঢাকবার জন্য খলিফার ভগ্নী প্রথম যে রত্ন-খচিত স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করেন, পরবর্তীকালে তা সারা পৃথিবীতে টায়রা নামে এক মূল্যবান অলঙ্কারের মর্যাদা লাভ করে। রাষ্ট্রীয় যে কোন উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে পালিত হত। যেমন খলিফার অভিষেক, রাজকুমারের বিবাহ, বৈদেশিক রাজার ও দূতের আগমন ইত্যাদি। ৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ৩৯ বছর বয়স্ক যুবরাজ খলিফা মামুনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আল-হাসান-ইবনে সহলের অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা পরমাসুন্দরী বুরানের বিবাহ উপলক্ষে এরূপ অর্থ ব্যয় হয়, যাকে আরবী সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজপ্রাসাদ ব্যতীত হারুণের সহচর ও প্রধানমন্ত্রী জাফর ইউফ্রেতিস

নদীর পূর্ব তীরে 'আল-জাফর' নামে একটি সুষমমাণ্ডিত প্রাসাদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এই প্রাসাদকে কেন্দ্র করে বাগদাদ নগরীতেও অনেকগুলি প্রাসাদ নির্মিত হয়। জাফরও অত্যন্ত সৌখিন ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনাও তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। এমনকি মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। যার জন্য তিনি পরবর্তীকালে রাজদরবারে কয়েকটি নতুন ধরনের পোশাকেরও প্রবর্তন করেন। হারুণের মাতা খায়জুরানের বার্ষিক আয় ছিল ১৬ কোটি দিরহাম। বার্মেকিদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার দিনার। এক কথায় খলিফা হারুণ-আর-রশিদের রাজত্বকাল ছিল যেমন ঐশ্বর্যে ভরপুর, জীবনযাত্রা ছিল তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা সাধন : ইসলামের ইতিহাসের প্রবাদ পুরুষ খলিফা হারুণ-আর-রশিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর বিদ্যোৎসাহিতা শুধুমাত্র আব্বাসীয় যুগেই নয়, সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং মার্জিত, রুচিসম্মত ও হৃদয়বান খলিফার অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ-জীবনের সকল শাখাই যেন ফলে-ফুলে সুন্দর শ্যামল বর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। যার ফলে মুসলমানগণ ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত, ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে যেতে সক্ষম হন। এই কথারই সমর্থনে ঐতিহাসিক গ্রুনিবাম বলেন—"মুসলিম সম্প্রদায়ের স্মৃতিতে হারুণ রশিদের শাসনকালকে খেলাফতের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।"

ধর্মতত্ত্ব : উমাইয়া খলিফাগণের অধিকাংশই পার্থিব-ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু আব্বাসীয়গণ পার্থিবক্ষেত্রে অধিকার লাভ করে মুসলমান সম্প্রদায়কে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করেন। খলিফা হারুণের ধর্মপরায়ণতার জন্য মুসলিম ধর্মতত্ত্বে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ধর্মতত্ত্বে যাঁরা অসাধারণ জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দেন তাঁদের মধ্যে—ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফী, ইমাম মুসা আল-কাজিম, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মহম্মদ, ইমাম হাম্মাদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তখন ইমাম বুখারি বিখ্যাত মোহাদ্দেসের সম্মান লাভ করেন। আমীর আলি বলেন—"তাঁর আমলে সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারক আবু ইউসুফের নেতৃত্বে একদল আইনজ্ঞ হানাফী স্কুলকে সুষ্ঠু ও সুসংহত রূপ দান করেন।" ফুলার বলেন—"শিয়া সম্প্রদায়ের পরিবর্তে আব্বাসীয়গণ রসুলের প্রকৃত হাদিস সংরক্ষণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং মুসলিম সমাজের রীতিনীতিকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন।" খলিফা যেমন এই সমস্ত কাজকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলেন. তেমনি এই কাজগুলিও (যেমন হাদিস চর্চা, সুন্নী ইসলামের উৎকর্ষসাধন, ও হানাফী স্কুলের সংগঠন প্রভৃতি) তাঁর খেলাফতের মর্যাদা ও গৌরবকে বৃদ্ধি করে।

সাহিত্য ও কাব্যঃ দেশের বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, উপন্যাসিক, হাস্য-রসিক, ব্যাকরণবিদ, আলেম ও ফকিহ হারুণের দরবারকে স্বর্গে পরিণত করেছিল। স্বয়ং খলিফাও স্বনামধন্য কবি ছিলেন। কোন এক সময় তিনি হিরাক্লিয়া হতে আনীত হেলেন নামক রোমক ধর্মযাজকের এক কন্যাকে প্রেম নিবেদন করে যে কবিতা লেখেন তা কাব্য সাহিত্যের মানদণ্ডে অসামান্য প্রশংসা অর্জন করে। আবু নুওরাস একদিকে খলিফার পার্শ্বচর ছিলেন, আবার অন্যদিকে দরবারের সভাকবিও ছিলেন। তিনি জাগতিক বিষয়ের ওপর কবিতা রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অধিকাংশ গজল পারস্য-গজলের অনুকরণে রচিত হয়েছিল। হিট্টি তাঁকে মুসলিম জগতের গীত ও সুর-সংক্রান্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি বলে অভিহিত করেন। আবুল-আতাহিয়া ধর্মীয়-জগৎ নিয়ে তাঁর কাব্যজগৎকে গড়ে তোলেন। তাঁর ধর্মীয় কবিতাগুলি মানুষকে তন্ময় করে তোলে ধর্মের শাশ্বত আবেদনে। অন্যান্য কবিদের মধ্যে মুসলিম বিন ওয়ালিদ স্তুতিবাদ রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর কবিতার এমনি এক সম্মোহনী শক্তি ছিল যে, তিনি বিমর্ষ খলিফাকে মুহূর্তের মধ্যে আনন্দময় করতে পারতেন। খলিফার উদ্দেশে রচিত একটি কাসিদার (বড় কবিতা) জন্য খলিফা কবি মারওয়ান ইবন-আবি হাফসাকে ৫০০০ দিনার, একটি সুন্দর ঘোড়া ও দশটি সুশ্রী গ্রীক ক্রীতদাসী উপহার দেন।

আরব্যোপন্যাসঃ খলিফা হারুণ-আর-রশিদকে ইসলামের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর ব্যক্তিত্ব (Romantic Personality) বলা হয়ে থাকে। এই রোমাঞ্চকর ব্যক্তিত্বের অধিকারী খলিফা হারুণ রশিদ ও স্বর্গপুরী বাগদাদ নগরী সম্পর্কে একটি যথাযথ উক্তি করা যেতে পারে। বাগদাদ নগরী ব্যতীত হারুণ যেমন অসম্পূর্ণ ও অনাড়ম্বর থাকতেন, বাগদাদ নগরী ও আরব্যোপন্যাসও তেমনি হারুণ ব্যতীত অসম্পূর্ণ ও অজ্ঞাত থাকত। প্রাচীন পারস্য পুস্তক "সহস্ররাত্রি" (Hazar Afsana)-কে ভিত্তি করে পরবর্তীকালের বিশ্ববিদিত এক অতুলনীয় গ্রন্থ আরব্যোপন্যাস বা "এক সহস্র এক রজনীর কাহিনী" লিখিত হয়। এই বিশ্ববন্দিত গ্রন্থটিতে পরবর্তীকালে যেন সারা বিশ্ব একত্রিত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রীক, ভারতীয়, হিব্রু ও মিশরীয় উৎস হতে বিভিন্ন উপাদান এতে মিলিত হয়। আরব্যোপন্যাসে হারুণের বিভিন্ন নৈশ অভিযানের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ফুলার বলেন—"এক সহস্র একটি রাত্রি নামে আরব, পারস্য এবং ভারতীয় উপাখ্যান সংবলিত কাহিনীর তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান উপলক্ষ, যা তাঁরই আমলে সংগ্রহ হতে থাকে। এই গ্রন্থ মিশরে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে সম্পূর্ণরূপে সংকলিত হয়নি।"

ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রভাবঃ আব্বাসীয় যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্যোতি একদিন তমসাচ্ছন্ন ইউরোপের অন্ধকারকে দূরীভূত করতে সাহায্য করেছিল।

আধুনিক ইউরোপের সভ্যতার যে পিলসুজ আজ সারা বিশ্বকে ঝলসিয়ে দিচ্ছে, তার বীজ আসলে আব্বাসীয় যুগের জ্ঞান-সাধনা। গীবন বলেন—"আরব্যোপন্যাস ব্যতীত রবিনসন ক্রুসো এবং গ্যালিভারের ভ্রমণকাহিনী সম্ভবত রচিত হত না।" তাই আব্বাসীয় যুগের জ্ঞানসাধনার নিকট ইউরোপ চির-ঋণী।

অনুবাদঃ হিট্টি বলেন—"এই যুগ পৃথিবীর ইতিহাসকে যে কারণে গৌরবোজ্জ্বল করেছে, তা হচ্ছে এই আমলে ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা বেশি উৎকর্ষ সাধিত হয়।" দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডারকে আপন ভাণ্ডারে টেনে নেওয়ার অপরিমিত শক্তি আব্বাসীয় যুগের পণ্ডিতগণ অর্জন করে আপন দেশকে জ্ঞানবহুল করে তোলেন। বিশ্বের কোণায় কোণায় যেখানেই তাঁরা কোন সুন্দর ও মূল্যবান জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন, তাকেই আপন ভাষাতে ভাষান্তরিত করে আপন করে তুলেছেন। ভারত ও পারস্যের অগণিত পুস্তক তাঁরা আপন ভাষায় অনুবাদ করেন। খলিফা আল-মনসুরের সময়ে গ্রীক ও সংস্কৃত পুস্তক হতে আরবী ভাষায় যে অনুবাদের সূচনা হয়, খলিফা হারুণের সময় তা অতি ব্যাপক আকার ধারণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকেই সবল ও সতেজ করে তোলে। খলিফা আল-মনসুরের আমলে ইসলামের প্রথম জ্যোতির্বিদ আল-ফাজারী অমূল্য সংস্কৃত পুস্তক 'সিদ্ধান্ত' অনুবাদ করে আরব জ্যোতির্বিদ্যাকে বহুগুণে বলিষ্ঠ করেন। পরে হারুণের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্যোতির্বিদ্যার বহু উৎকর্ষ সাধিত হয়। খলিফার সুপণ্ডিত গ্রন্থাগারিক আল-ফজল-ইবন নওবকত জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর লিখিত কতিপয় পারস্য গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। খলিফা হারুণের রাজত্বকালে সে যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত আল-হজ্জাজ-ইবনে-ইউসুফ-আল-মাত্তার ইউক্লিডের এলিমেণ্ট এবং টলেমির আল-মাজেণ্ট'-এর মতো দুরূহ গ্রন্থকে আরবীতে অনুবাদ করে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। অঙ্ক ও জ্যোতিষ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বিভিন্ন পুস্তকাদি অনুবাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হতে দেখা যায়। ইউহান্না-ইবনে-মাসাওয়া নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত কতিপয় গ্রীক পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করে আরব চিকিৎসাশাস্ত্রকে শক্তিশালী করেন। খলিফা হারুণ স্বয়ং মানকা নামক একজন ভারতীয় চিকিৎসককে বাগদাদের রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। এই অনুবাদ শাস্ত্রে বার্মেকি বংশের অবদান চির অনস্বীকার্য। আল-জাফরী প্রাসাদে তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় বহু অন-আরব মূল্যবান গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়ে আরব জ্ঞানভাণ্ডারকে কম অবদান জোগায়নি। পরবর্তী-কালে খলিফার রোষানলে ঐ বার্মেকি পরিবার অভিশপ্ত হলেও মানব সভ্যতায় তাঁদের দান চিরদিন আশীর্বাদ হয়ে থাকবে।

চিকিৎসাশাস্ত্র ঃ আব্বাসীয় আমলে চিকিৎসাবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। জনসেবার জন্য খলিফা হারুণের নির্দেশে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল

খোলা হয়। খলিফা মনসুর আপনার চিকিৎসার জন্য শাহপুর হতে প্রখ্যাত চিকিৎসক ইবন বকতিয়াশুকে বাগদাদে আনয়ন করলে উক্ত চিকিৎসকের বংশধরগণ অত্যন্ত খ্যাতির সাথে সাত পুরুষ পর্যন্ত রাজবংশের চিকিৎসা করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। বাগদাদ হাসপাতালে হারুণের খেলাফতে প্রধান চিকিৎসক ছিলেন জুরজি ইবন বকতিয়াশু। জুরজির পুত্র জিব্রিল একজন মরণাপন্ন ক্লীমিরোগগ্রস্ত ক্রীতদাসকে প্রকাশ্যে শুধু নস্য করে তার দুরারোগ্য রোগকে চিরতরে আরোগ্য করলে খলিফা তাঁকে আপন চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। নস্টোরিয়ান বকতিয়াশু পরিবারের সাহায্যে আরব চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্রীক প্রভাব স্থান পায়।

সংগীতঃ আরব্যোপন্যাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক খলিফা হারুণ-আর-রশিদ সংগীত ও নৃত্যে কম উৎসাহ দেখাননি। তাঁর দরবারে সংগীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্প, ভাঁড়, চাটুকার, হাস্যরসিক সকলেই সমানভাবে সম্মান পেতেন। অসংখ্য গায়ক, গায়িকা বেতনভুক হিসাবে সংগীতের চর্চা করতেন। ফারমার বলেন—"আরবদের নিকট যা সংগীত বলে বোঝাত তা এক সহস্র একটি রজনীর কাহিনীতেই প্রকাশ পেত। খলিফার দরবারে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন, তিনি ইব্রাহিম-আল-মাওসিল। খলিফা তাঁর সংগীত সাধনায় এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁকে মাসে ১০ হাজার দিরহাম বেতন দিতেন। একবার একটি মাত্র সংগীতের জন্য তাকে ১৫ হাজার দিরহাম পুরস্কার দেন। পরবর্তীকালে ইব্রাহিমের একজন ছাত্র মুখারিক ও সংগীতে গুরুকেও অতিক্রম করেছিলেন। একদা খলিফার সঙ্গে তাইগ্রীস নদীর তীরে ভ্রমণকালে তিনি যে সংগীত পরিবেশন করেন, তাতে প্রবাদ আছে, সাধারণ অসাধারণ 'সকলেই দ্র জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলেন।' আজও তাঁরা বিশ্বসংগীত জগতের প্রবাদপুরুষ।

স্থাপত্যশিল্প ও শিক্ষাঃ খলিফা হারুণ নিজে ছিলেন গুণীব্যক্তি, তাই চিরদিন গুণীর আদর ও সমাদর করতে ভোলেননি। জ্ঞানচর্চা তাঁর জীবনেরই ভূষণ ছিল। তাই শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য তিনি দু' হাতে দান করতেন। অসংখ্য মক্তব-মাদ্রাসা-মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। খলিফা আপন পুত্রদ্বয়কে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ আসমাকে নিযুক্ত করেন। প্রধান বিচারক আবু ইউসুফ রাজস্বব্যবস্থার ওপর কিতাব-উল-খারাজ নামে একটি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করে খলিফার শ্রদ্ধাভাজন হন। রাজদরবারে ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ফোজায়েল-ইবনে-আয়য়াদ এবং ইবন সারমাফ ও সুফিয়ান আল সওরী ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। কোথাও সমরাভিযানে গেলে খলিফা সে দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পুস্তকাদি সংগ্রহ করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতেন। শিল্প ও স্থাপত্যশিল্পে খলিফার যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি সম্রাট শার্লিমেনকে যে জল-ঘড়িটি উপহার দিয়েছিলেন, তা মুসলিম শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতির চিহ্ন বহন করে। গোলাকৃতি বাগদাদ নগরীর অভ্যন্তরে মনসুর কর্তৃক যে মসজিদটি

নির্মিত হয়েছিল, তা ৮০৮-৮০৯ খ্রীস্টাব্দে পোড়া ইট ও জিপসামের দ্বারা খলিফা হারুণ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়ে আজও সে যুগের স্থাপত্যশিল্পের চরম নিদর্শন বহন করছে। ৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে খলিফা হারুণ বাগদাদের পরিবর্তে পিতা মনসুর কর্তৃক নির্মিত রাক্কার প্রাসাদ দুর্গে বসবাস করেন এবং তিনিই নানা কারুকার্য-খচিত বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক বাগদাদ ফটক নির্মাণ করেন।

উপসংহার : হারুণ-আর-রশিদের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য সভ্যতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। অপরিমিত ক্ষমতার স্পর্শে পূর্বে কখনও এরূপ সমৃদ্ধি, বৈভব, শৌর্যবীর্য, ঐশ্বর্য-কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্মেষ ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়নি। আমীর আলি বলেন—"ঐতিহাসিক সমালোচনার সূক্ষ্ম কষ্টিপাথরে যে দিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন হারুণ-আর-রশিদ সর্বকালে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি এবং শাসকগণের অন্যতম বলে মর্যাদা লাভ করবেন।" এককথায় বিশ্ব-সভ্যতায় ইসলামের যে অবদান, তার সিংহভাগই খলিফা হারুণ-আর-রশিদের প্রাপ্য। এখানেই তাঁর কৃতিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন।

তৃতীয় অধ্যায়

আল-আমিন (মহম্মদ)

(৮০৯-৮১৩ খ্রীঃ)

সিংহাসনারোহণ ঃ যখন খলিফা হারুণ-আর-রশিদ ৮০৯ খ্রীস্টাব্দে খোরাসান অভিযানকালে তুস নগরে পরলোকগমন করেন, তখন আমিন রাজধানী বাগদাদে, মামুন মার্ভে, কাশিম কিন্নিসিরিনে এবং সম্রাজ্ঞী জুবাইদা রাক্কায় ছিলেন। ডাক বিভাগের প্রধান হামা-ওয়াই খলিফার মৃত্যু সংবাদ দ্রুত রাজধানীতে প্রেরণ করলে পরের দিন আমিনের ভ্রাতা সালেহ আমিনের কাছে রাজকীয় সিলমোহর, তরবারি ও খিলাত পাঠিয়ে দেন। পিতার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র আমিন কাসরুল খুলদ হতে কাসরুল খিলাফতে গমন করে পিতার মনোনয়নক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমীর-ওমরাহ, সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণের নিকট হতে আনুগত্য লাভ করেন। আমিনের মাতা সম্রাজ্ঞী জুবাইদা সসম্মানে রাক্কা হতে বাগদাদে গমন করেন।

আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঃ আমিনের রাজত্বকাল মাত্র চার বছর। এই চার বছরই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে কলুষিত। এই সংঘর্ষে আব্বাসীয় খেলাফতে নানা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। গৃহযুদ্ধের মূলে কতকগুলি কারণ ছিল।

গৃহযুদ্ধের কারণ—মনোনয়নে দ্বৈতভাব ঃ সম্রাজ্ঞী জুবাইদা ও তাঁর ভ্রাতা ঈসা ইবন জাফরের চাপে খলিফা হারুণ ৭৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পাঁচ বছরের পুত্র মহম্মদকে আল-আমিন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। অতঃপর সাত বছর পর ৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে পুত্র আব্দুল্লাহকে আল-মামুন (বিশ্বস্ত) উপাধি দান করে ১২ বছর বয়সে সিংহাসনের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। বয়সের দিক থেকে উভয়েই সমবয়সী ছিলেন। তবে আমিন সামান্য বড় ছিলেন মামুন অপেক্ষা। পরে খলিফা তাঁর তৃতীয় পুত্র কাসিমকেও 'মুতাসিম' উপাধি দান করে মামুনের পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন করেন। সেই সঙ্গে মামুনের হাতে একটি ক্ষমতাও দিয়ে গেলেন—অযোগ্যতার জন্য মামুন কাশিমকে অপসারণও করতে পারবেন। এইভাবে খলিফা তাঁর মনোনয়নে দ্বৈতভাব রেখে গেলেন। এই দ্বৈতভাবই পরবর্তীকালে গৃহ-যুদ্ধের সূচনার ভূমিকা গ্রহণ করে।

ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা ঃ আমাদের পূর্ব-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পারস্য-জাত বার্মেকিদের প্রভাব। এই পারস্য-প্রভাব ও আরব-প্রভাবকে একটি ভারসাম্যের মধ্যে রাখার জন্য খলিফা তাঁর সাম্রাজ্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। ঐতিহাসিক গিলমান বলেন—"বার্মেকিদের অভ্যুত্থানে পারস্য-গোষ্ঠী বিশেষ ক্ষমতা

লাভ করে। এবং তাদের পতনে আরব গোষ্ঠীর উত্থান দেখা যায়। এই দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টায় খলিফা হারুণ তাঁর জীবিতকালেই তাঁর সাম্রাজ্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে যান। (১) রাজধানী-সহ পশ্চিমাঞ্চল আল-আমিনের অধীনে। (২) মার্ভ হতে সমগ্র পূর্বাঞ্চল আল-মামুনের অধীনে। (৩) এবং মেসোপটেমিয়া ও কিন্নিসিরিন কাশিমের অধীনে দেন। এইভাবে খলিফা হারুণ ভারসাম্য রক্ষার যে চেষ্টা করে যান, পরবর্তীকালে তা ভাইয়ে-ভাইয়ের গৃহদ্বন্দ্ব ডেকে আনে।

দলিল সম্পাদিত ঃ বিজ্ঞ খলিফা তাঁর দুই পুত্র আমিন ও মামুনের চরিত্র লক্ষ্য করেই ভবিষ্যতে যাতে কোন দ্বন্দ্ব বেধে না যায়, তার প্রতিকারার্থে দুটি দলিলও সম্পাদন করে যান। ৮০২ খ্রীস্টাব্দে হজব্রত পালনকালে খলিফা, আমিন ও মামুনের দ্বারা দুটি সম্পাদিত দলিল দুই পুত্রকেই মনোনয়নের পবিত্র শর্ত পালনের জন্য বাধ্য করেন। এবং দলিল দুটিকে সুসংরক্ষণের জন্য পবিত্র কাবাগৃহে সংরক্ষিত করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে খলিফার সুসম্পাদিত দলিল তাঁর দুই পুত্রের অনিবার্য দ্বন্দ্বকে রোধ করতে সক্ষম হয়নি। তাই ঐতিহাসিক গিলমান বলেন—"বিভেদ দূরীকরণের জন্য যে পরিকল্পনা করা হল পক্ষান্তরে তা-ই ব্যাপক আকার ধারণ করল।

শিক্ষাগত পার্থক্য ঃ খলিফা হারুণ তাঁর পুত্র আমিনের চারিত্রিক দুর্বলতা বুঝতে পেরেই আমিন ও মামুন দুই ভাইকে শপথ করিয়ে একটি দলিলের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু এই শপথ ও দলিল তাঁদের গৃহযুদ্ধ থেকে দূরে রাখতে পারেনি। তার মূল কারণ স্বরূপ ছিল উভয়েরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমিন ছিলেন রাজমাতা জুবাইদার পুত্র। অন্যদিকে, মামুন ছিলেন পারস্যের ক্রীতদাসী পরমাসুন্দরী বহুগুণের অধিকারিণী মারাজিলার গর্ভজাত সন্তান। জন্মসূত্রেই আমিন ছিলেন ঔদ্ধত্য প্রকৃতির, বিলাসী, অহঙ্কারী। এবং মামুন ছিলেন বিনীত, মিতব্যয়ী ও ধীর প্রকৃতির। পিতা উভয় সন্তানেরই শিক্ষার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করেন। বাল্যকাল হতে আপন মাতা ও মাতুল ঈশা-বিন-জাফরের মতো স্বনামধন্য পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করেন। এবং মাতৃহারা মামুন বার্মেকি উজির জাফরের যত্নে লালিত-পালিত হতে থাকেন। পরিণত বয়সে উভয়েই প্রচণ্ডভাবে পড়াশোনা করলেন। কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আমিনের পড়াশুনা হল একেবারেই পুঁথিগত, এবং মামুন প্রকৃত শিক্ষালাভ করে গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হলেন। জ্ঞানপিপাসু মামুনকে তাঁর শিক্ষা করল সুরুচিমণ্ডিত, উদার ও মিতব্যয়ী। উভয়েরই শিক্ষা শেষে পিতা উভয়কেই লক্ষ্য করলেন—আমিন যেন অবাধ্য পুত্র এবং মামুন যেন ধীশক্তিসম্পন্ন ও বিচক্ষণতাপূর্ণ মানুষ। তখন খলিফা সত্যিকারেই মামুনের গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে এই মামুনই পিতার আশাকে বাস্তবে পরিণত করেন। আমিন ও মামুন উভয়ের চরিত্রে

শিক্ষাগত গুণের ও জ্ঞানের এই পার্থক্য থাকায় এটিও গৃহযুদ্ধের একটি প্রধান কারণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চারিত্রিক পার্থক্য ঃ আমিন ও মামুনের দু'জনের জন্মগত ও সহজাত প্রবৃত্তিতে দুটো জিনিস স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়েছিল। আমিন ভালবাসতেন আড়ম্বরপূর্ণ জীবন, ছিলেন অমিতব্যয়ী। অন্যদিকে মামুনের ছিল অনাড়ম্বর জীবন, নিষ্কলুষ চরিত্র। তাই মামুনের শিক্ষা-দীক্ষা মামুনের জীবনে সোনা রূপে ফলে উঠল। এবং আমিনের শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর চরিত্ররূপ মরুভূমিতে অকালে প্রাণ হারাল। ফলে মামুন হলেন দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশাসক, এবং আমিন হলেন অযোগ্য। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—খলিফা হারুণ-আর-রশিদ তাঁর জীবদ্দশাতেই ৮০২ খ্রীস্টাব্দে পবিত্র হজ্বব্রত পালন উপলক্ষে মক্কায় গমন করে উভয় পুত্রকেই একটি দলিলের মাধ্যমে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়ে মামুনকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মামুন খোরাসান প্রদেশের রাজধানী মার্ভ হতে অতি বিচক্ষণতা ও অসামান্য দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। অপরদিকে আমিন পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার হাতে নিয়ে শাসনকার্য স্বীয় হস্তে পরিচালনা না করে ভোগ-বিলাসে আত্মনিয়োগ করেন। খলিফা হারুণ তাঁর জীবদ্দশাতেই এটি লক্ষ্য করে ও পুত্রের প্রতি অন্ধ ভালবাসার হেতু খেলাফতের জন্য মনোনয়নের ব্যাপারে অন্য কিছু বিকল্প চিন্তাও করলেন না। পুত্রের প্রতি তাঁর এই অন্ধ ভালবাসা ও দুর্বলতা গৃহযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। ন্যায়বান খলিফা হারুণ পুত্র আমিনের প্রতি অন্ধ ভালবাসার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি। পিতা খলিফা হারুণ চরিত্রের এটি সর্বজনবিদিত দুর্বলতা। এই একটি মানুষের মনের দুর্বলতা ভবিষ্যতে বহু জটিলতার জন্ম দিয়ে সৃষ্টি করল গৃহযুদ্ধের।

আরব ও পারস্য দ্বন্দ্ব ঃ একদিন উমাইয়া ও আব্বাসীয় দ্বন্দ্ব যেভাবে উমাইয়া খেলাফতের ভিতকে নড়িয়ে দিয়েছিল, আজও তেমনিভাবে আরব ও পারস্য দ্বন্দ্ব হারুণ খেলাফতকে বিচলিত করে তুলল। আমিনই একমাত্র আব্বাসীয় খলিফা যার ধমনীতে অন-আরব রক্ত প্রবাহিত হয়নি। আমিনের পিতা ছিলেন হারুণ ও মাতা ছিলেন জুবাইদা, উভয়ই ছিলেন কুরাইশ বংশজাত। অপরদিকে, মামুনের মাতা ছিলেন মারজিলা নামে এক পারস্য ক্রীতদাসী। সুতরাং খলিফা হারুণের মৃত্যুর পরই আরব ও পারস্য দ্বন্দ্ব প্রকটরূপ ধারণ করল। আমিনের সমর্থক ছিলেন স্বয়ং রাজমাতা জুবাইদা, পিতৃব্য ইব্রাহিম ও উজির ফজল ইবন-রাবী এবং অন্যান্যগণ। পারস্যবাসী মামুনের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল পারস্যের খোরাসান অঞ্চল। পারস্যবাসী তাঁকে "ভগিনীর পুত্র" বলে অভিহিত ও সমর্থন করতেন। মামুনের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন পারস্যবাসী ফজল-ইবনে-সহল। এই আরব পারস্য দ্বন্দ্বই বার্মেকি পতনকে ত্বরান্বিত করে। তখন হতেই শাসকগোষ্ঠীর

মধ্যে আরব প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। খলিফা হারুণ তাঁর জীবিতকালেই অনুভব করেছিলেন এই দুই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তাঁর খেলাফতের প্রচুর ক্ষতি সাধন করবে। আরব উমাইয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার ন্যায় এ সত্যও অনুধাবন করেছিলেন যে এই দুই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই তাঁকে আপন স্বদেশে ও সাম্রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কবল থেকে মুক্ত রেখেছে। তাই সুচতুর মুয়াবিয়া আপন স্বার্থেই হিমরীয় ও মুদরীয় আরব গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে আপন স্বার্থেই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। খলিফা হারুণও যেন কিছুটা সেই পথই অনুসরণ করলেন। খলিফার মৃত্যুর পর তাঁর আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়। আমিনের খেলাফতে সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হল। হিট্টি বলেন—"এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব অবশেষে নবদীক্ষিত মুসলমানদের বিশেষ করে কৃষ্টিসম্পন্ন পারস্যবাসীদের সঙ্গে আরবীয় মুসলমানদের সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। এই বিভেদ-বিদ্বেষ একদিকে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পারস্যবাসী, আলি সমর্থক আরববাসী, ইয়েমেনবাসী এবং অপরদিকে সুন্নী সম্প্রদায়কেও জড়িত করে। খেলাফত অথবা উজির পর্যায়ে দুটি ব্যক্তি বিশেষের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা এই গৃহযুদ্ধের গুরুত্ব অধিক ছিল।"

আমিনের স্বৈরাচারিতা : খলিফা হারুণ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টনের যে শপথ দলিল সম্পাদন করেন, পরবর্তীকালে আমিন তা প্রথম লঙ্ঘন করে চরম স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেন। দলিলে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল—আমিন তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মামুনের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার বা খণ্ডন করলে তিনি সিংহাসনলাভের অধিকার হারাবেন। অপরদিকে, মামুন আমিনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করলে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী হবার যোগ্যতা হারাবেন। তিন পুত্র 'আপন আপন' শাসনাধীন প্রদেশের অর্থভাণ্ডার ও সৈন্যবাহিনী লাভ করবেন। খলিফা হারুণ ৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তুসনগরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করার পূর্বে তাঁর সঙ্গের ধনাগার ও সেনাবাহিনীকে পূর্বাঞ্চলের জন্য মামুনকে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে যান। কিন্তু আমিন খেলাফত লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পিতার শেষ ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করে খলিফার সেখানকার সেনাবাহিনী ও ধনসম্পদকে বাগদাদে ফিরিয়ে আনার জন্য হুকুমনামা জারি করে চরম স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেন। কেননা, খলিফা পূর্বাঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই ঐ সৈন্যবাহিনী ও ধনসম্পদ মামুনকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আমিন ঈর্ষাবশত পিতার আদেশ লঙ্ঘন করলেন। অধিকন্তু গুপ্তচর ও প্রলোভনের প্ররোচনা দ্বারা সৈন্যদেরও স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন। এই সমস্ত নানাবিধ অসংলগ্ন কার্যকলাপে মামুন স্বাভাবিকভাবেই ভ্রাতা আমিনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন।

দুই মন্ত্রীর সংঘাত : আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পথভ্রান্ত আমিন ও বিচক্ষণ মামুনের মধ্যে। একথা যেমন সত্য ও

সন্দেহাতীত, তেমনি এর কারণ স্বরূপ আরো দুজনের মধ্যে বেধেছিল সংঘাত। তাঁদের একজন আমিনের মন্ত্রী ফজল-ইবন-রাবি এবং অন্যজন মামুনের মন্ত্রী ফজল-ইবন-সহল। আমিন ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত এবং মামুন ছিলেন মাতার দিক থেকে পারস্য বংশোদ্ভূত। তাঁদের মন্ত্রীগণও ছিলেন ঐ রূপই। এই দুজন উজির রাজ্যের সর্বময়কর্তা স্বরূপ ছিলেন। তাঁরা আপন আপন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আপন আপন প্রভুরও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে খুবই তৎপর হয়ে ওঠেন। হারুণের রাজত্বে ফজল-ইবন-রাবি উজিরের পদ হতে বঞ্চিত হয়ে হাজিব নিযুক্ত হলে ফজল-ইবন-সহলের প্রতি তাঁর আক্রোশ ও ঈর্ষার কোন সীমা ছিল না। বেধে গিয়েছিল আরব-পারস্য দ্বন্দ্ব। বার্মেকিদের পতনের পর ফজল-ইবন-রাবি উজিরের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তুসনগরে খলিফা হারুণের মৃত্যুকালে তিনি খলিফার সঙ্গেই ছিলেন। খলিফার মৃত্যুর পর আমিন সিংহাসনে আরোহণ করলে উজির ফজল-ইবন-রাবি কিছু মানুষকে উৎকোচ ও সেনাবাহিনীকে দু'বছরের বেতন একসঙ্গে অগ্রিম পরিশোধ করে ধনাগার ও সেনাবাহিনীকে আমিনের পক্ষে আনেন। উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতাপিপাসু রাবি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন— পথভ্রান্ত, অযোগ্য, চরিত্রহীন আমিনের খেলাফতে তিনিই সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তার মর্যাদালাভ করবেন। এমনকি তিনি সিংহাসন লাভের দুরাশাও পোষণ করতেন। অন্যদিকে, মামুনের উজির ফজল-ইবন-সহল ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি, সুরুচিসম্পন্ন মানুষ। একদিকে, আমিনের চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে আরব গোষ্ঠীর প্রধান রাবি রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে, সহল পারস্যবাসীদের নেতৃত্ব দান করে মামুনের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। রাবি ক্রীতদাস হতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে জীবনে বহু উন্নতি করেন এবং সহল ছিলেন অগ্নি-উপাসক, ইসলামধর্মে দীক্ষিত হলেও পরবর্তী জীবনে পারস্যের কৃষ্টি ও জাতীয়তাবোধ হতে মুক্ত হতে পারেননি। উভয়েই বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ছিলেন। তবে নিঃসন্দেহে অভিজ্ঞ, ধীরস্থির, বিচক্ষণ, জ্ঞানদীপ্ত পারস্যবাসী সহল ক্ষমতালিপ্সু অযোগ্য, ঈর্ষাপরায়ণ ও কুচক্রী রাবি অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন।

দুই ভ্রাতাকেই অপসারণঃ মামুনের কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা, জনপ্রিয়তা ও জ্ঞানগরিমা বিলাসপ্রিয় আমিনকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। মামুনের সুশাসনে পারস্যবাসী অত্যন্ত নিরাপদে বসবাস করতে থাকেন। মামুন যেমন প্রজাবর্গের সুখ-শান্তির জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তেমনি প্রজাবর্গের অকুণ্ঠ সমর্থনও পেয়েছিলেন। প্রাচীন ও প্রখ্যাত সেনাপতি হারসামা যেমন মামুনকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন, তেমনি নবীন সৈনিক তাহির-ইবন-হুসাইনও মামুনের দলে যোগদান করেন। গরিব প্রজাবৃন্দকে রাজকর হতে মুক্তি দিয়ে মামুন সমগ্র দেশের প্রীতিভাজন হন। মামুনের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কুচক্রী

রাবি এবং আলি-বিন-ঈসা নামক জনৈক সভাসদের কু-পরামর্শে আমিন গভীর ষড়যন্ত্রমূলক পথে ভ্রাতা মামুনকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বাগদাদে ডেকে পাঠান। বিচক্ষণ মামুন পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার অজুহাতে মার্ভ ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। তখন কুচক্রী আমিন আদেশ অমান্য করার অপরাধে মামুনকে খোরাসানের শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করার ফরমান জারি করে জুম্মার মসজিদে তাঁর নামে খোতবা পাঠ নিষিদ্ধ করে দেন। সমগ্র সাম্রাজ্যের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নিমিত্ত অনাচারী আমিন ছোট ভাই কায়ুমকেও মিথ্যা অজুহাতে মেসোপটেমিয়া ও সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তার পদ হতে অপসারিত করে চরম স্বেচ্ছাচারীর পরিচয় দেন। এই ঘটনার পর সমগ্র দেশে উচ্ছৃঙ্খল আমিনের প্রতি জনগণের ধিক্কার যেন জনরোষে পরিণত হল। ফল হল বিপরীত। মানুষ দলে দলে মামুনের ভক্ত হতে আরম্ভ করল। চরিত্রহীন আমিনের এই জঘন্য কার্যকলাপ সাম্রাজ্যের গৃহযুদ্ধকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করল।

আপন পুত্রদের মনোনয়ন: আমিনের এই সীমাহীন অপরাধ ও অন্যায়ের প্রতিবাদে যখন সারা দেশজুড়ে আলোড়ন চলছে, যখন সারা দেশের আকাশে-বাতাসে গৃহযুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে, ঠিক সেই সময় অদূরদর্শী আমিন তাঁর অপর দুই ভ্রাতাকে শেষ আক্রমণ করলেন। আমিন তাঁর অপর দুই ভ্রাতাকে অপসারিত করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, ভবিষ্যতে আর কোনদিন যাতে তাঁদের বংশধরগণও আর কোন প্রকার দাবি-দাওয়া না করতে পারে তার জন্য সকলের ন্যায়সঙ্গত ভাবি অধিকারকে অগ্রাহ্য করে ৮১০ খ্রীস্টাব্দে আমিন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসাকে 'নাতিক-বিল-হক' অর্থাৎ 'সত্য বিঘোষক' উপাধিতে ভূষিত করে খেলাফতের ভাবি উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। অল্প কিছুদিন পরই ঠিক একই পথ অনুসরণ করে দ্বিতীয় পুত্রকে 'কায়িস-বিল-হক' বা 'সত্য নিষ্ঠাবান' উপাধি দান করে তৎপরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। পিতার মনোনয়নকে অবজ্ঞা, লঙ্ঘন ও তুচ্ছজ্ঞান করে আমিন এই মারাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমগ্র সাম্রাজ্যের সংকটকেই ত্বরান্বিত করেন। কুচক্রী রাবির পরামর্শে আমিন পবিত্র কাবাগৃহ হতে পিতার সংরক্ষিত প্রতিজ্ঞাপত্র দুটিকে দরবারে এনে সবার সম্মুখেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে মামুনের সমস্ত রাজকীয় ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করলেন। এমনকি এক সময় মামুনের পুত্র দুটিকেও বধ করার পরামর্শ করা হল। এই সমস্তর জন্য অনিবার্য কারণেই আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল।

গৃহযুদ্ধ—সেনাপতি ঈসা ও সেনাপতি তাহির: ৮১২ খ্রীস্টাব্দে আমিনের সঙ্গে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মামুনের সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষের মূলে ছিল আমিনের আগ্রাসী মনোভাব। ষড়যন্ত্রের আভাস পেলে বিচক্ষণ মামুন তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে কড়া প্রহরী মোতায়েন করেন। এবং এই অঞ্চলের যাতায়াতের

ওপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখেন। খলিফা আমিন প্রথম সেনাপতি আলি-বিন-ঈসার নেতৃত্বে ৫০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী রায়ের দিকে চালনা করেন। মামুনের সুযোগ্য সেনাপতি তাহির-বিন-হুসাইন একটি বিশাল বাহিনী দ্বারা আমিনের সেনাপতির গতি রোধ করলে সেনাপতি আলি-বিন-ঈসা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে আমিনের সেনাপতি ঈসা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলে খলিফা আমিন এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই সেনাপতি আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। মামুনের সেনাপতি তাহির আমিনের উভয় বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হামাদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে খলিফার আব্দুর রহমান-বিন-জাবালা ও কাতিব-ইবন-কাদিয়ার নেতৃত্বে দুটি বাহিনীকেই একেবারেই বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর বীর সেনাপতি তাহির কায়উইন দখল করে হুলওয়ান অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে প্রধান সেনাপতি হারসামা মার্ভ হতে বিশাল পারস্য বাহিনী নিয়ে হুলওয়ানে ঘাঁটি স্থাপন করে সেনাপতি তাহিরকে আহওয়াজ ও মুসার দিকে প্রেরণ করেন। মামুন কর্তৃক বাগদাদ অবরোধ অবশ্যম্ভাবী দেখে আমিনের সেনাপতি হুসাইন বাগদাদ দখল করেন। কিন্তু আমিনের চোখে পারস্য জয় সুদূর পরাহত ও স্বপ্নে পরিণত হল। যার ফলে ৮১২ খ্রীস্টাব্দে মামুন আমীর-উল-মুমেমিন উপাধি ধারণ করে সমগ্র পারস্যে নিজ প্রভুত্বকে কায়েম করেন। খলিফা আমিনের পারস্য জয়ের বাসনাই শুধু অস্তমিত হল না, আপন রাজধানী বাগদাদও বিপদ সংকেতে ভরে উঠল।

বাগদাদ অবরোধঃ মামুনের সুদক্ষ সেনাপতিগণ ধীরে ধীরে সমগ্র পূর্বাঞ্চল ও আরব ভূখণ্ড দখল করে রাজধানী বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ইতিমধ্যে সেনাপতি তাহির তাইগ্রীস নদীর পূর্বাঞ্চল দখল করে আহওয়াজ নামক স্থানে প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে যথাক্রমে ইয়ামামা, বাহরাইন, ওমান এবং ওয়াসিত অধিকার করেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কুফার শাসনকর্তা হাদির পুত্র আব্বাস, বসরার শাসনকর্তা মাহদির পুত্র মনসুর এবং মক্কা ও মদিনার শাসনকর্তা ঈসার পুত্র দাউদ বিনা বাক্যে মামুনের বশ্যতা স্বীকার করে আপন আপন পদমর্যাদা রক্ষা করেন। ইত্যবসরে সেনাপতি তাহির মাদাইন দখল করে আমিনের রাজধানী বাগদাদ অবরোধ করেন। পরে আনবার ফটকেও ঘাঁটি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে প্রধান সেনাপতি হারসামা সমগ্র উত্তরাঞ্চল অধিকার করে এবং সেনাপতি জুহাইর অন্যান্য স্থানগুলি দখল করে উভয়েই সম্মিলিত ভাবে সগৌরবে খলিফা আমিনের রাজধানী ও রাজপ্রাসাদটুকুও অধিকারে অভিপ্রায়ে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হন। তাঁরা দুজনেই সেনাপতি তাহিরেরর শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাহির, হারসামা ও জুহাইর তিনদিক হতে বাগদাদকে সম্পূর্ণভাবে অবরোধ করলে এক বছর অবরোধকালে তদানীন্তন পৃথিবীর সুরম্য নগরীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। খলিফা আমিন প্রজাবৃন্দকে

কোনরূপ আশ্রয় দিতে না পারায় নগরবাসীগণ অপদার্থ ও অযোগ্য খলিফা আমিনকে ত্যাগ করে মামুনের পক্ষ অবলম্বন করেন। আমিন এতই চরিত্রহীন ছিলেন, যখন রাজধানী বাগদাদ সম্পূর্ণ রূপে অবরুদ্ধ, তখন আমিন সেই অবরোধ-কালেও হেরেমের সুন্দরী মহলে পরমাসুন্দরী নর্তকীদের নিয়ে নৃত্যে ও সঙ্গীতে বিভোর। সমগ্র দেশ যখন বিপন্ন, রাজধানী যখন হস্তচ্যুত-প্রায়, তখনও খলিফা আমিনের এক চোখে সুন্দরী ও অন্য চোখে সুরা। আসলে রাজধানী অবরুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই খলিফা নিজেই আপন ষড়রিপুর দ্বারা অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আমিনের জীবননাশ ঃ অবস্থা যখন অত্যন্ত মারাত্মক রূপ ধারণ করল, তখন খলিফা আমিনের সম্বিত ফিরে এল। ভীত-শঙ্কিত খলিফা রাজমাতা জুবাইদা ও অন্যান্য পরিবার, পারিষদবর্গসহ প্রাণভয়ে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে মদিনা-আল-মনসুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতক হুসাইন-বিন-আলি বাগদাদের জনসাধারণকে প্ররোচিত করে খলিফাকে নজরবন্দী করে ক্ষমতা গ্রাসের চেষ্টায় ব্যর্থ হলে খলিফা তাঁকে ক্ষমা করে তাহিরের বিরুদ্ধে হুলওয়ানে প্রেরণ করেন। পরে দলত্যাগ করার জন্য তিনি ধৃত ও নিহত হন। খলিফার মন্ত্রী ফজল-বিন-রাবিও বিশ্বাসঘাতকতায় কিছু কম ছিলেন না। তিনি খলিফার চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে হুসাইনের ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগান। অতঃপর রাজধানী বাগদাদ সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হলে মন্ত্রী ফজল-বিন-রাবি নীরবে আত্মগোপন করে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেন। তখন খলিফার নিকট মাত্র দুটি পথই খোলা ছিল—একটি আত্মসমর্পণ, অন্যটি সিরিয়ায় পলায়ন। খলিফা শেষেরটি বেছে নিলে সেনাপতি তাহির তাঁকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন। খলিফা তাহিরের পরিবর্তে প্রধান সেনাপতি হারসামার নিকট আত্মসমপর্ণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে তাহির শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়ে একটি শর্ত আরোপ করলেন—হারসামার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধা নেই, তবে বাগদাদ ত্যাগের পূর্বে খলিফাকে সিলমোহর ও রাজকীয় খেলাত বা পোশাক তাহিরের নিকটই অর্পণ করতে হবে। কিন্তু খলিফা আমিন এই চুক্তিভঙ্গ করে রাত্রির অন্ধকারে গোপনে তাহিরের অগোচরে হারসামার নিকট আত্মসমর্পণ করতে রওনা হলে পথিমধ্যে তাহিরের সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে প্রাণের দায়ে তাইগ্রীস নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তবুও প্রাণরক্ষা হল না, তবে আত্মসমর্পণের গ্লানিও ভোগ করতে হল না। রাতের অন্ধকারে হতভাগ্য খলিফাকে ৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একদল উগ্রপন্থী নৃশংসভাবেই হত্যা করে গৃহযুদ্ধের চির অবসান ঘটান। কিন্তু ভ্রাতা মামুন ভ্রাতৃহত্যার এই দুঃসংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত ও শোকাভিভূত হয়ে হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দেন। হতভাগিনী রাজমাতা জুবাইদাকে সসম্মানে রাজদরবারেই স্থান দিতে মামুন ভুল করেননি। এইটাই ছিল

মামুন চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমিন চার বছর আট মাস ভোগবিলাসের চরম সীমায় উপনীত হয়ে রাজশক্তির চরম অপব্যবহার করে মাত্র ২৮ বছর বয়সে এক কঠিন পরিস্থিতিতে মর্মান্তিকভাবেই নিহত হন। নীরবে ঘোষিত হল গৃহযুদ্ধের চির অবসান।

গৃহযুদ্ধের ফলাফল: খলিফা আমিনের সাথে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মামুনের গৃহযুদ্ধকে আরব ও পারস্যের জাতীয় সংঘর্ষ বলে অভিহিত করা হয়েছে। উমাইয়া খেলাফতের সময় হতেই ব্যবধান ছিল—উমাইয়া ও হাশেমীদের মধ্যে, আরব মুসলমান ও অন-আরব মুসলমানদের মধ্যে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে এই সুযোগ-সুবিধাভোগকারী আরব মুসলমানদের প্রতি অন-আরব মুসলমান পারস্যবাসীদের বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। আবার ধর্মীয় দিক থেকে দেখলে একে সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে একটা মারাত্মক সংঘাত বলে মনে করা হয়। মোদ্দা কথা হল—খোরাসান ছিল আবু মুসলিমের কর্মক্ষেত্র ও আব্বাসীয়দের প্রধান প্রচারভূমি। এই খোরাসান হতেই আব্বাসীয়গণ প্রথম উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে আরবদের ওপর পারস্যের আধিপত্য বিস্তার করেন। পরে খলিফা আমিন ও মামুনের গৃহযুদ্ধের ফলে আরবদের ওপর পারস্যের প্রভাব সম্পূর্ণ ভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ইমামুদ্দীন বলেন—"উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে পারস্যবাসীগণ আরবদের ওপর আংশিক বিজয়লাভ করে কিন্তু পরে আমিনের ওপর মামুনের প্রভুত্ব বিস্তার আরবদের ওপর পারস্যবাসীদের বিজয়কে সম্পূর্ণ করে।

মামুনের সফলতার কারণ—মামুনের চরিত্র: আমিনের বিফলতার কারণ যেমন তাঁরই কলঙ্কময় চরিত্র, ঠিক তেমনি মামুনের সফলতার কারণও তাঁর গুণময় চরিত্র। আমিনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমিন—অলস, অকর্মণ্য, দুরাত্মা, কৃতঘ্ন ও লালসাগ্রস্ত। অন্যদিকে, মামুন ছিলেন জ্ঞানী, চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্মভীরু, সৎ ও ধৈর্যশীল। আমিন যেমন সুরা ও সঙ্গীতে আকণ্ঠ মগ্ন থেকে দেশব্যাপী কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, মামুন তেমনি জ্ঞানচর্চায় মগ্ন থেকে দেশব্যাপী শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। রাজ্যকে কেন্দ্র করে আমিনের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রমোদ-বিহার, নৃত্য, মৃগয়া প্রভৃতি, কিন্তু মামুনের প্রিয় বস্তু ছিল জ্ঞানচর্চা। আমিনের অনৈসলামিক কার্যকলাপের জন্য তাঁর আপন গোষ্ঠী সুন্নী জামাত তাঁর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন, অন্যদিকে মামুনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য আপন গোষ্ঠী শিয়া সম্প্রদায়ের চরম শ্রদ্ধাভাজন হন। এইভাবে দেখা যায় মামুনের চরিত্র-বলই মামুনের সফলতার গোপন রহস্য ছিল। আমিনের বিশাল সাম্রাজ্য-বল, সেনা-বল, সম্পদ-বল সকল কিছুই মামুনের একমাত্র চরিত্র-বলের নিকট পরাজিত হল। তাই বলা হয়, মানুষের চরিত্র-বলই আসল বল। চরিত্রের হানি সর্বস্বহানি।

আমিনের মন্ত্রীর অযোগ্যতা: মামুন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আমিন অপেক্ষা

যোগ্য, কর্মঠ ও সুশাসক ছিলেন। একথা পিতা খলিফা হারুণ-আর-রশিদও জানতেন। তাই তিনি আমিনকে মামুনের সাথে প্রতিজ্ঞা চুক্তিতে আবদ্ধ করে যান। কিন্তু কাগজের এই চুক্তিপত্রও মানব-চরিত্র আমিনের চরিত্রের কোন পরিবর্তন আনতে না পারায় পিতার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। আমিন নিজে ছিলেন অপদার্থ, তাই সর্বদা শাসনকার্যে নির্ভর করতেন মন্ত্রী ফজল-ইবন-রাবির ওপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মন্ত্রী ফজল-ইবন-রাবিও ছিলেন স্বার্থান্বেষী, অযোগ্য। তাই সমগ্র রাজ্যজুড়ে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা, কুশাসন। অপরদিকে, মামুন যেমন ছিলেন যোগ্য ব্যক্তি, তাঁর মন্ত্রী ফজল-ইবন-সহলও ছিলেন তেমনি বিচক্ষণ ব্যক্তি। ফলে উভয়ের সহযোগিতায় রাজ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি ভরে উঠল। অন্যদিকে, আমিনের শাসন-কার্যে অবহেলা, উজির রাবির ওপর নির্ভরশীলতা, সবের ওপর উজিরের অপদার্থতা বিলাসপ্রিয় আমিনের অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করে মামুনের সফলতাকে সহজ করে তোলে।

আমিনের বিশ্বাসঘাতক ও অনভিজ্ঞ সেনাপতি : বিশাল আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ প্রকারান্তরে দুর্বল হয়েই পড়ল, যখন সমগ্র সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শক্তির মূল উৎসভূমি ছিল—পারস্য। সেই পারস্য, খোরাসান ও মার্ভ অঞ্চল পড়ল মামুনের ভাগে। সুতরাং মামুন নিজে যেমন ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী, তাঁর সেনাবাহিনীও ছিল সুদক্ষ। কিন্তু আমিন নিজে যেমন অকর্মণ্য ছিলেন, তাঁর সেনা আলি-ইবন-ঈসাও তেমনি ছিলেন অদক্ষ। সেনা অদক্ষ হলেও চলে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হলে তা হয় বড়ই মারাত্মক। আমিন এই মারাত্মক আঘাত হতে নিস্কৃতি পাননি। তাই একদিন মামুনের বীরত্বপূর্ণ অভিযানে আমিনের রাজধানী বাগদাদ অবরুদ্ধ এবং অধিকৃত হল। আমিনের বিশ্বাসঘাতক ও অনভিজ্ঞ সেনাপতি আত্মগোপন করল। মামুনের সেনাপতি তাহির-বিন-হুসাইন, হারসামা ও জুহাইরের রণকুশলতা ইতিহাস কোন-দিনই ভুলে যাবে না।

রায়ের নিকট আমিনের সেনাপতি আলি-ইবন-ঈসা মামুনের সেনাপতি তাহিরেব নিকট পবাজিত ও নিহত হলে তাঁর পুত্র হুসাইন খলিফার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র-মূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে সিরিয়া বাহিনীকে খলিফার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে বাগদাদ অভিযান করে খলিফা আমিন ও রাজমাতা জুবাইদাকে বন্দী করেন। পরবর্তীকালে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়। এক কথায় আমিনের কর্মচারী ও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতাই আমিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে। অধিকন্তু স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালিপ্সু মন্ত্রী ফজল-ইবন-রাবিও পতনের পূর্বমুহূর্তে গোপনে পলায়ন করে আত্মগোপন করেন। তাই সকল দিক থেকেই খলিফা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলেন।

খলিফার অমিতব্যয়িতা : চরম অমিতব্যয়িতার ফলে খলিফার রাজকোষ

শূন্য হতে থাকে। সঙ্গীতপ্রিয় আমিন আবু নুওয়াসের কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করায় তার পিতৃব্য বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ ইব্রাহিম-ইবন-আল-মাহদিকে ৩ লক্ষ দীনার উপহার দেন। এইভাবে বহু নর্তকী ও গায়িকাকে দিনে দিনে প্রচুর উপহার ও উপঢৌকন দিতে থাকেন। এই অধ্যায়ে খলিফা আমিনের সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ইয়েজিদ (৭২০-২৪ খ্রীঃ), যাঁকে মদ্যপ ও লালসাগ্রস্ত, অমিতব্যয়ী উমাইয়া সন্তান এবং অধার্মিক স্বৈরাচারী শাসক উপাধি দেওয়া হয়। যিনি তাঁর প্রিয়তমা প্রণয়িনী গায়িকা হাব্বাবার মৃত্যু শোকে বিহ্বল হয়ে সপ্তম দিনে মারা যান। নৌ-বিহারের জন্য তিনি জন্তুর আকৃতিতে পাঁচটি বজরা তৈরির করেন, প্রতিটির নির্মাণ খরচ হয় ৩০ লক্ষ দিরহাম। এই সমস্ত অমিতব্যায়িতা আমিনের রাজত্বে একদিন অভিশাপ রূপে দেখা দিয়ে পতনকে করল ত্বরান্বিত। আমিনের এই অমিতব্যয়িতা মামুনের সফলতার সোনার চাবি রূপে দেখা দিল।

পারস্যবাসীদের সমর্থনঃ খলিফা আমিন ছিলেন রাজমাতা জুবাইদার সন্তান। এবং মামুন ছিলেন পারস্য-তনয়া পরমাসুন্দরী ক্রীতদাসী মারাজিলার সন্তান। পারস্যবাসীগণ অতি স্নেহভরে মামুনকে ভগ্নীর সন্তান ভাগ্নে বলে ডাকতেন। মামুনের প্রতি ছিল তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন। এই সমর্থনকে মামুন তাঁর আপন চরিত্র-বল দ্বারা বহু গুণে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি—পারস্যের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত আব্বাসীয় খেলাফত কোনদিনই ইতিহাসে স্থান লাভ করতো কি না তা কে জানে। সেই পারস্য-বাসীদের সক্রিয় ও অকৃত্রিম সাহায্য মামুনের জন্য হল সফলতার প্রথম সোপান ও কৃতকার্যতার মহাসৌধ। অপরদিকে, আমিন তাঁর আপন চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য হারালেন আরববাসীদের অকুণ্ঠ সমর্থন। আমিনের অযোগ্যতা, অসাধুতা, অমিতব্যয়িতা ও অশালীন আচরণ আরব দুনিয়াকে কম আঘাত করেনি। সেই আঘাতেরই প্রতিঘাত আমিনের পরাজয়। আমিন তাঁদেরকে এমনি আঘাত হেনেছিলেন যে পরবর্তীকালে স্বর্ণ ও রৌপ্যপত্র গলিয়ে তাঁদের মধ্যে বিতরণ করেও তাঁদেরকে আর জয় করতে সক্ষম হননি। আমিনের চরিত্রের পদস্খলন যা হারাল, আমিনের রাজত্বের সোনা রূপাও আর তা কোনদিনই ফিরিয়ে আনতে পারল না। তাই আমিনের প্রতি আরববাসীদের অসমর্থন ও মামুনের প্রতি পারস্যবাসীদের সমর্থন একজনের জন্য পরাজয় ও অন্যজনের জন্য জয়ের মাল্য বহন করে আনল। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব যেন আরব ও পারস্য দ্বন্দ্বে পরিণত হল।

আমিনের চরিত্রঃ খলিফা হারুণ-আর-রশিদ ও রাজমাতা জুবাইদার অতীব স্নেহের সন্তান। পিতা-মাতা অতি স্নেহভরে পুত্রের নাম রেখেছিলেন মহম্মদ। ঐ নামকে অনুসরণ করে যে নামের খ্যাতি বিশ্ব-জোড়া, যে নামোচ্চারণে আজও বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান নিজেদের ধন্য মনে করেন, সেই পূতপবিত্র নাম

মহম্মদ (দঃ)। সমগ্র আরব একদিন যাঁর চরিত্র মাধুর্যে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে আল-আমিন বা চিরবিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন। খলিফা হারুণও আপন পুত্রকে ঐ একই উপাধিতে ভূষিত করলেন। পুত্র সম্পর্কে খলিফার কতই না উচ্চাশা হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল। তাই তিনি পুত্রের সুশিক্ষারও সুবন্দোবস্ত করেন। কিন্তু অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয় পুত্র শিক্ষিত হল, তবে শিক্ষা যেন তাঁর জীবনে কোন বাস্তব প্রয়োগের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারল না। তাই পুত্র আমিনের শিক্ষা হল একেবারেই পুঁথিগত বিদ্যা, প্রাণহীন বিদ্যা।

তাই আমিন উচ্চশিক্ষা লাভ করেও হলেন বিলাসপ্রিয়, দায়িত্বহীন। পিতার মৃত্যুর পর খলিফার মহান দায়িত্ব ভার পেয়েও দায়িত্বহীনতারই পরিচয় দিলেন। কখনও মদ্যপান, কখনও জুয়াখেলা তাঁকে গ্রাস করল। তাইগ্রীস নদীতে পরমা-সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকীদের নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য আমিনের পাঁচটি জন্তুর আকৃতি বিশিষ্ট পাঁচটি সুসজ্জিত বজরা ছিল। কখনও সিংহ বজরা, কখনও হস্তী, কখনও বা সর্প, ঈগল ও কখনও বা অশ্বাকৃতি বজরাতে পরিভ্রমণ করতেন। সঙ্গে থাকত অসংখ্য সুন্দরী ও সুরা, কখনও শতাধিক গায়িকা সঙ্গীত পরিবেশন করত খলিফার মনোরঞ্জনের জন্য, কখনও শতাধিক নর্তকীর নাচ খলিফাকে নৃত্যে বিনোদন করত। এই সমস্ত নৃত ও গীত খলিফার আপন ব্যক্তিগত পরিচালনায় অনেক সময় সমগ্র রজনীকে অতিক্রম করত। কখনও কখনও খলিফা ঐ সমস্ত গায়িকা ও নর্তকীদের সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে রাজদরবারের অনেককেই বিচলিত করে তুলতেন। আমিন চরিত্রের এহেন অধঃপতন সকলের নিকট না হলেও অনেকেরই নিকট অকল্পনীয় ছিল। নামে মহম্মদ কাজে মাতাল, নামে আমিন কাজে কমীন, এই ছিল আমিন চরিত্র। তিনিই সর্বপ্রথম মহিলা পরিচালক নিযুক্ত করেন হারেমে, যাদের পরতে হত পুরুষের পোশাক। আমিনের প্রধান কাজ ছিল সারা সাম্রাজ্য হতে অতীব সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকী সংগ্রহ করে রাজদরবারকে গায়িকা ও নর্তকী দরবারে পরিণত করা। এবং তিনি তাঁর অধিকাংশ সময়ই ব্যয় করতেন এই অধ্যায়ে। এমনকি বাগদাদ যখন অবরুদ্ধ-প্রায়, তখনও খলিফা আমিন গায়িকা ও নর্তকীদের ঘোরে মত্তপ্রায়। যে কোন রাজ-চরিত্রের এহেন অধঃপতন বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। তাই আমিন-চরিত্রও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারল না। তাঁর জীবনাবসান অত্যন্ত বেদনাদায়ক, মর্মান্তিক ও করুণ।

চতুর্থ অধ্যায়

আল-মামুন

(৮১৩—৮৩৩ খ্রীঃ)

জন্ম ঃ ৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে হারূণ-আর-রশিদ ভ্রাতা হাদির মৃত্যুর পর বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই দিনটি খলিফা হারূণের জন্য যেমন বড়ই স্মরণীয়, তেমনি ইসলামের ইতিহাসেও দিনটি কম বরণীয় নয়। এই দিনই খলিফা হারূণ তাঁর জগদ্বিখ্যাত পুত্র আল-মামুনকে লাভ করেন। পরবর্তী-কালে খলিফা মামুন ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেন। তাই এই দিনটি ইসলামের ইতিহাসেও স্মরণীয়। মামুনের প্রকৃত নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ' কুনিয়াত বা ডাকনাম ছিল—'আবু জাফর', পরে উপাধি লাভ—'আল-মামুন।' পারস্য দেশীয় ক্রীতদাসী মাতা মারাজিলার গর্ভে মামুন জন্মগ্রহণ করেন। মারাজিলা যদিও কোন রাজকুমারী বা রাজমাতা ছিলেন না, তবুও জগদ্বিখ্যাত সন্তান মামুনের মাতা। ধন্য মায়ের কোল, ধন্য মায়ের গর্ভ, যে মা মামুনের মতো সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। মা মারাজিলা ক্রীতদাসী হলেও ছিলেন পরম ধার্মিকা ও পরমাসুন্দরী নারী। তাই ছেলের ওপর বর্তিয়েছিল মায়ের-চরিত্রের প্রভাব।

মামুনের খেলাফতের প্রথম ছ' বছর ও পরবর্তী ১৪ বছর (৮১৩-১৯, ৮১৯-৩৩ খ্রীঃ) ঃ ৮১৩ খ্রীস্টাব্দে অপ্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা রূপে সমাদৃত হলেও তিনি তাঁর পূর্বস্থান মার্ভ ত্যাগ করলেন না, এমনকি পূর্ব পেশা জ্ঞানচর্চাও পরিত্যাগ করে নিছক প্রশাসনে যোগদান করলেন না। এইভাবে খলিফা তাঁর খেলাফতের প্রথম ছ' বছর মার্ভে অবস্থান করে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় বিভোর থাকলেন। জ্ঞানপিপাসু খলিফা তিনি তাঁর জ্ঞানচর্চার জন্যই বাগদাদের শাসনভার ন্যস্ত করলেন মন্ত্রী ফজল-ইবন-সহলের ওপর। কিন্তু এই জ্ঞানচর্চার মাশুলও খলিফাকে দিতে হল। শাসনদণ্ডে স্বয়ং খলিফার অনুপস্থিতিতে সারা রাজ্যে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। খলিফা মামুন ইতিহাসে নজিরবিহীন খলিফা বা সম্রাট। সকল কালের, সকল দেশের রাজা-বাদশাদের ইতিহাসে সাধারণত এইটাই দেখা যায়—তাঁদের কেউবা হারেমের সুন্দরী ক্রীতদাসীদের নিয়ে মগ্ন, কেউবা আপন খেয়ালখুশিতে বিভোর, যখন তাঁদের মন্ত্রীবর্গ আপন আপন খুশিমতো রাজ্য পরিচালনা করেন। যার সাধারণ পরিণতি দেখা যায় সারা রাজ্যে

উচ্ছৃংখলতা, কিন্তু মামুন-চরিত্র এর পূর্ণ ব্যতিক্রম, তিনি কোন ভোগে মগ্ন ছিলেন না, কোন নেশায় উন্মত্ত ছিলেন না। সম্রাট হয়েও সাম্রাজ্যের মোহ ত্যাগ করে খলিফা মামুন জ্ঞানচর্চায় মগ্ন ছিলেন। তাই বিশ্ব-সম্রাটদের ইতিহাসে জ্ঞান-পিপাসু মামুন নজিরবিহীন সম্রাট। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, খলিফা মামুন বাগদাদের শাসনভার মন্ত্রী ফজলের হাতে ন্যস্ত না করলে রাজ্যে অরাজকতা দেখা দিত না। কথাটা সত্য। তাই আমীর আলি বলেন—"খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে মামুন যদি তাঁর শাসনভার মন্ত্রী ফজল-ইবন-সহলের হস্তে ন্যস্ত না করে মার্ভ হতে বাগদাদে চলে আসতেন, তাহলে পরবর্তী কয়েক বছরের অরাজকতা সংঘটিত হতে পারত না। কিন্তু একটা কথা থেকে যায়, জ্ঞানপিপাসু মামুন যদি তাঁর জ্ঞানপিপাসাকে চরিতার্থ না করে বাগদাদে আগমন করে স্বহস্তে শাসনদণ্ড হাতে নিতেন, তাহলে হয়তো অরাজকতার সৃষ্টি নাও হতে পারত। তাহলে ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের স্বর্ণযুগের আদৌ কোন সৃষ্ট হত কি না তা কে জানে। কেননা স্বর্ণযুগের যে পটভূমি খলিফা মামুন কর্তৃক রচিত হল তার বীজ কিন্তু রোপিত হয়েছিল মামুন-চরিত্রে ঐ প্রথম ছ' বছরের জ্ঞান-আহরণের সময়। বহু খলিফা, বহু সম্রাট শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে প্রবল প্রতাপশালী শাসকের ভূমিকা অলঙ্কৃত করে গেছেন, কিন্তু স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করতে পারেননি। সেখানে খলিফা মামুন ছ' বছর রাজদণ্ড হাতে না নিয়ে, রাজমোহ ত্যাগ করে, রাজভোগ পরিত্যাগ করে, রাজশক্তি বর্জন করে সত্য ও সুন্দরের পথে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে, জ্ঞানের পীলসুজ মাথায় করে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করে গেলেন। পরবর্তী চোদ্দ বছর (৮১৯-৩৩ খ্রীঃ) খলিফা মামুন স্বহস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করে তাঁর জীবনের উভয় দিককে পূর্ণ করে একজন সফল ও সার্থক নরপতির পরিচয় রেখে গেছেন।

মন্ত্রী ফজলের শাসনকার্য পরিচালনা (৮১৩-১৯ খ্রীঃ): একদিন আমিন ও মামুনের গৃহযুদ্ধের সময় মন্ত্রী ফজল চরম বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেও আজ সময়ের ব্যবধানে নতুন পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে মন্ত্রী মহোদয়ও তাঁর পূর্ব চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেন না। লোভ ও প্রলোভন তাঁকে উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু করে তোলে। আমিন ও আমিন-বাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হলে মন্ত্রী মহোদয় মামুনকে বাগদাদে আগমন করে স্বহস্তে রাজ্যসভার গ্রহণ করার পরিবর্তে মার্ভে অবস্থান করে জ্ঞানচর্চায় বেশি অনুপ্রাণিত করেন। মন্ত্রী মহোদয়ের কাজটি ভাল হলেও উদ্দেশ্যটি বেশ ভাল ছিল না। মহানবী বলেন—"কার্যাবলী উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।" তাই মন্ত্রী ফজলের উদ্দেশ্য ভাল না থাকায় পরবর্তীকালের কার্যাবলীও ভাল হয়নি। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য সিরিয়ার বিশৃংখলতা, ইরাকের অরাজকতা ও অন্যান্য অঞ্চলের অবনতির কথা মন্ত্রী ফজল খলিফা মামুনের কোনদিনই কর্ণগোচর করলেন না। অপরদিকে, জ্ঞানপিপাসু

খলিফা মামুন উজিরের ওপর শাসনকার্য ন্যস্ত করে দেশ বিখ্যাত জ্ঞানী ও গুণীদের সাথে, স্বনামধন্য মনীষীদের সাথে সাথে বিশ্ব জ্ঞান-ভাণ্ডারের বিভিন্ন দিক নিয়ে দিবা-রাত্রি বিভোর থাকলেন।

রাজ্যের বিদ্রোহ ও অরাজকতা ঃ

মেসোপটেমিয়ার বিদ্রোহ ঃ মেসোপটেমিয়ার নসর-ইবন-সাবাস নামক এক ব্যক্তি আমিনের নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রচারণা আরম্ভ করেন। অন্যদিকে, আমিনের মৃত্যু ও রাজমাতা জুবাইদাকে মসুলে নির্বাসনকে কেন্দ্র করে বাগদাদবাসীগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তখন তাহির-বিন-হুসাইন সাময়িকভাবে তাদের অর্থ দ্বারা বশীভূত করেন। কিন্তু নসর নাছোড়বান্দা, তিনি বিক্ষুব্ধ আরবদের নেতৃত্ব দান করে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের সাহায্যে আলেপ্পা ও সুমাইসাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করেন। সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার নবনিযুক্ত শাসনকর্তা তাহির দিনের পর দিন এই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে নসর অবলীলাক্রমে পাঁচ বছর পর্যন্ত এশিয়া মাইনরের এই অঞ্চল আপন দখলে রাখতে সক্ষম হন। তখন মন্ত্রী ফজল তাহিরের স্থলে আপন ভ্রাতা হাসান-বিন-সহলকে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে হাসান ৮১৮ খ্রীস্টাব্দে নসরকে যুদ্ধে পরাজিত করে খলিফার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

আলি বংশের সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত আব্বাসীয় বংশ কোনদিনই রাজক্ষমতার অধিকারী হত কি না তা গভীর সন্দেহেরই কথা ছিল। তখন আলি বংশকে সরাসরি রাজশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রলোভনে আব্দুল আব্বাসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তা পালন তো হয়ইনি, বরং প্রতারণা করাই হয়েছে। এ কথা আলি বংশ কোনদিনই ভুলতে পারেনি। অথচ আলি বংশের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত আবুল আব্বাসের পক্ষে জনগণের পূর্ণ ও ব্যাপক সাহায্য এবং সমর্থন পাওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু আবুল আব্বাস ও তাঁর বংশধরগণ রাজশক্তি হাতে পেয়ে পূর্বের দেওয়া সমস্ত কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। রাজ-চরিত্র অবিশ্বাস্য, এমনি বৈচিত্র্যময়। এবং শক্তি হাতে পেয়ে ঐ শক্তিধরদের নির্মম নির্দেশে ও অন্যায় আদেশে আলি বংশের অনেকেরই প্রাণনাশ ঘটল। রাজ আদেশ এমনি অনিবার্য। আলি বংশের এই আগুন তাঁদের অন্তরে ধিকে ধিকে জ্বলছিল, যখনই সুযোগ পেয়েছিল দাবানলের রূপ ধারণ করেছিল।

এই সুবাদে আলি বংশ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করেন। পারস্য প্রভাবে বিক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবু সারাইয়া নামক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আলি সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে কুফা অধিকার করেন। বাগদাদ হতে প্রেরিত হাসান-বিন-সহলের বাহিনীকে আবু সারাইয়া বারংবার পরাজিত করে বসরা ও মেসোপটেমিয়ার কিয়দংশ দখল করেন। সারাইয়া আলি বংশোদ্ভূত মহম্মদ-ইবন-ইব্রাহিম-ইবন-তাবাতাবাকে অধিকৃত অঞ্চলের শাসকরূপে

প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুধু ইবনে তাবাতাবাকে রাজশক্তিতে প্রতিষ্ঠিতই করলেন না, বরং তার আনুষঙ্গিক সকল কাজও সমাধা করলেন। শাসকের নামাংকিত মুদ্রা তৈরি করা ও আরবের সর্বত্র দূত প্রেরণ করা ইত্যাদি কার্যাবলীও সমাধা করলেন। সারাইয়ার প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে উজির ফজল-ইবন-সহল বিখ্যাত সেনাপতি হারসামাকে ৮১৫ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ দমনে পাঠান, সারাইয়া পরাজিত হয়ে ৮০০ জন অনুচর-সহ পলায়নের চেষ্টা করলে ধৃত ও নিহত হন। সারাইয়ার মৃত্যুতে মেসোপটেমিয়ায় পুনরায় বিদ্রোহের দাবানল নির্বাপিত হয়ে শান্তি ও শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল।

আরবে অরাজকতা: আবু সারাইয়ার বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে সমগ্র হিজাজে ইমাম জাফর-আস-সাদিকের একজন পুত্রকে খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলে পারস্য সীমান্ত হতে ইয়েমেন পর্যন্ত বিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। মক্কায় মহম্মদ-ইবন-সাদিক, ইয়েমেনে ইব্রাহিম, কুফায় ইবনে তাবাতাবার বিদ্রোহ আব্বাসীয়দের প্রতি আলি সম্প্রদায়ের বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ মনে করা হল। মন্ত্রী ফজলের সহিত হারসামার সদ্ভাব না থাকলেও এহেন ভয়ংকর রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করার জন্য ফজল সেনাপতি হারসামাকে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্মত হয়ে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হলেন। বীরশ্রেষ্ঠ হারসামার হস্তক্ষেপে আরব ভূখণ্ডে পুনরায় শান্তি ও শৃংখলা ফিরে এল। তখন মন্ত্রী ফজল হারসামাকে আরব ও সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

হারসামার প্রাণনাশ: মন্ত্রী ফজল কোন সাধু মন নিয়ে বা কোন সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে বীরশ্রেষ্ঠ হারসামাকে আরব ও সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেননি। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বীর হারসামাকে কোন প্রকারে শহর বাগদাদ হতে দূরে সরিয়ে রাখা। মন্ত্রী ফজলের সমস্ত শক্তিকে কুক্ষিগত করার একটা গোপন অভিপ্রায় ছিল, বীর হারসামার মনে কিন্তু সেরূপ কিছুই ছিল না। তিনি তাঁর জীবনে সব সময় বীরের ধর্মকে পালন করাটাই জীবনের মূল লক্ষ্য মনে করেছিলেন। তাই পদলোভ লালসা ও পদের মোহ তাকে কোনদিনই পরাস্ত করতে পারেনি। তিনি দেহ হতে মনেপ্রাণে ছিলেন একজন মহাবীর। তাই আরব ও সিরিয়ার শাসনভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বেই বিশ্বস্ত কর্মচারী ও সুদক্ষ যোদ্ধা হারসামা ভেবেছিলেন একবার মার্ভে গমন করে খলিফা মামুনকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করা প্রয়োজন। তাই বীর হারসামা আরব ও সিরিয়ার রাজমুকুট মাথায় না নিয়ে মার্ভে গমন করেন। হারসামার মার্ভে গমন যেন মন্ত্রী ফজলের রাত্রির ঘুম কেড়ে নিল। সন্দেহপ্রবণ মন্ত্রী, ঈর্ষাপরায়ণ মন্ত্রী ফজলের সন্দেহপ্রবণতা ও ঈর্ষাপরায়ণতা এতদূর বেড়ে গেলে তিনি যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। এদিকে, বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে হারসামা খলিফার নিকট সমগ্র রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা জানালেন। তাঁকে সম্যকভাবেই অবহিত করলেন

মন্ত্রী ফজলের স্বৈরাচারী কুশাসনে সাম্রাজ্য অতি দ্রুতই ধ্বংসের পথে চলেছে। খলিফা পূর্বাঞ্চলে অবস্থান করায় পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদ বিশেষ কিছু রাখতেন না। অধিকন্তু তাঁর সময় অধিকাংশই ব্যয় হত জ্ঞানচর্চায়। সেনাপতি হারসামা খলিফা মামুনকে বোঝাতে সক্ষম হলেন তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন না করলে একদিন অতি কষ্টে পাওয়া পশ্চিমাঞ্চলকে অবহেলায় হারাবেন। জ্ঞানী খলিফা বিচক্ষণ বীরশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সেনাপতি হারসামার কথা মর্মে মর্মে অনুধাবন করলেন। এই সংবাদ দ্রুত বাগদাদের তদানীন্তন ভাইসরয় বা মন্ত্রী ফজলের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই ফজল হারসামার প্রতি রাগে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। চতুর মন্ত্রী ফজল হারসামা মার্ভের দিকে রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পশ্চাতে কয়েকজন গুপ্তচর প্রেরণ করে সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করেন। অতঃপর হারসামাকে গোপন পথে আততায়ী কর্তৃক হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। খলিফার সহিত সাক্ষাতের পর বীর হারসামা আপন গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় একাকী অসহায় অবস্থায় মন্ত্রী ফজল কর্তৃক কয়েকজন আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ৮১৬ খ্রীস্টাব্দে হারসামার অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে খলিফা মামুন হারালেন তাঁর দক্ষিণ হস্তকে, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে, বিপদের দিনের বন্ধুকে; আব্বাসীয় সাম্রাজ্য হারাল তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর সেনাপতিকে।

হারসামার মৃত্যুতে বাগদাদে বিদ্রোহ: বীর সেনা হারসামার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ বাগদাদে পৌঁছান মাত্র বাগদাদবাসী বিক্ষুব্ধ এবং দিগ্ভ্রান্ত হয়ে রাজধানীতে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করেন। মন্ত্রী ফজল মনে করেছিলেন হারসামার জীবনাবসান তাঁর জীবনকে বাধা ও বিপত্তি মুক্ত করবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। বরং বিপরীতই ঘটেছিল। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী ফজলের আপন ভ্রাতা ইরাকের শাসনকর্তা হাসান-বিন-সহল বাগদাদ হতে মাদাইনে গোপনে পলায়ন করতে বাধ্য হন। পরে ওয়াসিতে গমন করে তথায় বসবাস করতে থাকেন। বাগদাদের বিদ্রোহীগণ হাসানকে পদচ্যুত করে মনসুর-বিন-মাহদিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি মামুন স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। অবশ্য এক বছর পর হাসান নানা কলা-কৌশলে বিদ্রোহীদের ক্ষান্ত করে শাসনভার পুনর্দখল করেন।

ইমাম আলি-আর-রাজির মনোনয়ন: খলিফা মামুন হারসামার মুখে সমস্ত কিছু অবগত হওয়ার পর চিন্তা করছিলেন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। হঠাৎ হারসামার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়াকে আরো ত্বরান্বিত করল। ধর্মপ্রাণ খলিফা বহুদিন হতেই মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর বংশধরদের হাতে খেলাফত প্রত্যর্পণে উদ্গ্রীব ছিলেন। খলিফা তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা মতো মদিনা হতে মুসা-আল-কাজিমের পুত্র তৃতীয় আলিকে মার্ভে ডেকে পাঠান। এবং ৮১৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে আর-রাজি (গ্রহণযোগ্য) উপাধিতে ভূষিত

করে খলিফা তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনয়ন করেন। আর-রাজি বয়সে মামুন অপেক্ষা বেশ বড়ই ছিলেন। তবুও খলিফা তাঁকে এতই আপন করেছিলেন যে ঐ বয়সের একটি মানুষের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দেন। (যেমন ইসলামের চতুর্থ খলিফা স্বয়ং আলি (কঃ) বয়সে কন্যার পিতৃস্থানীয় এমন ব্যক্তি হজরত উমর (রাঃ)-এর সহিত আপন কন্যা কুলসুমের বিবাহ দিয়েছিলেন।) এবং খলিফা মামুন আর-রাজিকে বাগদাদে অধিষ্ঠিত করে আব্বাসীয় প্রতীক কালো বর্ণের পরিবর্তে রসুলে করীমের সবুজ বর্ণের পতাকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। আর-রাজি ছিলেন শিয়া। যার জন্য সুন্নী আব্বাসীয়দের মনে প্রকট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বাগদাদ পুনরায় উত্তাল হয়ে উঠল। বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ শুরু হল। বাগদাদবাসী মামুনের কার্যকলাপে ক্ষুন্ন ও রুষ্ট হয়েই মামুনের পরিবর্তে তাঁর পিতৃব্য ইব্রাহিম-বিন-মাহদিকে খলিফা হিসাবে গ্রহণ করলেন। আব্বাসীয়গণ রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল। চুরি-ডাকাতি-রাহজানি-অগ্নি সংযোগ প্রভৃতি সারা দেশের সাধারণ নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলল। ইরাক ও হেজাজেও মামুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল।

মামুনের বাগদাদ গমন ঃ

ফজলের এবং রাজির মৃত্যু ঃ হজরত আলি বংশীয় ইমাম আর-রাজিকে খলিফা মনোনীত করায় যে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সূচনা হয় তা খলিফা মামুনকে অবগত করাবার জন্যই আর-রাজি স্বয়ং মার্ভে গমন করে। তখন খলিফা মামুন মন্ত্রী ফজলের কুশাসন ও বাগদাদের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা অবগত হয়ে ৮১৮ খ্রীস্টাব্দে আর-রাজি-সহ রাজধানী বাগদাদ অভিমুখে রওনা হলেন। বাগদাদে পেঁাছাবার পূর্বেই মন্ত্রী ফজল-ইবন-সহল গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। অনেকেই বলেন যে আততায়ীর দ্বারা ফজল একদিন সেনাপতি হারসামার প্রাণনাশ করেন, সেই একই আততায়ীর হস্তে মন্ত্রী ফজল আজ নিজেই প্রাণ দিলেন। ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর সুন্দর বিচার পরিহাস। খলিফা মামুন ও আর-রাজির যাত্রাপথে তুস নামক স্থানে খলিফা হারুণ-আর-রশিদের সমাধি স্তম্ভের নিকট আর-রাজি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে আকস্মিক প্রাণ-ত্যাগ করেন। কোন কোন শিয়ার মতে, আর-রাজিকে বিষাক্ত ডালিম বা আঙুরের রস পান করিয়ে হত্যা করা হয়। কিন্তু সকল ঐতিহাসিকই হত্যার এই ষড়যন্ত্রকে একেবারেই কাল্পনিক বলে অস্বীকার করেন। যে স্থানে আর-রাজি প্রাণত্যাগ করেন, সেই স্থানে তাঁর সমাধির ওপর একটি অপূর্ব সৌধ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে এই সৌধকে কেন্দ্র করেই খোরাসানে মাশহাদ (শাহাদাতের স্থান) নামে একটি অপূর্ব সুন্দর শহর গড়ে ওঠে। অদ্যাবধি এটি সমগ্র শিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান রূপে সমাদৃত।

ইব্রাহিমের আত্মসমর্পণ ঃ মামুন বাগদাদের পথে নাহরাওয়ান নামক স্থানে কিছুদিন অবস্থান করেন। তখন বাগদাদ ও রাক্কা হতে আগত তাহির ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। ৮১৯ খ্রীস্টাব্দে খলিফা মামুনের বাগদাদে প্রবেশ বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, তিনি অতঃপর স্বয়ং শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আগমনে ইব্রাহিম বিন মাহদি প্রাণভয়ে পলায়ন করলেও পথিমধ্যে ধৃত হয়ে খলিফার সম্মুখে হাজির করা হলে খলিফা তাঁকে প্রাণভিক্ষা দিয়ে ক্ষমা করেন। খলিফা অনুরূপভাবে সকল বিদ্রোহীদের ক্ষমা প্রদর্শন করে অতি শীঘ্রই বাগদাদ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

মামুনের পূর্ণ খেলাফত গ্রহণ (৮১৯-৮৩৩ খ্রীঃ) ঃ

স্বর্ণযুগের সূচনা ঃ ৮১৯ খ্রীস্টাব্দে খলিফা মামুন স্বহস্তে পূর্ণ খেলাফত গ্রহণ করে ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মামুনকে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হয়। বিদ্রোহের সময় সুরম্য বাগদাদ নগরীর বহু ক্ষতি সাধিত হয়। খলিফা মামুন তার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করে বাগদাদকে পুনরায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের একটি অতুলনীয় ও সমৃদ্ধশালী শহরে পরিণত করেন। রাজধানী পুনরায় জ্ঞানচর্চা ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পের প্রাণকেন্দ্র রূপে সমাদৃত হল। রাজ্য শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করে খলিফা আল-মামুন মক্কা ও মদিনার শাসনভার হজরত আলির জনৈক বংশধরের ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি তাঁর দুই ভ্রাতাকে কুফা ও বসরার শাসনকর্তাও নিযুক্ত করেন। তাহির-বিন-হুসাইনকে খোরাসান ও তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে মিশর ও সিরিয়ার শাসনভার দান করেন। দু' বছর পর তাহিরের মৃত্যুতে তাঁর অপর পুত্র তালহাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইভাবে খলিফা অভিজ্ঞ, সৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদগুলি পূর্ণ করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করেন। উমাইয়া খেলাফতের দ্বিতীয় ওমরের ন্যায় খলিফা মামুন ছিলেন অতীব স্বচ্ছ চরিত্রের মানুষ। দ্বিতীয় ওমর রাজকার্য পরিচালনার জন্য কোনদিনই কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে মূল্য দিতেন না। তিনি সকল গোষ্ঠী হতেই যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করতেন। মামুনও ছিলেন সেই প্রকৃতির মানুষ।

বিদ্রোহ দমন ঃ

নসরের বিদ্রোহ দমন ঃ ৮২২ খ্রীস্টাব্দে নসর উকায়লি মেসোপটেমিয়ায় বিদ্রোহ করলে আব্দুল্লাহ বিন তাহির তাঁকে পরাজিত করে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। নসর খলিফার নিকট প্রাণভিক্ষা করলে খলিফা দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে ক্ষমা করলেন। ৮১৫ হতে ৮২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আমিনের সমর্থক কায়সাইট ও মামুনের সমর্থক কালবাইট গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে।

আব্দুল্লাহ নসরকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করে এই দুই গোত্রের কলহ দমনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এই গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে স্পেন হতে প্রথম হাকাম কর্তৃক বিতাড়িত কর্ডোভাবাসীগণ আলেকজান্দ্রিয়া দখল করলে আব্দুল্লাহ মিশরে অভিযান করে কর্ডোভাবাসীদের আলেকজান্দ্রিয়া হতে বিতাড়িত করলে তাঁরা ৮২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে ক্রীট দখল করেন।

ইয়েমেন ও খোরাসানে বিদ্রোহ, বাবেকের বিদ্রোহ, খলিফাকে হত্যার চক্রান্তঃ খলিফা মামুনের রাজত্বকালে ইযেমেন ও খোরাসানে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিলে মামুন ইব্রাহিম নামক জনৈক বিদ্রোহীকে অতি কঠোর হস্তে দমন করে দক্ষিণ আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলেও খারেজিগণ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে অত্যন্ত তৎপর হয়ে সমগ্র খোরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে তালহার মৃত্যু হলে খলিফা আব্দুল্লাহ-বিন-তাহিরকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং আব্দুল্লাহ অতি কঠোর হস্তে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন করতে সক্ষম হন। মামুনের খেলাফতকালে মাজেদ্রান, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহী নেতা বাবেক খুররামীর নেতৃত্বে সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হয়। বাবেক মাজেদ্রানেব মাজিযান গোত্রের অধিবাসী ছিল। সে (৮৩০ খ্রীঃ) দুর্গম গিরিসংকটে তার দুর্গ স্থাপন করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করত। তার দুর্গম স্থানে অবস্থানের জন্য খলিফা কয়েকবার তাকে দমন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বিদ্রোহী বাবেক খলিফার মতিগতি ও পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে রোমান সম্রাট থিউফিলাসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অবিরাম মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করতে থাকেন। খলিফাও পরিস্থিতির গুরুত্ব যথাযথ ভাবেই উপলব্ধি করে আব্দুল্লাহ-বিন-তাহিরকে বাবেক ও রোমানদের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য নির্দেশ দেন। মুসলিম আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে না রুখতে পেরে রোমান সম্রাট থিউফিলাস অবশেষে নিজ রাজ্য রক্ষার্থে বাবেকের সঙ্গে ভবিষ্যতে কোন সম্পর্ক ও সহযোগিতা না রাখার অঙ্গীকারপত্রে সই করে সেনাপতি আব্দুল্লাহর সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। বাবেকও দুর্গম স্থানে আত্মগোপন করে প্রাণরক্ষা করেন। বাবেক ইসলাম, ইহুদি ও খ্রীস্টান কোন ধর্মেই বিশ্বাস করত না। কিন্তু পুনর্জন্মে ছিল তার বিশ্বাস। বাবেকের উপাধি ছিল—'খুররামিয়া' অথবা লালসাগ্রস্ত। কারণ সে অবৈধ বিবাহযোগে বহু সুন্দরী নারীর সতীত্বকে হরণ করে। তাই তাকে পাপিষ্ঠ বাবেকও বলা হয়। বাবেক ও রোমানদের সম্মিলিত বাহিনী ও প্রচেষ্টাকে পযুদস্ত করা খলিফা মামুনের খেলাফতের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিমধ্যে ৮২৩ খ্রীস্টাব্দে খলিফারও প্রাণনাশের একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র প্রকাশ হলে ষড়যন্ত্রকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়।

রাজ্য বিস্তার ঃ

সিসিলি ও ক্রীট দখল ঃ রাজ্য বিস্তারে খলিফা মামুন উমাইয়া খেলাফতের দ্বিতীয় উমরের নীতিকেই অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় উমর পররাজ্যকে আক্রমণ ও অধিকার করাকে শুধু অন্যায়ই বলতেন না, বলতেন মহাপাপ ও কুকুরের ক্ষুধা। তাঁর নীতি ছিল—শান্তিতে বসবাস করা ও শান্তি-সহ রাজ্য পরিচালনা করা, এবং অন্যান্য সকলকেই শান্তিতে বসবাস করতে দেওয়া। তাই তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর আয়তন কোনদিন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন অনুভব করেননি এবং সেনাবাহিনীর সংকোচন করে সাধারণ প্রজাবৃন্দের উন্নতির কথা চিন্তা করেছিলেন। বিচক্ষণ খলিফা মামুনেরও নীতি তাই ছিল। তবে হঠাৎ কেউ বিদ্রোহ করে আক্রমণ করলে অনেক সময় তাঁর মোকাবিলা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও সাম্রাজ্যের সীমারেখা বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলি খলিফার অনিচ্ছাকৃত ঘটনা ছিল। এই নীতির প্রবর্তক ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় সৎ-খলিফা ওমর (রাঃ), যাঁকে ইসলাম-জগতের বিশেষ শক্তিধর খলিফা বলে অভিহিত করা হয়। তিনি কোনদিনই তাঁর শক্তির অপব্যবহার করে কোথাও প্রথম আক্রমণ করেননি। খলিফা মামুনও সেই পথই অনুসরণ করলেন। তাই সম্প্রসারণ নীতির পরিবর্তে তিনি শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় চরম খ্যাতি অর্জন করেন। শুধু বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাঁর সময়ে মুসলিম বাহিনী কতিপয় অঞ্চল অধিকার করেন। এই সূত্রেই ৮২৩ খ্রীস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা আগলাবিদ ও শাসনকর্তা জিয়াদতুল্লাহ তাঁদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করেন। ৮২৫ খ্রীস্টাব্দে মিশরের শাসনকর্তা একটি সংঘর্ষে ক্রীটবাসীদের পরাজিত করে ক্রীট দ্বীপ অধিকার করেন। এতদ্ব্যতীত মুসলিম আধিপত্য কাবুলেও সম্প্রসারিত হয় এবং কাবুলের রাজা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। খলিফা মামুনের খেলাফতে তাহির-বিন-হুসাইন খোরাসানে খারেজি বিদ্রোহ দমন করে সমগ্র পারস্য অঞ্চলে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে ৮২১ খ্রীস্টাব্দে পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে খলিফার, প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করে মার্ভ হতে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

বুরানের সঙ্গে মামুনের বিবাহ ঃ খলিফা মামুনের খেলাফতে কতকগুলি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ছিল মন্ত্রী হাসান-বিন-সহলের পরমাসুন্দরী কন্যা ১৮ বছরের বুরানের সাথে ৪০ বছর বয়স্ক মামুনের বিবাহ। ৮২৫ খ্রীস্টাব্দে খলিফার গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের এটা ছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা। উজির সহলের ওয়াসিতের বাসভবনে এই ঐতিহাসিক রাজকীয় বিবাহ এইরূপ আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, যা তৎকালীন সমাজে নজিরবিহীন ছিল। অধ্যাপক হিট্টি বলেন—'এই বিবাহে এত অত্যধিক অর্থ ব্যয় করা হয়, যা সমগ্র আরব সাহিত্যে সেই যুগের একটি অবিস্মরণীয় ব্যয়বহুল ঘটনা।" মণিমুক্তাখচিত আসনে উপবিষ্ট বর-বধূর মস্তকে সাসানী ট্রে হতে

হাজার হাজার বিভিন্ন ধরনের মণিমুক্তা বর্ষণ করা হয়। শত শত প্রদীপ রাত্রিকে দিনে পরিণত করে। এই বিবাহে বরযাত্রীগণ দীর্ঘ ১৭ দিন মহাসমারোহে কন্যা পক্ষের গৃহে অবস্থান করেন। হতভাগ্য আমিনের মা রাজমাতা জুবাইদা ও রাজপরিবারের অন্যান্য মহীষীগণও এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনুরূপ রূপমাধুরী ও পোশাক-পরিচ্ছদের পরিপাট্য বহু কবি ও সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করেছিল। অপূর্ব রূপ-লাবণ্যময়ী বধূ সকলের সেরা সুন্দরী বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। উৎসব প্রাঙ্গণে বধূর দাদিমা একটি স্বর্ণের বারকোষ হতে এক সহস্র মুক্তার দানা বিভিন্ন আলোকসজ্জাতে বর ও কনের মাথাতে বর্ষণ করেন। অতঃপর সেগুলিকে নিয়ে মালা তৈরি করে তা নবপরিণীতার কণ্ঠে শোভিত করা হয়। এক মণ অম্বর দ্বারা প্রস্তুত একটি বাতি স্বর্ণের শামাদানে প্রজ্বলিত করে বাসরগৃহ আলোকিত করা হয়। ১৭ দিনের উৎসবসভা শেষে বরযাত্রীগণ যখন বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন উজির তাঁদের খেলাত বা মূল্যবান পোশাক দান করেন, এবং তাঁদের ওপরও মৃগ-নাভির গোলা বর্ষণ করা হয়। আবার প্রতিটি গোলার ভেতর একটি করে উপঢৌকনে নাম লিখিত ছিল। ঐ লেখা অনুযায়ী কেউবা জায়গীর, কেউবা ক্রীতদাসী, কেউবা ক্রীতদাস, কেউবা অন্যান্য সম্পদ বা সম্পত্তি লাভ করলেন। এই বিবাহে উজিরের সে যুগের ৫ কোটি দিরহাম ব্যয় হয়। পরে খলিফা এই রাজকীয় বিবাহের ব্যয় নির্বাহেব জন্য হাসানকে ফারেস ও আহওয়াজের এক বছরের রাজস্ব প্রদান করেন।

বুরান যে কেবল তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের জন্য অনন্যসাধারণ ছিলেন তা নয়, তিনি বিবিধ গুণে গুণান্বিতা ছিলেন। যার জন্য পরবর্তীকালে বুরান তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ স্বামীর ওপরও বহু রাজকার্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি বদান্যতার জন্যও বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে-ছিলেন। তবে দুঃখের বিষয়, এই রাজকীয় বিবাহ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। কেননা, ৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ৯ আগস্ট খলিফা মামুন পরলোকগমন করলে পরমাসুন্দরী বুরান মাত্র ৮ বছর স্বামীর সংসার করার পর ২৬ বছর বয়সে বিধবা হন। বুরান কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরও পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জীবিত থেকে সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগ হতে তার উত্থান-পতনের বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছিলেন। বুরানের বিবাহ পূর্ব-জীবন ১৮ বছর, বিবাহিত জীবন মাত্র ৮ বছর ও পরবর্তী বৈধব্য-জীবন ৫০ বছর, অর্থাৎ তিনি ৭৬ বছর জীবিত ছিলেন।

মামুনের মনোনয়ন দান ও মৃত্যু : মামুন বারবার গ্রীক আক্রমণকে স্থায়ী-ভাবে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সীমান্তে তারসাসের ৭০ মাইল উত্তরে টারানা নামক স্থানে একটি সুবিশাল সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। এই ঘাঁটির প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করে পুত্র আব্বাসকে এর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে তারসাসে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। শরতের এক গরম দিনে ভ্রাতা আবু-ইসহাকের

সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে বাদানদন নামক একটি নির্ঝরিনীর পাশে উভয়েই ওর শীতল জলে পদসিক্ত করলেন। সেখানে উভয় ভ্রাতা প্রাণভরে সদ্য আনা টাটকা খেজুর খেলেন এবং বরফ-শীতল পানি পান করে তৃপ্ত হলেন। পরে রাত্রে তাঁরা উভয়েই জ্বরে আক্রান্ত হলেন। মামুন এই জ্বর হতে আর উঠলেন না। খলিফা মামুন তাঁর অবস্থা সংকটজনক বুঝতে পেরে ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনয়নে মনস্থির করলেন! তিনি মৃত্যুর পূর্বে ভ্রাতা কাশিম ও পুত্র আব্বাসকে খেলাফত হতে বঞ্চিত করে আপন অপর এক যোগ্য ভ্রাতা ইসহাক মহম্মদকে 'মুতাসিম বিল্লাহ' উপাধি দান করে খেলাফতের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। অতঃপর তিনি ৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ৯ আগস্ট তারসাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। প্রথম ছ' বছর খোরাসানের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করার পর ৮১৯-৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খলিফার পদ অলংকৃত করেন।

মামুনের চরিত্র : খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন দীর্ঘ সুঠামদেহী ও সুশ্রী এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁকে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। বাল্যকালে মামুন ব্যাকরণ বিশারদ খলিল বসরীর নিকট ভাষাতত্ত্ব, ইমাম মালিকের নিকট হাদিস, এবং বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের নিকট আরবী ও পারস্য সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মামুন শিশুকালে মাতা পারস্যবাসী মারাজিলার প্রভাব ও মাতার মৃত্যুর পর বার্মেকি উজির জাফরের প্রভাবে বিদ্যোৎসাহী হয়ে ওঠেন, তাই তাঁর চরিত্রে পারস্য প্রভাব মূর্ত হয়ে ওঠে। মামুন বাল্যকালেই পবিত্র কোরআন কণ্ঠস্থ করে হাফেজ উপাধি লাভ করেন এবং কোরআনের ব্যাখ্যা তফসির শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। পিতা খলিফা হারুণ-আর-রশিদ পুত্রের রাজোচিত গুণাবলী, উদার মনোভাব, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত, কর্মস্পৃহা, বিচক্ষণতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তান হলেও তিনি তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করে জ্ঞানীর পরিচয় দিয়ে যান।

খলিফা মামুনের স্বভাব ছিল শান্ত ও সংযত। পিতার ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ, মহানুভবতা, বিদ্যোৎসাহিতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদারতার জন্য তিনি জনসমাজে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ধর্মে কোন গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। তবে নিজে ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও ধর্মভীরু। তিনি প্রতি রমজান মাসে কোরআন শরীফ তেত্রিশ বার খতম করতেন। বিশাল কোরআন শরীফ এক মাসে এতবার খতম করা আজও মুসলিম সমাজে অতীব দুর্লভ। তাই মামুনের গুণাগুণের কথা বলতে গিয়ে বহু ঐতিহাসিক বলেন—"প্রগাঢ় প্রজ্ঞা, দৃঢ় সংকল্প, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা, নির্ভীকতা, বদান্যতা প্রভৃতি রাজোচিত গুণাবলীর জন্য তিনি আব্বাসীয় বংশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক স্মরণীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ

আছে। আব্বাসীয় বংশের মধ্যে তাঁর অপেক্ষা অধিকতর কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই খেলাফত লাভ করেননি।”

মামুনের রাজত্বকালের রাজকীয় ঘটনাবলী নেহাত গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যবিহীন। কেননা তাঁর মানসিকতা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানভিত্তিক। তিনি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ যতটা চেয়েছিলেন তা অপেক্ষা চেয়েছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ। তাই তাঁর রাজত্বকালে দুটি বিষয় ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। প্রথমটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি। দ্বিতীয়টি, মামুন কর্তৃক মুতাজিলা মতবাদ সমর্থন। এই উভয় বিষয়ে মামুনের সক্রিয় ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

উদার মনোভাবের জন্য বিচক্ষণ মামুন প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। যদিও শেষাবধি সেই উদারতার মাপকাঠি ঠিক রাখতে পারেননি। খলিফা তাঁর দরবারে রাজ্যের কূটনীতিকদের দ্বারা আলোচনায় রাজ্যের সম্প্রসারণ করা নীতির পরিবর্তে তিনি তাঁর দরবারে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন মতের স্বনামধন্য পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ ও আহ্বান জানিয়ে দিবারাত্রি আলোচনায় মগ্ন থাকতে ভালবাসতেন। মামুন ছিলেন এমনি রুচিবান পুরুষ যে, পররাজ্য, প্রতিবেশী রাজ্যকে অধিকার করার পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডারকে জয় করতে, খলিফা ছিলেন এমনি জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী। গ্রীক দর্শনের প্রভাবে এই যুগে মানব-মনে যে প্রভাবের সঞ্চার হয়েছিল, খলিফা মামুন অতি খোলামনে ঐ দর্শনজাত মানবসভ্যতার বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছিলেন। যে অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা সহকারে খলিফা মামুন সকল পণ্ডিতের সকল রকম আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন, এবং তাঁদের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধি করতেন, তা হতে একটি জিনিস অতি সহজেই বোঝা যায়—খলিফার বিদ্যাবত্তা ও মনের প্রসারতা। আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তথা মানুষের সম্পর্ক এবং স্রষ্টার প্রকৃতি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই সকল আলোচনান্তে ধীরে ধীরে খলিফা মামুনের ভেতরে এক যুগান্তকারী সুদূরপ্রসারী আলোড়ন দেখা দিল। তাঁর জ্ঞানপিপাসু, অনুসন্ধিৎসু মন যেন কোথাও খুঁজে পেল। তিনি চিরাচরিত ইসলামধর্মের গতানুগতিক মতবাদের কোথাও মৃদু, কোথাও বা তীব্র বিরোধিতা করে মুতাজিলা মতবাদে দীক্ষিত হলেন। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষ নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজকর্ম করতে পারে। এটি পূর্ব হতে নির্ধারিত নয়। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তা হতে পৃথকও নয়। কোরআন সৃষ্ট বস্তু, অনাদি নয়।

মামুন চরিত্রের সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা এবং পরিতাপের বিষয় হল ইসলামের যে অন্তর্নিহিত সহনশীলতা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা একদিন চিন্তার মুক্তির আন্দোলনকারী মুতাজিলা মতবাদের জন্ম দিয়েছিল এবং ইসলামের

যে সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার বলে মামুন উক্ত মতবাদকে বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, বড়ই পরিতাপের বিষয়—জীবন সায়াহ্নে মামুন চিন্তার-মুক্তির যে পথকে নিজে পছন্দ করেছিলেন, ইসলামের সেই চিন্তার মুক্তিকে, চিন্তার স্বাধীনতাকেও হরণ করলেন। উদারতার পথকে, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার পথকে নিজেই অবরোধ করে দাঁড়ালেন। এ যেন একটি মানুষ একটি ছাগলকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে বাড়িতে এনে নিজেই বধ করে খেয়ে ফেলল। মামুনের জীবনে এই দৃষ্টান্তের প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, পরিশেষে মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সমর্থক মামুন স্বীয় মতবাদ প্রচারে ও প্রসারে বড়ই অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শনের পরিচয় দিলেন। কোথাও সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে জোরপূর্বক আপন পরিষদের ওপর, কোথাও জনসাধারণের ওপর, কোথাও উলেমা ও কাজীদের ওপর এই মতবাদ ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এমনকি তিনি যখন সীমান্তে যুদ্ধরত ছিলেন, তখন বাগদাদের শাসনকর্তার ওপর এই মর্মে ফরমানও পাঠান যে, তিনি যেন প্রধান পন্ডিতগণকে মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাঁদের উত্তরগুলিকে খলিফার অবগতির জন্য পাঠিয়ে দেন। জানা যায়, বাগদাদের অধিকাংশ পন্ডিতগণ ও কাজীগণ আপন আপন বিশ্বাসবলেই হোক অথবা ভয়েই হোক, অথবা কোন জাগতিক সুবিধার খাতিরেই হোক খলিফার মতে মতপ্রকাশ করে আপাতত বিপন্মুক্ত হলেন। কিন্তু কোনও কোনও দৃঢ়চেতা পন্ডিত আপন আপন মতবাদে অটুট থাকলেন, সরকারি ফরমান মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তাদের উত্তর ছিল কোন জাগতিক ভয়ে বা প্রলোভনে তারা তাদের আখেরাত (পরকাল) সম্পর্কে মতবাদকে কিছুতেই পরিবর্তন করবেন না। এই দলে ছিলেন জগদ্বিখ্যাত ইমাম আহমদ-ইবন-হাম্বল। মামুনের খেলাফতে জগদ্বিখ্যাত এই মনীষার সনাতন ধর্মের প্রতি ত্যাগ স্বীকার ও সকল সরকারী নির্যাতনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবলীলাক্রমে স্বীয় মতে অবিচলিত থাকা সে যুগের ইতিহাসের এক অবর্ণনীয় লোমহর্ষক চমকপ্রদ ঘটনা।

খলিফা মামুন চরিত্রের উপসংহারে আমরা দুটো কথাই বলতে পারি। পৃথিবীর শক্তিধর সম্রাটগণ তাঁদের শক্তির মোহে ও মাদকতায় অনেক সময় অনেক ক্ষুদে সম্রাটদের শুধু পদদলিত করে লাঞ্ছনা করেই রেহাই দেননি ; প্রথমে তাঁদের সম্পদ নিয়েছেন, পরে মান-সম্মানটুকুও ছিনিয়ে নিয়েছেন। পরিশেষে নির্মমভাবে প্রাণটুকুও শেষ করেছেন। খলিফা মামুন কখনও এই চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। তবে তিনি সম্রাটও ছিলেন, তাঁর শক্তিও ছিল, আবার শক্তির মোহ ও মাদকতাও জুটেছিল। তাই পরিশেষে এই শক্তির মোহে ও মাদকতায় বহু রাজাকে ভূলুণ্ঠিত না করে নিজে জ্ঞানী ও গুণী হয়ে বহু জ্ঞানী ও গুণীদের ভূলুণ্ঠিত করলেন। সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার সাথে চিন্তার মুক্তির পথের প্রথম রাজকীয় প্রহরীও অগ্রদূত হয়েও পরিশেষে আপন অজ্ঞাতে সেই পথকেই অবরোধ করে দাঁড়ালেন। ঐ দুটো কথা এক

কথায়—মামুন শক্তির মাদকতাটাকে রাজাদের ওপর না চাপিয়ে পণ্ডিতদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন আপন অজ্ঞাতে।

মামুনের চরিত্রের বিশ্লেষণঃ অতি প্রাচীন ও প্রবাদবাক্য ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করে না, নিজে নিজেই পুনরাবৃত্তি করে। আব্বাসীয় যুগের অতীব বিচক্ষণ খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের চরিত্রে ও জীবনে ইতিহাসের এই সত্যকে লক্ষ্য করা যায়। উমাইয়া যুগও (৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ) এ হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেনি। উমাইয়া যুগের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরাই ওয়াকিবহাল আছেন, তাঁরাই জানেন খলিফা আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রীঃ) ও তাঁর সুযোগ্য সন্তান খলিফা আল-ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রীঃ)-এর সময় ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ অপর পক্ষকে দমন ও শাসন করার জন্য অতি নির্মমভাবে দেড় লক্ষ প্রাণকে নির্মূল করেন। তাঁর এই নৃশংস ও বর্বরতার জন্য 'আরবদের নিরো' (Nero of the Arabs) অর্থাৎ নিষ্ঠুরতাব দেবতা বলে কুখ্যাতি অর্জন করেন। নিষ্ঠুরতাব কাহিনী ও নির্মমতার ইতিহাস এইখানেই শেষ হল না। প্রথম ওয়ালিদের পর খলিফা রূপে এলেন সুলাইমান (৭১৫-১৭ খ্রীঃ)। তিনি হাজ্জাজের এই নিষ্ঠুরতাকে অত্যন্ত ক্রোধভরেই গ্রহণ করেছিলেন। হাজ্জাজ সুলাইমানের রাজ্যলাভেব পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে ইতিহাসের বহু তিক্ত ঘটনার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেন। হাজ্জাজের প্রতি ক্ষোভবশত খলিফা সুলাইমান মাত্রাতিরিক্ত ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণকরায় অনেক অমূল্য জীবন অকালে প্রাণ হারাল। যেমন—সিন্ধুবিজয়ী বীর মহম্মদ-বিন-কাসিম, এশিয়াবিজয়ী বীর কুতাইবা, স্পেনবিজয়ী বীর মুসা ও তারিক। একদিন যে বীর সন্তানদের বীরত্বে এশিয়া, ইউরোপ ওআফ্রিকায় ইসলামের পতাকা উড্ডীযমান হয়েছিল, আজ তাঁরাই অতি করুণভাবেই প্রাণ হারালেন। সুলাইমানের মাত্রাতিরিক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের মূলে পাই হাজ্জাজের চরম নিষ্ঠুরতা। সুতরাং হাজ্জাজের ইতিহাস ও উত্তর খলিফা সুলাইমানে পুনরাবৃত্ত হল।

ঠিক অনুরূপভাবে আব্বাসীয় খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন মুতাজিলা সম্প্রদায়ে প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্ত ও ভক্ত হয়ে সে যুগের যুগমানব মহাপণ্ডিত ইমাম আহমদ-ইবন-হাম্বলকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে যে হৃদয়হীনতার, যে নিষ্ঠুরতার ও নির্মমতার পরিচয় দেন, তার পুনরাবৃত্তি ঘটে পরবর্তী খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের খেলাফতে ৮৪৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তিই একদিন সুবিশাল আব্বাসীয় খেলাফতকে ধরার বুক হতে মুছে ফেলল। আব্বাসীয় শেষ খলিফা আল-মুসতাসিম (১২৪২-৫৮ খ্রীঃ) শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি অকথ্য অত্যাচাব চালালেন, তা তাঁরই শিয়া উজির আর সহ্য করতে না পেরে গোপনে তাতারের মঙ্গল নেতা হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আব্বাসীয় খেলাফতের শেষ চিহ্নটুকুও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। এইভাবেই একদিন স্পেনের

অতীব অত্যাচারী রাজা রডারিক সিউটা দ্বীপের ক্ষুদ্র রাজা কাউণ্ট জুলিয়াসের পরমাসুন্দরী বিবাহযোগ্যা কন্যা ফ্লোরিণ্ডার শ্লীলতাহানি করলে পিতা জুলিয়ান ক্ষোভে ও ক্রোধে অন্ধ হয়ে মুসলিম সেনাপতি মুসাকে স্পেন বিজয়ের আমন্ত্রণ জানান। স্পেন সম্পূর্ণভাবে বিজিত হল ৭১২-১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। প্রতিটি স্থানেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেল।

আল-মামুনের কৃতিত্ব ঃ

স্বর্ণযুগের স্রষ্টা মামুন ঃ তৎকালীন বিশ্বে আল-মামুন ছিলেন মনীষী সম্রাট। মাঝে মাঝে পৃথিবীর বুকে এরূপ মনীষী সম্রাটদের জন্ম সারা ধরনীকে ধন্য করে তোলে। কেননা, রাজশক্তি চিরদিনই অপ্রতিহত ও রাজ-আদেশ চিরদিনই অনিবার্য। এই অপ্রতিহত ও অনিবার্য শক্তি যখন মানুষের শুভ কাজে ব্যয় হয়, তখন মর্ত্যের বুকেই সৃষ্টি হয় স্বর্গ, তখন যুগ হয় স্বর্ণযুগ। খলিফা মামুন সেই স্বর্ণযুগের স্রষ্টা।

যাঁর দ্বিধাহীন সমর্থনে ও সংকোচহীন পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম সভ্যতার অসামান্য উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সারা বিশ্বে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না যাতে মামুনের যুগের কবি, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, ইতিহাসবিদ, স্থাপত্যবিদ, অংকশাস্ত্র বিশারদ, আইনজ্ঞ, ধর্মবেত্তা, চিকিৎসক, চারু ও কারুশিল্পী ও অন্যান্য মনীষীগণ অসামান্য অবদান রেখে যান-নি। ঐতিহাসিক আমীর আলি বলেন—"মামুনের খেলাফত স্যারাসিনীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। যথার্থই একে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়েছে। তাঁর বিশ বছরব্যাপী শাসনকাল বুদ্ধিবৃত্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের মানসিক উৎকর্ষের অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছেন।" মামুনের শাসনকাল সন্দেহাতীত ভাবে ইসলামের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগের সৃষ্টি করে আব্বাসীয় খেলাফতের স্বর্ণযুগের সূচনাও করে।

পিতা হারুণ ও পুত্র মামুন ঃ হারুণের কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি খুব বেশি আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণই তাঁর রাজত্বকে আরব্যোপন্যাসের মর্যাদা দান করে। কিন্তু পুত্র মামুন যাঁর ধীশক্তি ও প্রজ্ঞা তাঁকে জ্ঞান-জগতের অতি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে। প্রথম জীবনে ধর্ম-সাহিত্য প্রভৃতি সকল কিছুর সার্থক চর্চা করে পরবর্তী জীবনে জ্ঞান যখন পরিপক্ক রূপ ধারণ করেছে, তখন তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানে অধিক আকৃষ্ট হন। মামুনের এই আকর্ষণই একদিন মুতাজিলা নীতিকে জনসম্মুখে অনেকখানি আকর্ষণীয় করে তোলে।

মামুনের চরিত্রে প্রভাব ঃ মামুনকে প্রথম জীবনে অর্থাৎ বাল্যে এবং পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ যৌবনে মহিলাদের মধ্যে দু'জন মহিলা খুবই প্রভাবান্বিত করেন। প্রথম জীবনে মা পারস্য তনয়া মারাজিলা এবং পরবর্তী জীবনে পত্নী সহল দুহিতা বুরান। পুরুষদের মধ্যে প্রথম জীবনে শিক্ষক ও পরবর্তী জীবনে উজিরের

প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত মানুষের প্রভাবে মামুন গতানুগতিক গোঁড়া সনাতন ইসলামি ধর্মমত বর্জন করেন।

(২)

ধর্মমত ঃ খেলাফত লাভের দু'বছর পর্যন্ত তিনি পারস্য ও খোরাসানে বসবাস করে সেখানেও জ্ঞানচর্চায় মগ্ন থাকেন। নিজে শিয়া মতাবলম্বী হয়েও শিয়াধর্মে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও প্রাচীনপন্থীদের একপেশে মতবাদকে সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতির অন্তরায় বলে মনে করতেন। মামুন নিজে ছিলেন দার্শনিক এবং যুক্তিবাদে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। তাঁরই আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুতাজিলা নীতির সম্প্রসারণ ঘটে। এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে এক সাথে কয়েকটি ডাবল-প্রমোশনও লাভ করে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন ঃ

জ্ঞানচর্চা ঃ আরবের মুসলিম খেলাফতকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উমাইয়া যুগকে বলা হয়—আরব যুগ এবং আব্বাসীয়া যুগকে বলা হয় ইসলামি যুগ। আব্বাসীয়া যুগের পৃথিবীর রূপ-নিকেতন বাগদাদ নগরীতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মহাজাতি মহামানবের মিলন হয়েছিল। বিশ্বের ইতিহাসকে এই যুগ প্রভাবান্বিত করেছে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে। সেজন্য অধ্যাপক হিট্টি বলেন— "এই যুগে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ ও চিন্তার বিকাশ ঘটে। এই সময়ই ইতিহাস সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।" এই সময় আরব জ্ঞানচর্চা সাধারণত দুটো ধারায় প্রবাহিত হয়, প্রথমটি আরব জাতীযতাবাদে অনুপ্রাণিত কার্যাবলী, যেমন—ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ব্যবহারিক আইন প্রভৃতি এবং দ্বিতীয়টি দর্শন, ভূগোল, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি।

প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক ঃ আব্বাসীয় খেলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে মহীরূহ দেখা যায়, একদিন তার বীজ বপন করেছিলেন খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর। এই বীজ অতি সযত্নে অংকুরিত হয়েছিল খলিফা হারুণ-আর-রশিদের সময়। ঐ চারাবৃক্ষটি পরবর্তীকালে খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের খেলাফতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কৃষ্টি, সভ্যতার সুস্বাদু ও সুবৃহৎ ফল-বৃক্ষের মহীরূহ রূপে দেখা দেয়। বৈদেশিক প্রভাবে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনের উন্মেষ আব্বাসীয়া যুগেই প্রবল আকার ধারণ করে। বিশ্ব জ্ঞান-ভাণ্ডারের জ্ঞান আহরণের জন্য আব্বাসীয়া যুগের অনুসন্ধিৎসা, বুদ্ধিবৃত্তি, একনিষ্ঠ অনুরাগ ও জ্ঞানস্পৃহা তদানীন্তন বিজ্ঞসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আব্বাসীয়া যুগের মুসলমান পণ্ডিতগণ আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি, সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন করে স্বর্ণ-যুগের সূচনাই করেননি বরং লুপ্তপ্রায় প্রাচীন বিশ্ব-সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ধ্বংসোন্মুখ বহু মূল্যবান জিনিসকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে প্রাচীন মানব

সভ্যতার ধারক ও বাহকের গৌরবলাভ করেছেন। এইক্ষেত্রে বিশ্ব-সভ্যতার সংরক্ষণে আব্বাসীয় যুগের মুসলমান পণ্ডিতগণের অবদান অসামান্য ও চির-স্মরণীয়। তাঁদের হস্তক্ষেপ ব্যতীত আজকে দিনের বিশ্ব-মানব বিগত প্রাচীন বিশ্ব-সভ্যতার অনেক কিছু মূল্যবান জিনিস হতে একেবারেই বঞ্চিত হত। এই কারণেই বহু বিদেশী ঐতিহাসিক তাঁদেরকে প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক বলে অভিহিত করেছেন।

'বায়তুল হিকমা' জ্ঞান-মন্দির ঃ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিচক্ষণ জ্ঞানী ও গুণগ্রাহী সম্রাট মামুন বিশ্বের গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত করার জন্য তদানীন্তন পণ্ডিতবর্গের দ্বারা সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। এই অধ্যায়ে সমগ্র সমাজের পণ্ডিতবর্গের চেষ্টা ও সাধনাকে তিনি সাদরে আপ্যায়িত করে প্রাণবন্ত করেছিলেন। গ্রীক জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে জ্ঞানের উপকরণ উদ্ধারে ও আহরণের জন্য তিনি ইবন-মাসওয়া ও হুনাইন ইবন ইসহাকের নেতৃত্বে কনস্টাণ্টি-নোপল ও সিসিলি হতে গ্রীক ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এই ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য মূল্যবান ভাষাগুলিতে লিখিত পাণ্ডুলিপি হতে জ্ঞান আহরণের ও উদ্ধারের জন্য খলিফা ৮৩০ খ্রীস্টাব্দে সে-যুগের জ্ঞানতীর্থ বাগদাদ নগরীতে 'বায়তুল হিকমা' (House of Wisdom) নামে একটি অদ্বিতীয় গবেষণাগার জ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে চির খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। এই বিশ্ববিখ্যাত গবেষণাগারে অসংখ্য বিভাগ খোলা হয়েছিল। যাদের মধ্যে তিনটি বিভাগ প্রধান রূপে পরিগণিত ছিল, যেমন—অনুবাদ বিভাগ, গ্রন্থ বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ। প্রখ্যাত মনীষী হুনাইন-ইবন ইসহাক এই বিশ্ব-বিখ্যাত গবেষণাগারের প্রথম মহা পরিচালক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। খলিফা মামুন জ্ঞান অন্বেষণে ও জ্ঞানের সংরক্ষণে আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও যে উন্মাদনা দেখিয়েছেন, তা হতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—পৃথিবীর যত রাজা-বাদশা, সম্রাট-শাহানশাহ ছিলেন, তাঁদের প্রায়ই সকলেই ব্যস্ত ছিলেন অন্যায়-অবিচারে, অত্যাচার-ব্যভিচারে, ধনাগারের বৃদ্ধিকল্পে, রাজ্য সম্প্রসারণের অন্ধ-মোহে ; যেখানে তাঁদের বিবেক ছিল বর্জিত, জ্ঞান ছিল গর্বিত, আশা ছিল অসামান্য, আত্মা ছিল অতৃপ্ত, ক্ষুধা ছিল কুকুরের ন্যায়। খলিফা মামুন একজন শক্তিধর সম্রাট হয়েও এই অধ্যায়ের ছিলেন পূর্ণ ব্যতিক্রম ও বিপরীত। অন্যান্য সম্রাটগণ যেখানে শুধু ধন সংগ্রহে ও রাজ্য সম্প্রসারণেই ব্যস্ত। তখন জ্ঞানের পূজারী খলিফা মামুন ছিলেন জ্ঞান-মন্দির গঠনে ব্যস্ত, তাই পৃথিবীর সম্রাটদের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে জ্ঞানপিপাসু খলিফা মামুন শুধু অগ্রদূত বা অগ্রণীই নন, এই পথের তিনি পথিকৃত, এই পথে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অতুলনীয়, অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় ব্যক্তি।

অনুবাদ ঃ 'বায়তুল হিকমা' নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা

উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগের উন্নতির ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক বলে পরিচিত। খলিফা এই অনুবাদ কাজের জন্য পারসিক, হিন্দু, গ্রীক, খ্রীস্টান, আরবীয় এবং অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষী ও পণ্ডিতগণকে শিক্ষামূলক কাজে নিয়োজিত করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে অনাদৃত ও অবহেলিত মূল্যবান পাণ্ডুলিপি-গুলি সংগ্রহ করে সেগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বিদেশ হতে কোথাও রাজদূত কোথাও বা রাজপ্রতিনিধি মারফত সব দেশের জ্ঞানভাণ্ডার হতে মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করে তাদের অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। একমাত্র খলিফারই পৃষ্ঠপোষকতায় গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ মনীষীবৃন্দের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী এবং বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর অমূল্য পুস্তকগুলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরব-জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করা হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় গ্রীক ও সিরীয় ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা প্রথম গ্রীক হতে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করা হত, পরে সিরীয় হতে আরবীতে অনুবাদ করা হত। এই গ্রন্থাগারে অনুবাদ অধ্যায়ে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি নিয়োজিত ছিলেন। লিউকের পুত্র কোসটার গ্রীক, সিরীয় ও কালদীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির আরবীতে অনুবাদের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তেমনি মানকাহ ও দুবান নামক ব্রাহ্মণ মনীষী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় গণিত ও ও জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তকগুলি আরবীতে অনুবাদের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। আবার ঈশা-বিন-এহিয়া, মুসা-বিন-খালিদ প্রমুখ পণ্ডিতগণ পারস্য ভাষায় লিখিত মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলি আরবীতে অনুবাদ করেন। খলিফা মামুন এই সমস্ত অনুবাদকদের উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় পারিশ্রমিক দিতেন। খলিফা মামুনের পূর্বে শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, বরং বিশ্বের কোন ইতিহাসেই অনুবাদের এইরূপ অস্বাভাবিক আয়োজন দেখা যায়নি। এই আয়োজনই খলিফা মামুনের খেলাফতকালকে স্বর্ণযুগের মর্যাদা দান করেছে। এই অনুবাদ-সাহিত্য সমগ্র মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজন করে মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপীয় জাতিগুলিকে জ্ঞানের আলো দান করে। তাই বিশ্ব সভ্যতার জ্ঞানচর্চায় ও জ্ঞানালোকে খলিফা মামুনের দান অপরিসীম।

হুনাইন-ইবন-ইসহাক ঃ খলিফা মামুনের জ্ঞানশালার সিংহদ্বার অলঙ্কৃত করেছিলেন হুনাইন-ইবন-ইসহাক (৮০৯-৭৩ খ্রীঃ)। হুনাইন প্রচলিত ধর্মমতে একজন নেস্টোরিয়ান খ্রীস্টান ছিলেন। প্রথম জীবনে প্রখ্যাত চিকিৎসক ইবন-মাসওয়ার সহকর্মী ছিলেন। পরে খলিফার রাজবৈদ্য জিব্রিল-ইবন-বখতিয়াশুর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। সবশেষে তিনি গ্রীক ভাষা শিক্ষা করে গ্রীক অঞ্চল হতে গ্রীক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত হন। খলিফা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বায়তুল হিকমার মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন। হুনাইন তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ইসহাক এবং হুবাঈস-ইবন-আল-হাসানের সহায়তায়

বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রীক পুস্তকগুলি নিখুঁত ভাবে আরবীতে অনুবাদ করেন। ঈসা-ইবন-ইয়াহিয়াও এই অনুবাদের কাজে আপন কৃতিত্ব বলে খলিফার প্রশংসা ভাজন হন। ঈসা সাধারণত গ্রীক পুস্তকগুলি প্রথম সিরীয় ভাষাতে অনুবাদ করতেন, পরে তাঁর অধঃস্তন অনুবাদকগণ ঐগুলিকে আরবীতে অনুবাদ করতেন। খলিফার আগ্রহ ও আদেশে হুনাইন অ্যারিস্টটলের Hermeneutica গ্রন্থটি প্রথম গ্রীক হতে সিরীয় ভাষাতে অনুবাদ করেন এবং তাঁর পুত্র ইসহাক এটাকে সিরীয় ভাষা হতে আরবীতে অনুবাদ করেন। হুনাইন গ্যালন, হিপোক্রিটাস এবং ডায়স্করাইডসের বহু মূল্যবান গ্রীক গ্রন্থরাজি আরবীতে অনুবাদ করে অমর খ্যাতি অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্লেটোর Republic, অ্যারিস্টটলের Categories, Physics, Magna Moralia প্রভৃতি গ্রন্থরাজির আরবী অনুবাদ করে খলিফাকে এতই মুগ্ধ করেন যে, খলিফা মামুন তাঁকে প্রতিটি অনূদিত পুস্তকের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা পারিশ্রমিক স্বরূপ উপহার দিতেন। বিশ্বের ইতিহাসে, জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে, রাজা-বাদশাদের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত আজও নজিরবিহীন। গুণগ্রাহী খলিফা গ্রীক ভাষায় লিখিত অবলুপ্ত-প্রায় জ্যোতিষশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপিগুলিকে আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত করে কালের কবল থেকে রক্ষা করেন। খলিফা প্রতিটি অনুবাদককে উৎসাহিত করার জন্য মাসে পাঁচশ' দীনার পারিশ্রমিক দিতেন। আবার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ক্ষেত্রেও খলিফা সমপরিমাণ উৎসাহব্যঞ্জক পারিশ্রমিক দিতে কোনদিনই দ্বিধা বোধ করতেন না।

আল-হাজ্জাজ-ইবন-ইউসুফ-ইবন-মাতার (৭৮৬-৮৩৩ খ্রীঃ)ঃ সে যুগে ইবন-মাতারও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনিই ছিলেন হাররান স্কুলের অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুবাদের পুরোধা ব্যক্তি। ইউক্লিডের Elements এবং টলেমির Almagest-এর সর্ব প্রথম অনুবাদক হিসাবে সে যুগের সকল সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুনাইনের পূর্বে তিনিই ছিলেন খলিফা হারুণ ও মামুনের সর্বপ্রথম অনুবাদক। এই সময়ের আরও দু'জন খ্যাতনামা অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়—আবু আল-ওয়াকা এবং লুক পুত্র কস্টা। এঁরাও গ্রীক ভাষা হতে বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি আরবীতে ভাষান্তরিত করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে গেছেন।

মানমন্দিরঃ খলিফা মামুন অনুবাদ সাহিত্য দ্বারা বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডারকে লাভ করেন। কিন্তু জ্ঞান-জগতে তাঁর চেষ্টা এখানেই সীমিত ছিল না। এটা ছিল তাঁর প্রচেষ্টার একটি শাখা মাত্র। জ্ঞান আহরণের এমন কোন দিক ছিল না, যাকে তিনি সাদরে বরণ করেননি। খলিফা মামুনের খেলাফতে মুসলিম মনীষী-গণ মৌলিক গবেষণা দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ও অপরিসীম অবদান রেখে যেতে সক্ষম হন। অনেক ক্ষেত্রেই আবেগ ও অনুভূতির পরিবর্তে বিচার-বুদ্ধি, যুক্তি-তর্ক ও প্রগাঢ় শ্রমসাধ্য অনুশীলন দ্বারা গ্রীক, পারস্য ও

ভারতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, ভূগোল ও রসায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে যান। বাগদাদের শাম্মাসিয়া ফটকের নিকট খলিফা মামুন একটি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করে ঐ সমস্ত বিষয়গুলির ওপর যথাযথভাবে গবেষণা করে মানবকল্যাণে তাদের মূল্যায়ন করেন। এই মানমন্দিরে দু'জন প্রধান পরিচালক ছিলেন। তাঁদের একজন সিদ-ইবন-আলি ও অন্যজন—ইয়াহিয়া-ইবন-আবি মনসুর। এখানে জ্যোতির্বিদগণ গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন, সঙ্গে সঙ্গে টলেমির আল-মাজেস্টের সূত্রগুলিও পরীক্ষা করে দেখতেন। এই সকল সূত্রের মধ্যে ছিল দিবা-রাত্রির সমতা ও সৌর বছরের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। তদানীন্তন যুগে এই কাজের সাহায্যের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত, তাদের মধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ, (Qudrant), এস্ট্রলেব, সূর্যঘড়ি ও ভূগোলক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মানমন্দিরের বৈজ্ঞানিকগণ সর্বপ্রথম পৃথিবীর আকৃতি ও তার পরিধি নির্ভুলভাবে নিরূপণ করেন। তাঁরা প্রথম মধ্যরেখার (Meridian) মাত্রা নিরূপণ করে পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সেদিনের এই মানমন্দিরের বৈজ্ঞানিকগণ 'পৃথিবী গোল'—এই মৌলিক সত্যটি আবিষ্কার করে তার ওপর ভিত্তি করেই তাঁরা তাঁদের গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁদের বহু পরেও ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীকে চ্যাপ্টা বলেই মনে করতেন। তাই সেদিনের ঐ মানমন্দিরের বৈজ্ঞানিক আজকের আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণের প্রকৃত পূর্বসূরি। তাঁদের পূর্ব-সাধনা আজকের সাধনার বীজ স্বরূপ। সেদিনের বৈজ্ঞানকগণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতনামা ছিলেন—ইবন-শাকির ও তাঁর পুত্রগণ। ইবন-শাকিরের পুত্রগণ মামুনের মানমন্দিরে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও তারা তাদের বাগদাদস্থ বাসভবনে প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণার কাজ পরিচালনার জন্য একটি মানমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ আল-খাওয়ারিজমীও এই যুগের এই মানমন্দিরের অন্যতম গবেষক। মানমন্দিরের অপর একজন বৈজ্ঞানিক আবুল হাসান দূরবীন যন্ত্র আবিষ্কার করে আজও অমর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সকল অসামান্য অবদান খলিফা মামুনের রাজত্বকালকে এককথায় জ্ঞানের রাজত্বে পরিণত করে জ্ঞান-জগতের মুকুটবিহীন বিশ্ব-সম্রাটের মান ও মর্যাদা দান করেছে। বিশ্বের যে কোন সম্রাটের জন্য এই সম্মান আজও বিরল। জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানের অনুশীলন করা যে কোন মুসলমানের জন্য অতি আবশ্যকীয় কাজ। খলিফা মামুন একজন মুসলমান হিসাবেও সে কাজ ষোলকলায় পূর্ণ করে গেছেন। ইসলামধর্ম যে জ্ঞান-ভিত্তিক, খলিফা মামুন তাকে যথাযথ রূপ দিয়ে যান জ্ঞানের সন্ধানে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে যান পণ্ডিত শোভিত দরবারে, প্রয়োগ করে যান আপন জীবনে।

তিনি ছিলেন কোরআন শরীফের হাফেজ, কোরআন শরীফ ছিল তাঁর দিবা-রাত্রির দিক-দিশারী। এই কোরআন শরীফ হতেই জ্ঞানপিপাসু খলিফা ও গুণগ্রাহী মামুন বারবার উল্লেখ করেছেন—আল্লাহর সংজ্ঞা আল্লাহ্ নিজেই দান করেছেন তাঁর আপন বাণী কোরআন শরীফে—আল্লাহ্ আসমান জমিনের আলো, এবং রসুলে আকরম মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ) আলোর সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেছেন—জ্ঞানই আলো। সুতরাং যিনি জ্ঞানলাভ করেছেন, তিনি আলো লাভ করেছেন এবং যিনি আলো লাভ করেছেন, তিনি আল্লাহকে লাভ করেছেন। ইসলামের এই সরল ও সহজ ব্যাখ্যায় খলিফা মামুন জ্ঞানের সেবায়, জ্ঞানচর্চায়, জ্ঞানের-জগৎকে স্তম্ভিত করে গেছেন, একসাথে কয়েক জোড়া ডবল প্রমোশনও দিয়ে গেছেন।

কলাবিভাগ ঃ খলিফা মামুনের রাজত্বকালে কলাবিভাগের এমন কোনদিক ছিল না, যা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। জগদ্বিখ্যাত ফারসী সাহিত্যের ফল্গুধারা যখন মৃতপ্রায়, মামুনের হস্তক্ষেপে ফারসী সাহিত্যে নেমে এল জোয়ার, তা যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে নবজীবন লাভ করল। মামুনের রাজসভা জন্ম দিল আধুনিক ফারসী কবিতার জনক ও স্রষ্টা আব্বাসকে। কবি বহুদিন যাবৎ তাঁর রাজসভাকে অলংকৃত করেন। তাঁর দরবারে বৈজ্ঞানিক, ধর্মবিদ, কবি, সাহিত্যিক সকলেরই সমমর্যাদা ছিল। তাই জ্ঞান-বৃক্ষের সকল শাখাই ফুল ও ফলে, পুষ্প ও পল্লবে এক মনোরম ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করেছিল। তদানীন্তন সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ ধর্মভীরু ও নিবেদিতপ্রাণ আবুল-আতাহিয়া (৭৪৮-৮২৮ খ্রীঃ) খলিফার রাজদরবারকে স্বর্গে পরিণত করেন।

কোরআন ও হাদিস ঃ কোরআন শরীফের ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই ব্যাপক ভাষাতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় গবেষণার সূচনা হয়। খলিফার খেলাফতে ধর্মতত্ত্ব, হাদিস-শাস্ত্র, আইনশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির চর্চা অবিরাম গতিতে চলতে থাকে। খলিফা নিজেই ছিলেন কোরআনের হাফেজ। তিনি কোরআনের তফসিরে (ব্যাখ্যায়) অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন। কোরআন ও হাদিসের শুষ্ক জ্ঞানার্জনেই তাঁর কর্তব্য সীমিত ছিল না। এই দুটোর প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ও অসাধারণ ভক্তি এবং ভালবাসা। কথিত আছে, তিনি প্রতি রমজান মাসে ৩৩ বার কোরআন শরীফ খতম করতেন। খলিফা ছিলেন স্বাধীন চিন্তার পথিকৃত, তাই মুতাজিলাকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দান করেন। যে সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তি ধর্মতত্ত্ব, ব্যবহারিক আইন ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা সর্বপ্রথম কোরআন ও হাদিস দ্বারাই অনুপ্রাণিত হন। সুতরাং আরব-জ্ঞানচর্চার মূলে ছিল—কোরআন ও হাদিস। প্রকৃত কথা বলতে গেলে কোরআন ও হাদিস শুধু ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা

সমাধানে মুসলমানদের সহায়তাই করেনি বরং কোরআন ও হাদিসের সর্বাপেক্ষা বড় কথা এটি মুসলমানদের চিন্তাজগতে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি করে জাতীয় জীবনের নীরব ও নিস্তব্ধ তরঙ্গে মহাতরঙ্গাভিঘাত জাগিয়ে তোলে। একটি জাতির অস্থি ও মজ্জাকে অসাড় করে তুলতে অজ্ঞানতার যে প্রভাব, জীবন্ত আরব বেদুইন তা হতে নিষ্কৃতিলাভ করেনি, তাঁদের দুর্বার জীবন-স্রোতও রেহাই পায়নি। কোরআন ও হাদিস এনে দিল তাঁদের সেই জাতীয় জীবনে অপরিমিত জোয়ার। সংযত জোয়ারের মূলে ছিল জ্ঞানের দুয়ার। খলিফা মামুনের দরবারে এই কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। এটি উল্লেখেরও প্রয়োজন রাখে না, মুসলিম-জাহানে যে ছ'টি হাদিস গ্রন্থ (মহানবীর বাণী) প্রচলিত, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মহম্মদ-বিন-ইসমাইল আল-বুখারির গ্রন্থটি, যার নাম 'বুখারি শরীফ'। পারস্যবাসী আল-বুখারি (৮১০-৭০ খ্রীঃ) দীর্ঘ ষোলো বছর পারস্য, ইরাক, সিরিয়া হাজ্জাজ, মিশর ও অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করে ৬০ লক্ষ সংগৃহীত হাদিস হতে মাত্র ৭,২৭৫টি হাদিসকে নির্ভুল বলে গ্রহণ করে তাদের বিভিন্ন অধ্যায়ে (যেমন—নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি) শ্রেণীবিন্যাস করে হাদিসশাস্ত্রের মহাগ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। সুতরাং সেদিনের ঘনঘোর অন্ধকারে মুসলিম-সমাজে আলো বিতরণে কোরআন ও হাদিস জাতীয় জীবনের গগনে সূর্য ও চন্দ্রের কাজ করেছে। বিচক্ষণ খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন বুঝতে পেরেছিলেন জ্ঞানচর্চায় ও জ্ঞান বিতরণে এ দুটোই হবে সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার।

মতবিরোধ ঃ খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের যুগে ইসলামধর্মের চতুর্থ মজহাবের প্রবর্তক ইমাম আহমদ ইবন-হাম্বলের আবির্ভাব হয়। ইমাম সাহেবের যুক্তিতর্ক মুতাজিলাদের নব-প্রবর্তিত নীতিগুলির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে মুতাজিলাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন ইমাম সাহেবকে ঐ মত পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। ইমাম সাহেব স্বয়ং খলিফার কথায় কর্ণপাত না করলে খলিফা তাঁকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়ে ইমাম সাহেবের স্বাধীন মতামতে বাধা সৃষ্টি করে আপন অজ্ঞাতেই চিন্তার মুক্তির পথকে অবরোধ করলেন। ইমাম সাহেব রাজ-নির্দেশে বন্দী হলেন, নির্যাতিত হলেন, তবুও আমৃত্যু আপন মতে অটল ছিলেন। পরবর্তীকালে ওয়াহাবী আন্দোলনে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এই একটি স্থানেই বিচক্ষণ খলিফার চিন্তার দুর্বলতা ও দৈন্য লক্ষ্য করা যায়। খলিফা মামুনের মতো ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষ, ইসলামধর্মের একজন সুদক্ষ প্রবক্তা ও ইসলামের চিন্তাশীল ব্যক্তি কেন যে ইসলামের উদারতা, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার কথা ভুলে গেলেন, তা বড়ই দুর্বোধ্য ও দুঃখজনক বেদনাদায়ক। খলিফার সাথে ইমামের মতবিরোধের ফলে অসহায় ইমামকে রাজদণ্ড মাথা পেতে নিয়ে নির্বিচারে নির্যাতনে কারা প্রাচীরের অন্তরালে প্রাণ দিতে হল। অন্যদিকে, কালের কষ্টিপাথরে মামুন চরিত্র কলঙ্কিত হল।

জগদ্বিখ্যাত ইমাম আহম্মদ-ইবন-হাম্বল শাহানশা খলিফার সাথে মতবিরোধে আপন প্রজ্ঞাকে বাঁচিয়ে প্রাণকে বিসর্জন দিলেন।

হস্তলিপি ও ইতিহাস : মুসলমানগণ ইমাম হাম্বলের বাণীগুলি সুন্দর ও পরিষ্কার ভাবে লিপিবদ্ধ করে হস্তলিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। খলিফা মামুনের সময় হস্তলিপি শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে, সে সময় যিনি এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা পারদর্শিতার পরিচয় দেন, তিনি আর-রায়হানী। এই সময়ে যাঁরা ইতিহাস রচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আল-ওয়াকেদি (৮২২-৩৩ খ্রীঃ) প্রধান। মদিনাবাসী আল-ওয়াকেদি ইসলামের বিজয়ের ওপর মনোজ্ঞ গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। যে কয়েকজন প্রাক্-ইসলামি যুগের ওপর ইতিহাস রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে হিশাম আল-কালবি (৮১৯ খ্রীঃ) প্রধান।

শিক্ষার সম্প্রসারণ ও কাগজের কারখানা : মামুনের খেলাফতে সমগ্র সাম্রাজ্যে শিক্ষা-দীক্ষার সম্প্রসারণের জন্য যথোপযুক্ত সকল রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শুধু সামাজিক পরিবেশ গঠনের জন্য খলিফা সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ভার পরিচালনার জন্য খলিফা বহু অর্থ ও বরাদ্দ করেন। কোথাও কোথাও লা-খেরাজ সম্পত্তিও দান করেন। চিরদিনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান সহায়ক কাগজ। তাই চীনাদের অনুকরণেও তাঁদের সাহায্যে মুসলমানগণ প্রথম সমরকন্দে কাগজের কারখানা স্থাপন করেন। অতঃপর খলিফা হারুণ রশিদের রাজত্বে ৭৯৪-৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে প্রথম কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সময়ে প্রভূত পরিমাণে কাগজ উৎপাদিত না হলে বাগদাদ স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করতে পারত না। জ্ঞানের খনি মানমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হত না। পরবর্তীকালে সেই মানমন্দিরকে অনুসরণ করে গড়ে উঠল বিশ্ববিখ্যাত নিজামিয়া ও মুসতান সারিয়া মাদ্রাসা। এই যুগকে কেন্দ্র করে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওসনার একটি সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন—"আমরা সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম দেখতে পাই যে, একটি ধর্মীয় ও রাজকীয় শাসনব্যবস্থা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সখ্যতার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তার উন্নতি বিধানের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে।" এই মন্তব্য হতে খলিফা মামুনের চরিত্র ও তাঁর খেলাফতের একটি পূর্ণ ছবি ভেসে ওঠে।

কৃষি, শিল্প, ব্যবস্যা-বাণিজ্য : মামুনের খেলাফত শুধুমাত্র জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে নিয়ে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেনি। সেখানে স্থান পেয়েছিল কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারু, চারু, আমদানি, রপ্তানি প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর চোখ জুড়ানো উন্নতি। তাঁর খেলাফতেও তাঁকে স্বর্ণযুগের সম্মান দান করেছিল। খলিফা তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমি জরিপ, খাল-খনন ও জল নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন। এর ফলে

সমগ্র দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন—"মহান পিতা ও পুত্রের রাজত্বকালে পাঁচ শতাব্দীব্যাপী শুধু আব্বাসীয় খেলাফতেই নয়, বরং সমগ্র আরব খেলাফতের স্বর্ণযুগ বলে অবিসংবাদিতভাবে সকলেরই দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে। আল-মামুনের রাজধানী সম্ভবত বাণিজ্য, শিল্পোন্নয়ন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে গৌরব অর্জন করে, যা উর এবং ব্যাবিলন হতে তেসিফোন পর্যন্ত নির্মিত সমৃদ্ধশালী রাজধানীগুলির যোগ্য উত্তরাধিকার ছিল।" কথিত আছে, বাগদাদের বাজারকে বিশ্ব-বাজার বলে অভিহিত করা হত। কেননা বিশ্বের সমস্ত কিছুই নাকি বাগদাদের বাজারে পাওয়া যেত। বাগদাদের ছোট-বড় বিপণিগুলিতে মিশরের লিনেন কাপড়, সিরিয়ার ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র, লেবাননের কাচের দ্রব্যাদি, বাহরাইনের মুক্তা, ইয়েমেনের সুগন্ধি দ্রব্য (ফ্রানকিনসিন) এবং মূল্যবান মশলা, পারস্যের কার্পেট, রকেড এবং এমব্রয়ডারি করা বস্ত্রাদি, খোরাসানের সোনা ও রূপার অপূর্ব কারুকার্যখচিত অলঙ্কারাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত। এতদ্ব্যতীত আরো বহু জিনিস আমদানি করা হত, যেমন বিশ্ব-বিখ্যাত ভারতীয় রং, ধাতব-দ্রব্যাদি, মধ্য এশিয়ার রুবী, বস্ত্রাদি, ক্রীতদাস-দাসী ; চীনের মৃৎপাত্রাদি, সিল্ক ও মৃগনাভী, রাশিয়ার ও স্কেণ্ডেনেভিয়ার মধু, সার, পূর্ব আফ্রিকার কাল-ক্রীতদাস এবং সোনার পাত প্রভৃতি বস্তু বাগদাদের বাজারকে একদিন বিশ্ব-বাজারের খ্যাতি দান করে। এই বিশাল বাণিজ্যসম্ভার হতে এ কথাটি সহজেই অনুমান করা যায়—খলিফা মামুনের রাজত্বকাল আন্তঃ এবং বহির্বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতির স্বাক্ষর বহন করে। এই সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিশারের কথাটি এখানে বড়ই প্রণিধানযোগ্য— "মধ্যপ্রাচ্যের পণ্যদ্রব্যাদি পশ্চিমী রুচির তুলনায় খুবই মূল্যবান এবং অনেক উন্নতমানের ছিল। কিন্তু তার বিনিময়ে ইউরোপীয় দেশসমূহের কিছুই দেওয়ার ছিল না।"

মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ : সুতরাং এই দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে বলতে পারি যে, খলিফা মামুনের খেলাফত শুধুমাত্র একপেশে কৃষ্টি ও সভ্যতার চরম শিখরে উপনীত হয়ে অগাস্টাস যুগের গৌরবই দান করে যায়নি, বরং মনুষ্য সমাজের এমন কোন দিক ছিল না, যে দিকটার চরম উন্নতি না করে অবহেলা করা হয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের অবদান এত দূর উৎকর্ষ সাধন করে, যা অভূতপূর্ব। তাই এককথায় খলিফা মামুন ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, 'মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ' সৃষ্টি করে বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে চির অমরত্ব লাভ করেছেন।

কর্মী তলিয়ে যায় অতল জলে
কীর্তি দাঁড়িয়ে রয় আপন বলে।

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসীয় খেলাফতের শেষার্ধ

আল-মুতাসিম (৮৩৩-৪২ খ্রীঃ) ঃ

সিংহাসন লাভ ও সামরিক ঘাঁটি স্থানান্তরিত ঃ পরলোকগত খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের ইচ্ছামতো তাঁর ভ্রাতা আবু ইসহাক মহম্মদ আল-মুতাসিম বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে আব্বাসীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। সৈন্যগণ প্রথমে মামুনের পুত্র আব্বাসকে খলিফা নির্বাচিত করতে চাইলে আবু ইসহাক আব্বাসকে টায়ানা হতে টারসাসে ডেকে আনেন, এবং আব্বাস তাঁর পিতৃব্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করলে সেনাবাহিনীর সকলেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল। খলিফা হয়েই মুতাসিম টায়ানার সামরিক ঘাঁটি পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি টায়ানা হতে টারসাসে যাবতীয় সেনাবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র স্থানান্তরিত করলেন।

সামাররায় রাজধানী স্থানান্তরিত ঃ এতদ্ব্যতীত তিনি রোমান সাম্রাজ্যের দেহরক্ষী বাহিনীর মতো আরব ও পারস্য সৈন্যদের ক্ষমতা হ্রাস করার অভিপ্রায়ে একটি তুর্কী বাহিনীও গঠন করলেন। মামুন যেমন ছিল পারস্য ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তান, মামুনের ভ্রাতা আল-মুতাসিম তেমনি ছিলেন তুর্কী ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তান। এই কারণেই মামুনের মৃত্যুর পর পারস্য-প্রধান সেনাবাহিনী চেয়েছিল মামুনের পুত্র আব্বাসকে খলিফা করতে। পরে তুর্কী মায়ের গর্ভজাত সন্তান আল-মুতাসিম সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই পারস্যজাত সেনাবাহিনীর শক্তি হ্রাস করে তুর্কী বাহিনী গঠন করেন, কেননা তিনি তুর্কী মায়ের সন্তান ছিলেন।

কিন্তু এই সকল সৈন্য পরিচালিত হত সেনাপতির দ্বারা। সেখানে খলিফার কোন কিছু করার ছিল না বললেই চলে। কালক্রমে একদিন এই তুর্কী বাহিনী এতই শক্তিশালী হয়ে পড়ল যে, তাদের স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তারা শান্তিরক্ষার পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকল, আপন খেয়াল-খুশিমতো চলতে থাকল। খলিফার আদেশ মান্য করা দূরে থাক, তারাই খলিফাকে আদেশ মান্য করাতে বাধ্য করতে থাকল। খলিফা তাদের খেয়ালের খলিফাতে পরিণত হলেন। কখনও তাঁকে সিংহাসনে বসাত, কখনও বা সিংহাসনচ্যুত করত। এই অবস্থায় বাগদাদবাসীগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, তাঁদের মান-সম্মান, জান-মালও বিপন্ন হয়ে উঠল। তখন খলিফা নিরুপায় হয়েই বাগদাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামাররা বা 'সুর-রা-মান-রা'তে (দর্শকদের আনন্দকারী) নামক স্থানে ৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। খলিফা নতুন রাজধানীতে বুলকাওয়ারা নামে একটি অপূর্ব সুন্দর রাজপ্রাসাদ, ২,৫০,০০০ সৈন্যের জন্য সেনানিবাস এবং ১,৬০,০০০ অশ্ব রাখার মতো একটি আস্তাবলও নির্মাণ করেন।

অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল (৮৩৬-৯৪ খ্রীঃ) সাতজন খলিফার রাজধানী ছিল সামাররা।

যুদ্ধবিগ্রহ ও বিদ্রোহ দমনঃ খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সময় গ্রীকদের সাথে যে কথাবার্তা চলছিল মুতাসিম খলিফা হয়েই সেই কথামতো গ্রীকদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে বন্দী বিনিময় করলেন। ঠিক এই সময় নিম্ন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে জাঠগণ বিদ্রোহ আরম্ভ করে বাগদাদের সকল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তখন খলিফার নির্দেশক্রমে উজায়ক নামক একজন আরব সেনাপতি কয়েক হাজার জাঠকে বন্দী করে বাগদাদে নিয়ে আসেন। জাঠগণ খলিফার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলে খলিফা দয়াবশত তাঁদের প্রাণহানি না করে এশিয়া মাইনরে নির্বাসিত করেন। সেখান হতে ইউরোপে গিয়ে এরা জিপসী নামে পরিচিত হয়।

নাস্তিক বাবকঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুনের খেলাফতে আমরা নাস্তিক বাবেক বা বাবকের কথা উল্লেখ করেছি। বাবক পুনরায় তার বিদ্রোহ আরম্ভ করায় খলিফা মুতাসিম এই বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে আফসিন নামক একজন তুর্কী সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। বাবকের কয়েকটি ঘাঁটি ছিল এবং সেগুলি ছিল গভীর অরণ্যে, তাই তাকে খুঁজে পাওয়াই ছিল কঠিন সাধনা। অথচ অতর্কিতে আক্রমণ করত। এদিকে তুর্কী সেনাপতি আফসীন নাস্তিক বাবককে যে কোন প্রকারেই ধরার জন্য দীর্ঘ দু' বছর বন-জঙ্গলে খেয়ে না খেয়ে, কখনও বিপদের সম্মুখীন হয়ে, কখনও বা মহাবিপদের কোলে ঢলে পড়ে, কখনও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবশেষে বাবকের ঘাঁটিগুলি দখল করতে সক্ষম হন। তখন নিরুপায় বাবক প্রাণের ভয়ে আর্মেনিয়ায় পলায়নকালে একজন আর্মেনীয় সর্দার কর্তৃক হাতেনাতে ধৃত হয়ে সেনাপতি আফসিনের নিকট সমর্পিত হয়। প্রায় কুড়ি বছর যাবৎ দোর্দণ্ড প্রতাপে কাস্পিয়ানের তীরবর্তী অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব চালাবার পর আজকে তুর্কী সেনা আফসিনের নিকট এই তস্কর প্রধান ধৃত হন। সেনাপতি আফসিন বুঝতে পেরেছিলেন তার ঘাঁটিগুলি দখল না করা পর্যন্ত তাকে কখনও ধরা যাবে না। তাই তিনি সর্বপ্রথম তার ঘাঁটিগুলিকে দখলের চেষ্টা করেন। অতঃপর আফসিন নাস্তিক বাবকের আস্তানা ও আশ্রম হতে বহু ধনসম্পদ উদ্ধার করেন। এখানে এই উদ্ধারের সর্বাপেক্ষা বড় কথা—সেনাপতি সাত হাজার সুন্দরী ও পরমাসুন্দরী খ্রীস্টান ও মুসলিম মহিলাকে উদ্ধার করে তাঁদের মুক্তি দিয়ে আপন আপন ঘরে পৌঁছিয়ে দেন। নাস্তিক বাবকের পেশা ছিল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা এবং নেশা ছিল সুন্দরী ও পরমাসুন্দরী মহিলাদের একত্রিত করা। পরে তাদেরকে আপন দলের মধ্যে সম্ভোগের জন্য বিতরণ করা হত এবং উলঙ্গ নাচ করানো হত। এই অসৎ কাজের পেছনে তার অন্য উদ্দেশ্য কি ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কেননা একটি লম্পটের জন্য কয়েকটি সুন্দরীই যথেষ্ট, অথচ সে

হাজারে হাজারে সংগ্রহ করত। পৃথিবীর লম্পটের ইতিহাসে বাবক এই অধ্যায়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লম্পট বাবক ও তার কিছু অনুচরবৃন্দকে সেনাপতি আফসিন বন্দী করে রাজধানী সামাররাতে খলিফার নিকট হাজির করলে খলিফা মুতাসিম তাকে অতি জাঁকজমক সহকারে রাজকীয় সংবর্ধনা দান করে। জনসাধারণ বাবককে দেখতে চাইলে খলিফা বাবক ও তার অনুচরবৃন্দকে হাতির পিঠে চাপিয়ে রাজপথে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, পরে ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপীকে এবারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বাবকের প্রকৃত নাম ছিল বাবক খুররামি, সে কোন ধর্মে বিশ্বাস করতো না, তাই নাস্তিক ছিল, তবে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতো, তাকে নিহিলিস্টও বলা হত। সে মাজেন্দ্রানের মাজিয়ান গোত্রের অধিবাসী ছিল। তার উপাধি ছিল—'খুররামিয়া' অর্থাৎ লালসাগ্রস্ত।

বায়জান্টাইনদের সাথে যুদ্ধঃ সেনাপতি আফসিন যখন বাবকের সাথে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়—সময়ের সুযোগ নিয়ে বায়জান্টাইন সম্রাট মুসলিম সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করেন। তখন খলিফা সবেমাত্র তাঁর সামরিক ঘাঁটি টায়ানা হতে টারসাসে স্থানান্তরিত করেছেন। গ্রীকগণ নগর ও জনপদ লুণ্ঠন এবং অগ্নিদগ্ধ করে পুরুষদের হত্যা করেন এবং স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের বন্দী করে দাস-দাসীতে পরিণত করেন। এতদ্ব্যতীত খলিফার জন্মস্থান জিব্রাতায় অত্যন্ত বর্বরতার সাথে মানুষকে নির্যাতিত ও নিধন করে হত্যা করা হয়। এই সংবাদে খলিফা মুতাসিম অত্যন্ত ক্রুদ্ধভরে গ্রীক সম্রাট থিওফিলাসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, এবং তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে থিওফিলাসের জন্মস্থান 'অ্যামরিয়ন' (Amorion) ধূলিসাৎ করেন। কিন্তু এই বিজয়-মুহূর্তে খলিফার শিবিরে একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়। কয়েকজন আরব সেনাপতি তুর্কী সেনাপতিদের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে খলিফার প্রতি অত্যন্ত বিরক্তিবশত তাঁকে হত্যা করে খলিফার ভ্রাতুষ্পুত্র মামুনের পুত্র আব্বাসকে খলিফা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আরব সেনাপতিদের প্রথম হতেই আব্বাসকে খলিফা করার একটা মানসিক প্রবণতা ছিল। এই ষড়যন্ত্রের কথা কোন প্রকারে একজন ক্রীতদাসী কর্তৃক ফাঁস হয়ে গেলে খলিফা আর কাল-বিলম্ব না করে গ্রীক সম্রাটকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে শীঘ্রই একটা সন্ধি করে সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে শাস্তি দেন।

মাজিয়ান বিদ্রোহঃ আরব দলপতিদের ষড়যন্ত্র একেবারেই ব্যর্থ হওয়ায় তাদের ক্ষমতাচ্যুত করায় ও শাস্তি দেওয়ায় তুর্কী ও আরব সেনাদের মধ্যে যে ভারসাম্যটা ছিল সেটা আর থাকল না। তুর্কী সেনাদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়তেই থাকল। এমনকি খলিফা শেষ পর্যন্ত তাদে হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। তখন তুর্কী সেনাদের ক্ষমতালিপ্সা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নানা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। অন্যদিকে, ঐ সময় ৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে মাজিয়ান নেতা

মাজিয়ার খলিফার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলিফা আব্দুল্লাহ-বিন-তাহিরকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মাজিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু নাটক এইখানেই শেষ হল না। প্রকাশ পেল খলিফার সুযোগ্য তুর্কী সেনাপতি আফসিন মাজিয়ান নেতা মাজিয়ারকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গোপনে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিলেন, এবং তাঁর সাথে গোপন সম্বন্ধও ছিল। এই সংবাদ খলিফার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই আফসিনের বিরুদ্ধে আরো বহু অভিযোগ আনয়ন করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগগুলির মধ্যে প্রধান ছিল—তহবিল তছরূপ ও নাস্তিকতার অভিযোগ। সেনাপতি আফসিন প্রাণভয়ে পলায়নের চেষ্টা করলে পথিমধ্যে ধৃত হন, এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কথিত আছে, হতভাগ্য বীর তুর্কী সেনাপতির কারাগারে অনাহারে মৃত্যু হয়।

চরিত্র ঃ দীর্ঘদিন রোগশয্যায় থাকার পর খলিফা মুতাসিম ৮৪২ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার অধিকারী মুতাসিম নির্দয় ও রুক্ষ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর কয়েকটি ভ্রান্ত নীতি ও কর্মের জন্য আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে তুর্কী সেনা ও সেনাপতিদের প্রতি কটাক্ষ ও পক্ষপাতিত্ব করে নিজের ও নিজের বংশের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলেছিলেন। তিনি এই কাজটি রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সাথে সমাধা করতে পারতেন আরব নেতাদের সঙ্গে গোপন আলোচনা দ্বারা। তিনি তাঁর ভ্রাতা মামুনের নীতির অনুসরণ করেন, মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কেও তিনি ভ্রাতা মামুনের মতো একই মতপোষণ করতেন। এমনকি তাঁর সময়ও ইসলাম জগতের প্রখ্যাত মনীষী ইমাম আহমদ-ইবন-হাম্বলকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়, এবং তাঁর প্রতি দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে যান। তিনি ভ্রাতা মামুনের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু-জাফর-হারুণকে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করেন।

আল-ওয়াসিক (৮৪২-৪৭ খ্রীঃ) ঃ

আল-মুতাসিমের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু-জাফর-হারুণ আল-ওয়াসিক বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে বাইজান্টাইনদের সঙ্গে মুসলমানদের বন্দী বিনিময় হয়। এর ফলে ৫000 মুসলিম নর-নারী মুক্তিলাভ করে। ওয়াসিকও মুতাজিলাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম হতেই বাগদাদের জনগণ এটাকে ভাল নজরে দেখেনি। ওয়াসিকের সময় এই জনরোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে আহম্মদ-ইবন-নাসর নামক একজন সুফী-সাধকের নেতৃত্বে বাগদাদে এক বিপুল জনতা সরকারের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য শোভাযাত্রার দিন ধার্য করলে খলিফার নির্দেশে আহম্মদকে বন্দী করে সামাররায় খলিফার নিকট হাজির করলে সুফী আহম্মদকে মুতাজিলা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়, এবং তিনি যা উত্তর দেন তাতে খলিফা

রুণ্ট হলে কাজীর বিচারে সুফী আহম্মদের প্রাণদণ্ড হয়। ওয়াসিকের রাজত্বকালে এটিই একটি অবিস্মরণীয় কলঙ্কময় ঘটনা। খলিফা নিজে উদার, মহানুভব, শিক্ষিত এবং শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক হয়ে ঐ জঘন্যতম কাজ তাঁর চরিত্রের পক্ষে বড়ই বিসাদৃশ্য হয়েছে। তিনি নিজে একশ' রাগ ও সুর রচনা করেন। তাঁর রাজ্য শান্তি-সমৃদ্ধিতে ভরপুর ছিল। কথিত আছে, তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যে কোন ভিক্ষুক খুঁজে পাওয়া যেত না। সারা বিশ্ব-ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল বললেও কোন অত্যুক্তি হবে না। এক কথায় বলা যায়, আল-ওয়াসিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে আব্বাসীয় খেলাফতের গৌরবময় যুগের যেন অবসান হল।

আল-মুতাওয়াক্কিল (৮৪৭-৬১ খ্রীঃ) ঃ

৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে আল-ওয়াসিকের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মুতাওয়াক্কিল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হতেই আব্বাসীয় ইতিহাসের চাকা আবার অন্যদিকে ঘুরল। একদিকে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ও অবনতি আরম্ভ হল, অন্যদিকে মুতাজিলা মতবাদ তার রাজকীয় মর্যাদা হারাল। পূর্বতন তিন খলিফার ধর্মনীতি, মুতাজিলা মতবাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন, বিপরীত মতাবলম্বীদের প্রতি নিগ্রহ ও নির্যাতন প্রত্যাহৃত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সনাতনপন্থীদের অর্থাৎ সুন্নীদের মতামত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। শুধু তাই নয়, মুতাওয়াক্কিল পক্ষান্তরে মুতাজিলাদের প্রতি নির্যাতন আরম্ভ করেন। খলিফার রোষানলে মুতাজিলা মতাবলম্বী আলিম ও সরকারী কর্মচারিগণ তাঁদের সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। এখানেই তাঁরা পরিত্রাণ পেলেন না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বেশ বড় ধরনের মানুষ ছিলেন, তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। সে যুগের বিখ্যাত মুতাজিলা মতাবলম্বী আলেম ও কাজী ইবন আবিদুয়াদ পূর্ববর্তী তিন খলিফার সময়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য প্রধান কাজীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। জগদ্বিখ্যাত ইমাম আহমদ-ইবন-হাম্বলের ইতিহাস যেন তাঁর মধ্যে পুনরাবৃত্তি হল। বিশেষ করে এই কাজীরই বিচারে একদিন স্বনামধন্য সুফীবর আহম্মদ-ইবন-নাসরকে প্রাণ দিতে হয়েছিল খলিফা ওয়াসিকের খেলাফতে। আজ সেই কাজীই পড়লেন কালের বিচারে। খলিফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে পদচ্যুত করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি তাঁর যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। এতেও খলিফার ক্ষুধা মিটল না। তিনি তাঁকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করলেন, অতঃপরও খলিফা নিবৃত্ত না হয়ে কাজীর পরিবারের অন্যান্য সমস্ত লোককেও আমৃত্যু-কাল কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে ক্ষান্ত হলেন। কয়েক বছরের মধ্যে কারাগারেই কাজীর মৃত্যু হল।

খলিফা ওয়াসিকের খেলাফতে সুফীবর আহম্মদ-ইবন-নাসর অকাতরে আপন ধর্মমতের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। খলিফা সুফীর মরদেহ বাগদাদে না পাঠিয়ে

তদানীন্তন রাজধানী সামাররাতেই সমাধিস্থ করার হুকুম দেন। পরবর্তীকালের খলিফা মুতাওয়াক্কিল নাসরের দেহাবশেষ সামাররা হতে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বাগদাদে আনয়ন করে সসম্মানে কবরস্থ করেন। এই সময়ে সারা বাগদাদে এক নতুন ধর্ম-উন্মাদনার সৃষ্টি হল। পুরাতনপন্থীদের জয়-জয়কার ঘোষিত হল। খলিফা মামুন ও তাঁর দু'জন উত্তরাধিকারীর অসহিষ্ণু মনোভাবের জন্য পরবর্তীকালের খলিফা মুতাওয়াক্কিলের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার, যে উন্মাদনার সৃষ্টি করল, তাকেও এক কথায় ন্যায়বিচারে আর একটি নিপীড়ন নীতির জন্ম বলা চলে। এই ইতিহাসের কোন শেষ নেই। খলিফা মামুন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়েও সহিষ্ণুতা রক্ষা করতে পারেননি।

শিয়া-বিদ্বেষ ঃ মামুনের সময় হতে আলি (রাঃ)-এর বংশধরদের প্রতি উদারনীতি ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। খলিফা মুতাওয়াক্কিল এই নীতিরও প্রবর্তন করেন। তিনি প্রকাশ্যে আলি (রাঃ)-এর স্মৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তিনি কারবালার ময়দানে আলি (রাঃ)-এর পুত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর সমাধিকে শুধু অসম্মান দেখিয়েই নিস্তার দেননি, তাকে ধূলিস্যাৎ করে আপন ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও চরম গোঁয়ারতুমিরও পরিচয় রেখে গেছেন। এমনকি ওখানে ধর্মপ্রাণ ভক্ত ব্যক্তিদের কবর-জিয়ারত-তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ করে এই নিষেধ অমান্যকারীদের কারাবাসের ফরমানও জারি করে আর একবার নিজ অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। ফাদাক নামক একটি বাগান যা চারজন সৎ খলিফাই বিনা দ্বিধায় মহানবী (সাঃ)-এর বংশধরদের দান করেছিলেন—উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া সেটিকে তাঁদের নিকট হতে জোরপূর্বক হরণ করে নিজ অহমিকার ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে ঐ উমাইয়া খেলাফতের একমাত্র খলিফা দ্বিতীয় ওমর সেটিকে পুনরায় তাঁদের নিকট প্রত্যর্পণ করে যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর এই সৎকাজ ও অন্যান্য ন্যায়বিচারের জন্য সমগ্র আরব তাঁকেই একমাত্র পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়—খলিফা মুতাওয়াক্কিল শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশত সেই ফাদাক বাগানকে আবার বাজেয়াপ্ত করে নিজেকে কলঙ্কিত করলেন। খলিফা মূলত তিন সৎ খলিফার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) প্রমুখ। হজরত আলি (রাঃ)-এর প্রতি তাঁর তেমন কোন অনুরাগ ছিল না। তবে প্রথম তিনজনের প্রতি তাঁর দারুণ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। তাই যে কোন ব্যক্তি আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে নিন্দাসূচক কথা বলার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইহুদি ও খ্রীস্টান ঃ তাঁর রাজত্বে ইহুদি ও খ্রীস্টানদের প্রতি নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তাদের জন্য অশ্বারোহণ নিষিদ্ধ করা হয়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে ও বাড়ির দরজায় বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। তাদেরকে

কোন রাজকার্যে নিযুক্ত করা হত না। এগুলি ছিল খলিফার অতিরিক্ত ধর্মান্ধতার পরিচয়, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা-বহির্ভূত কাজ এবং অপরিণামদর্শী শাসকের নিদর্শন।

বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ: খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সময় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দেখা দেয়। সিজিস্থানে সাফ্ফারীয় বংশ তাহিরীয় বংশের অবসান ঘটাল। আজারবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দিল। মিশরে আলিবাবা নামক স্থানীয় এক নেতার অধীনে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পরে এটি প্রশমিত হয়। বেগা নামক সেনাপতি কর্তৃক আর্মেনিয়ার বিদ্রোহ দমন করা হয়। এশিয়া মাইনরে গ্রীকগণ প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে সম্রাজ্ঞী থিওডোরের নির্দেশে কয়েক সহস্র বন্দীকে হত্যা করা হল। কেবলমাত্র যারা খ্রীস্টান ধর্ম দীক্ষা নিল তারাই রক্ষা পেল।

জাফরিয়া নগরে মোতি প্রাসাদ: খলিফা সামাররায় বাবো বছব অবস্থান কবে দামেস্কতে রাজধানী স্থানান্তরিত করতে মনস্থ করলেন। তাঁব উদ্দেশ্য ছিল সেখানে তিনি সিরিয়াবাসীদের বন্ধুত্বলাভ করে তুর্কী সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তিলাভ করা। কিন্তু দামেস্কে মাত্র দু'মাস অবস্থান কবে সেখানকার আবহাওয়া খলিফার অনুকূল মনে না হওয়ায় তিনি পুনবায় সামাররাতে ফিরে এলেন। এই সামাররাতেই অবস্থানকালে খলিফা তাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে সামারার নিকটে একটি নদীতীরে বহু অর্থব্যয়ে 'জাফারিয়া' নামক একটি নগর নির্মাণ করেন এবং সেখানে 'মোতি প্রাসাদ' ও 'আনন্দভবন' নির্মাণও করেন। এই প্রাসাদের চারদিকে সুরম্য বাগান ও জলস্রোত তৈরি করা হয়। সেখানে গান-বাজনা ও আমোদ-প্রমোদের সকল রকম ব্যবস্থাই ছিল।

খলিফার অপমৃত্যু: খলিফা রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন—পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। পশ্চিমাঞ্চলের ভার অর্পণ করেন জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মুনতাসিরের ওপর এবং পূর্বাঞ্চলের ভার অর্পণ করেন অপর পুত্র আল-মুতাজের ওপর। খলিফা নানা কারণে মুতাজকে অধিক স্নেহ করতেন, তাঁর নামে মুদ্রাঙ্কনও করেন। এই পক্ষপাতিত্ব নীতি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মুনতাসিরকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তিনি ৮৬১ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন তুর্কী সেনাপতির সাহায্যে পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন। খলিফা বহু তুর্কী সেনাপতির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, অনেককে পদ হতে অপসারণও করেছিলেন। এক কথায় পূর্বতন খলিফা আল-মুতাসিম (৮৩৩-৪২ খ্রীঃ) কর্তৃক নিয়োজিত তুর্কী সেনাদের দৌরাত্ম্য থেকে তিনি মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। কেননা তুর্কী বাহিনীর দুর্ধর্ষ প্রতাপে জনজীবনও বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস—খলিফা আপন পুত্র দ্বারা তুর্কী সেনাপতিদের হাতেই প্রাণ হারালেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খলিফা মুনতাসির হতে মুত্তাকি পর্যন্ত (৮৬১-৯৪৪ খ্রীঃ)

এইবার আব্বাসীয় খেলাফতে যাত্রাগানের পালাবদলের মতো পালাবদল হতে থাকল। মুতাওয়াক্কিলের পুত্র মুনতাসির (৮৬১-৬২ খ্রীঃ) মাত্র ছয়' মাস খেলাফত পরিচালনাকালে পিতার নীতি প্রত্যাখ্যান করে ইমাম হাসান হুসাইনের সমাধিতে তীর্থযাত্রার নিষেধাজ্ঞা' প্রত্যাহার করার ফরমান জারি করে জনগণের প্রশংসাভাজন হন। তাঁর মৃত্যুর পর তুর্কী দলপতিগণ মুতাশিমের এক পৌত্র মুস্তারীনকে (৮৬২-৬৬ খ্রীঃ) খলিফা মনোনীত করেন। মুস্তারীন তুর্কী দেহরক্ষীদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাগদাদে পলায়ন করলে তুর্কীরা মুতাওয়াক্কিলের দ্বিতীয় পুত্র মুতাজকে (৮৬৬-৬৯ খ্রীঃ) খলিফা বলে ঘোষণা করেন। মুতাজ তুর্কীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঠিকমতো মেটাতে না পারলে তুর্কীগণ খলিফার সচিব ও উজিরদের বন্দী করেন। তুর্কীরা ৫০,০০০ দীনার দাবি করল। খলিফা রাজকোষে কোন অর্থ না থাকায় রাজমাতার নিকট অর্থ প্রার্থনা করলেন। সেখানেও ব্যর্থ হলে তুর্কীগণ খলিফাকে অপদস্থ করে শুধু সিংহাসনচ্যুতই করলেন না, বরং চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়ে নিরপরাধ খলিফাকে বন্দী করেন এবং অসহায় খলিফা কারাগারেই প্রাণত্যাগ করে তুর্কী সেনাদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পান। অবশেষে তুর্কী সর্দারগণ পরলোকগত খলিফা ওয়াসিকের এক পুত্রকে মুহতাদি বিল্লাহ উপাধি দান করে (৮৬৯-৭০ খ্রীঃ) খেলাফতে বসালেন, তিনিও এক বছর খেলাফত চালনা করার পর সিংহাসনচ্যুত হয়ে কারাগারেই প্রাণত্যাগ করলেন। পরপর খলিফাগণের কারাগারে প্রাণত্যাগ বড়ই করুণ ও মর্মান্তিক এবং হৃদয়বিদারক ঘটনা। এর মূলে ছিল লোভী, লালসাগ্রস্ত তুর্কী সেনাপতিগণ। যাঁরা সকলকেই 'বিল্লাহ' (আল্লাহওয়ালা) উপাধি দান করে খেলাফতে বসাচ্ছিলেন ঠিকই কথা, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই ছিলেন চরম বে-লিল্লাহ (শয়তান)।

জাঞ্জ বিদ্রোহঃ মুহতাদির সিংহাসনচ্যুতির পর তুর্কী নেতৃস্থানীয়গণ মুতাওয়াক্কিলের জীবিত পুত্রের জ্যেষ্ঠজনকে 'মুতামিদ' (৮৭০-৯২) উপাধি দান করে খলিফার পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজে দুর্বল প্রকৃতির মানুষ হলেও তাঁর ভ্রাতা বা সহযোগী মুওয়াফ্ফাক ছিলেন বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। মুতামিদের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা দক্ষিণ ইরাক ও দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যের নিগ্রো বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ 'মাজু বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। এটি আরম্ভ হয় মুতাজের রাজত্বকালে এবং ১৫ বছরকাল-ব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আফ্রিকা হতে আগত এই সকল নিগ্রো ক্রীতদাস দক্ষিণ ইরাকের জলাভূমি অঞ্চলে লবণ তৈরির কাজে নিযোজিত ছিল। হাজার হাজার নিগ্রো শ্রমিক নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অতি সামান্য আটা-সুজি ও

খেজুরের বিনিময়ে দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করত। এই সময়ে আলি-ইবন-মহম্মদ নামক জনৈক ব্যক্তি নিজেকে পারস্যবাসী ও হজরত আলি (রাঃ)-এর বংশধর বলে দাবি করে বসরার লবণ কারখানায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের মধ্যে প্রচারণা আরম্ভ করেন। তিনি ক্রীতদাসদের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে ও ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করলেন। তিনি নিজে ছিলেন একদিকে বলিষ্ঠ বক্তা ও বাগ্মী, অন্যদিকে সংগঠক ও পণ্ডিত। তিনি অতি উচ্ছ্বসিতভাবে ও ভাষায় সকলকে উৎসাহিত করলেন—নিঃসঙ্কোচ নিখিলের বুকে ঘোষণা করেছে কোরআন—'জাতির ভাগ্য জাতিরই হাতে, জাতি আনে উত্থান।' ৮ঃ৫৩, ১৩ঃ১১, ৫৩ঃ৩৯। তখন দূর-দূরান্ত হতে হাজার হাজার ক্রীতদাস তাঁর দলে এসে যোগদান করতে থাকল। কিন্তু অতিব দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর এহেন আন্দোলন কোন নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়নি। বরং তাঁর অনুচরগণ যথেচ্ছা ব্যবহার ও অনাচারের অনুমতি লাভ করে এমন একটি পথ ধরল, যার পরিণতি কোনদিনই ভাল হতে পারে না। যার জন্য দেশবাসী এই দলের নাম দিল 'খবীস' বা পিশাচ।

৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে তারা বসরা আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। অতঃপর তারা জলা অঞ্চলে 'মুখতারা' নামক একটি নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করে বিদ্রোহের কাজ চালাতে থাকে। ৮৭০ খ্রীস্টাব্দে তারা প্রধান সামুদ্রিক বন্দর উবুল্লা দখল করে। অচিরাৎ তারা সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আহওয়াজ শহর দখল করে। এই সময়ে তাদের শক্তি এতখানি বৃদ্ধি হয়েছিল যে তারা খলিফা কর্তৃক প্রেরিত সেনাবাহিনীকে একের পর এক পরাজিত ও বন্দী করে তাদেরকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। দক্ষিণ ইরাক ও দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যের বহু শহর তাদের অধিকারে আসে। তারা বসরা ও ওয়াসিত লুণ্ঠন করে খলিফার প্রাণকেন্দ্র দুর্গ বাগদাদের সতেরো মাইলের মধ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তখন অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর ও ভয়ানক ভেবেই খলিফার ভ্রাতা মুওয়াফ্ফাক বহু অর্থব্যয়ে এক বিশাল বাহিনী গঠন করে প্রাণপণ চেষ্টায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ৮৮১ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে মুওয়াফ্ফাক জাঞ্জগণকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে তাদের আদি দুর্গ মুখতারায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। ঐ দুর্গও দীর্ঘদিন অবরোধের পর ৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ আগস্ট মুখতারা অধিকৃত হয় ও বিদ্রোহী নেতা আলি নিহত হন। তখন অগণিত বন্দীকে উদ্ধার করে নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করা হয়। এই বন্দীদের মধ্যে বহু স্ত্রীলোকও ছিলেন। বিদ্রোহী নেতা আলি বাগ্মী ও পণ্ডিত হলেও তিনি তাঁর অনুচরবৃন্দের দ্বারা ঐ সমস্ত বন্দী স্ত্রীলোকদের প্রতি যে অনাচার ও অত্যাচার চালিয়ে ছিলেন তাতে তাঁকে নাস্তিক বিদ্রোহী নেতা বাবকের সঙ্গে তুলনা করলেও অন্যায় বা অত্যুক্তি করা হবে না। আমরা পূর্বেই বলেছি এই বিশাল আন্দোলন কোন নীতিভিত্তিক ছিল না।

উচ্ছৃংখলভাবে ও অত্যাচারে-অনিয়মে কোনদিনই সুশৃংখল সমাজব্যবস্থা স্থাপন করা যায় না। তাই জাঞ্জ আন্দোলনও ব্যর্থ হল।

আল-মুতাজিদ (৮৯২-৯০২ খ্রীঃ) ঃ

৮৯২ খ্রীস্টাব্দের মুতামিদের মৃত্যুর পর মুওয়াফ্ফাকের পুত্র মুতাজিদ খলিফা হলেন। তাঁকে দ্বিতীয় সাফফাহ্ বলা হয়; কারণ তিনি দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু-প্রায় আব্বাসী সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর আমলে আহমদ-ইবন-তুলুনের পুত্র খুমারাওয়াইহ বার্ষিক এক লক্ষ দিনার কর দানের বিনিময়ে মিশরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। খলিফা তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যা কাতরুননা-দাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। খলিফা ৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজধানী সামাররা হতে বাগদাদে স্থানান্তরিত করেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সৌর বছরের হিসাব মতো আন-নওরেজ-আল-মুতোদিদি বা মুতাদিদি নব-বর্ষের প্রবর্তন করেন।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ঃ মুতাদিদের খেলাফতকালে আফ্রিকায় ফাতেমীয়গণের অভ্যুত্থান ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতা কারমাতির আবির্ভাব ঘটে। এই কারমাতির অনুচরগণ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের নামে আরব, সিরিয়া ও ইরাকে লুঠতরাজ চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল। এমনকি তারা সমগ্র দেশে সন্ত্রাসের মাত্রা এমনভাবে বাড়িয়ে তুলল যে মনে হল সমগ্র মুসলিম জগতে ধ্বংস ও বিপর্যয় এসে গেল। দলনেতা হামদান কারমাতি ৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কুফার নিকটে দারুল-হিজরা নামক একটি আস্তা তৈরি করেন। এই আন্দোলনের মূলে আমরা দু শ্রেণীর মানুষকে দেখতে পাই—কৃষক ও শ্রমিক। কিন্তু এই আন্দোলন ঠিক পথে পরিচালিত না হওয়ায় আন্দোলন বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। কেননা আন্দোলনের কোন নীতি ছিল না। আন্দোলনের নামে লুঠতরাজ, অরাজকতা-উচ্ছৃংখলতা প্রকাশই ছিল আন্দোলনের সারবস্তু। আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক ছিল—নিরপরাধ জনসাধারণের ধন-মান-প্রাণ লুট। এই আন্দোলনের সঙ্গে খলিফা মামুনের খেলাফতের শেষের দিকের ও খলিফা মুতাসিমের খেলাফতের প্রথম দিকের (৮২২-৪২ খ্রীঃ) তস্কর ও নাস্তিক বাবক এবং খলিফা মুতামিদের (৮৭০-৯২ খ্রীঃ) খেলাফতের আলি-ইবন-মহম্মদের ব্যর্থ জাঞ্জ আন্দোলনের তুলনা করা যেতে পারে। কোন আন্দোলনই সঠিক পথে পরিচালিত না হওয়ায় কোনটিই সফল হয়নি। হামদান কারমাতির আন্দোলনও ব্যর্থ হল। আবু সাইদ আল-হাসান আল-জান্নাবি নামক হামদানের এক শিষ্যের নেতৃত্বে (৮৯৯ খ্রীঃ) পারস্যোপসাগরের পশ্চিম তীরে বাহরাইন নামক স্থানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাও করেন। আল-আসহসায় তাঁদের রাজধানীও স্থাপিত হয়। এই স্থান হতে তারা তাদের মূল উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজ ও ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হতে থাকল। তাদের শক্তি

ও সামর্থ্য এতদূর অগ্রসর হয়েছিল ৯০০ খ্রীস্টাব্দে তারা খলিফার এক বাহিনীকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু অতিব দুর্ভাগ্যের বিষয় এই আন্দোলনও নীতিভিত্তিক না হওয়ায় একদিন তা শিকড়-সহ উপড়িয়ে পড়ে গেল।

মুকতাফি (৯০২-০৮ খ্রীঃ) :

খলিফা মুতাদিদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুকতাফি খলিফা হলেন। তাঁর রাজত্বকালে মিশর সরাসরি খলিফার অধীনে আসে। গ্রীকদের সাথে যুদ্ধেও তিনি কৃতকার্য হন, কারমাতিদের সাথেও তাঁর একাধিক বার যুদ্ধ হয়। তাদের জিকরাওয়াইহ নামক এক নেতা কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ওঁৎ পেতে ধর্ম-ভীরু হজ্জযাত্রীদের যথাসর্বস্ব লুট করে নিত, এমনকি কোন কোন সময় তাদের প্রাণনাশ করতেও দ্বিধাবোধ করত না। তখন খলিফা তুর্কী সেনাপতি ওয়াসিককে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জিকরাওয়াইহ ওয়াসিকের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বন্দী হন। গুরুতর আহত অবস্থায় বাগদাদ পেঁছাবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হল। এইভাবে কারমাতি আন্দোলনও শেষ হয়ে গেল। মুকতাফির মৃত্যুর পর তাঁব ভ্রাতা মুকতাদি খলিফা হলেন।

খলিফা মুকতাদি (৯০৮-৩২ খ্রীঃ) :

মুকতাদি সর্বমোট ২৫ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর ১৩ জন মন্ত্রীর উত্থান পতন ঘটে। এঁদের কয়েকজনকে হত্যাও করা হয়। ইবন মুকলা নামক একজন উজির আরবী খুশখাতের (Calligraphy) জন্মদাতা। আবার একজন উজির আলি-ইবন-ঈসা দুবারে পাঁচ বছরের জন্য উজির নিযুক্ত হন। সেই দুর্নীতি ও অত্যাচারের যুগে তিনি উন্নত চরিত্র ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতায় রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। খলিফা মুকতাদির খেলাফতে আমরা তিনজন খলিফাকে এক সঙ্গে ইসলামি রাজত্বে খেলাফত চালাতে দেখলাম। উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীর শাসক খলিফা উবায়দুল্লাহ, স্পেনে তৃতীয় আব্দুর রহমান, বাগদাদে মুকতাদি। এইভাবে সর্বপ্রথম মুসলিম জগতে তিনজন খলিফা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আপন আপন অঞ্চলে খলিফা বলে স্বীকৃত হন। এই তিন দুর্বল খলিফার একজনেরও এমন কোন শক্তি ছিল না যে একে অপরকে বশ্যতা স্বীকার করান। কেননা তিনজনেই নামে মাত্রেই খলিফা ছিলেন. কেউ বা আপন দেহরক্ষীর অধীনে খলিফা, কেউ বা মন্ত্রীব অধীনে, কেউ বা আমলাদের অধীনে। দুর্বল খলিফা মুকতাদি তাঁর আপন দেহরক্ষীদের প্রধান মুনিসের ভযে প্রকম্পিত থাকতেন। শেষাবধি শেষ রক্ষাও করতে না পেরে দেহ-রক্ষী মুনিসকে আমীরুল উমারা উপাধি দান করে সাম্রাজ্য রক্ষীতে উত্তরণ করলেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যকে তাঁর হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হলেন। মুনিস ছিলেন একজন খোজা সম্প্রদায়ের মানুষ। এইবার মুনিস খালফাকে খাঁচার পাখিতে পরিণত করেন।

৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাজ্ঞী 'জো' মুকতাদিরের দরবারে দু'জন দূতকে প্রেরণ করেন। এই দূতগণ খলিফার দরবারে খুবই সম্মান লাভ করেন। এখানে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বন্দী মুক্তির কথাও হয়। মুনিসের তত্ত্বাবধানে সীমান্তে ১,২০০,০০ দিনার ব্যয়ে মুসলমান বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। পর বছর বাগদাদে মুকতাদারিয়া হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও রাজ্যের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি করা গেল না। তখন নিরুপায় খলিফা সৈনিকদের চাপে পড়ে তাদের বেতন বৃদ্ধি করতে না পারায় উজির ইবন কুরাতাকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু উজিরের এতে কোন কিছু করার ছিল না। রাজ্যের এই ডামাডোল অবস্থায় রাজমাতাও রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করতেন। তিনি প্রতি শুক্রবার দরবার করতেন এবং ফরমান ও আইন-কানুন জারি করতেন। কিন্তু দেহরক্ষী মুনিসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। একবার হতভাগ্য খলিফা মন্ত্রীদের কথায় মুনিসের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে মুনিসের লোকেরা খলিফাকে প্রাণদণ্ডের নামে হত্যা করে।

খলিফা কাহির (৯৩২-৩৪ খ্রীঃ)ঃ

বিগত খলিফার মৃত্যুর পর তাঁর এক ভ্রাতা কাহিরকে খলিফা করা হয়। তিনি একদিকে ছিলেন নিষ্ঠুর ও অন্যদিকে দুশ্চরিত্র। তাঁর রাজত্বকালে দু'দলের কলহে মুনিস প্রাণ হারালেন। পরে মুনিসের দলবল ক্রোধে অন্ধ হয়ে খলিফা কাহিরের চোখ উপড়িয়ে তাঁকে অন্ধকারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে। পরবর্তীকালে খলিফা কাহিরকে বাগদাদের পথে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ কবতে হয়। বড়ই দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম সাম্রাজ্যে এই প্রথম স্বয়ং একজন খলিফাকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা সংগ্রহ করতে হল। এখানেই প্রমাণ হয় তাঁদের চারিত্রিক অধঃপতন কতো দূরে নেমেছিল।

আর-রাদি বিল্লাহ্ (৯৩৪-৪০ খ্রীঃ)ঃ

অতঃপর তুর্কী আমীরগণ মুকতাদির পুত্র আর-রাদি বিল্লাহকে খলিফা মনোনীত করেন। তাঁর রাজত্বে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা প্রদেশগুলি একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। সুতরাং প্রদেশসমূহ হতে রাজস্ব আসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন উজিরগণ অর্থাভাবে শাসনকার্য চালাতে অক্ষম হলেন। এই সময়ের ঘটনা-বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক ইবনুজ জওজী বলেন—"ফারস আলি ইবন-বুওয়াইহের অধীনে চলে যায়, ইস্পাহান ও জিবাল হাসান ইবন বুওয়াইহের হাতে, জাজিরা হামাদানিকের হাতে, মিশর ও সিরিয়া ইখশাদিগণের হাতে, আনদালুস উমাইয়া আব্দুর রহমানের হাতে, খোরাসান সামানীদের অধীনে এবং তাবারিস্তান ও দায়লাম দায়লামীদের অধীনে চলে যায়। কেবল মদিনাতুস-সালাম খলিফার হাতে থাকল।

কিন্তু মদিনাতুস সালাম বাগদাদও খলিফার অধীনে থাকল না। কেননা

উজিরগণ অর্থাভাবে শাসনকার্য চালাতে অক্ষম হলে খলিফা মহম্মদ ইবন-রাইক নামক বসরা ও ওয়াসিতের শাসনকর্তাকে বাগদাদে আহ্বান করে তাঁকে আমীরুল-উমারা উপাধি দান করে সেনাবাহিনী ও রাজস্বের সর্বময় ক্ষমতা দান করা হয়। প্রকারান্তে খেলাফত তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। তখন হতে শুক্রবারের নামাজের খোতবায় খলিফার নামের সাথে তাঁর নামও যুক্ত হল। ৯৪০ খ্রীস্টাব্দে রাদির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসীয় যুগের প্রকৃত খেলাফতেরও মৃত্যু হল। এইজন্য তাঁকেই প্রকৃত শেষ খলিফা বলা হয়ে থাকে। তিনি জুম্মার নামাজে খোতবা নিজে পড়তেন। আমীর ওমরাহদের সাথে পরামর্শ করতেন, আলেম-উলেমাদের সাথে নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। গরিব-দীন-দুঃখীদের খবরা-খবর করতেন। যতদূর পেরেছিলেন আপন সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করার চেষ্টাও করেছিলেন। অবসর মতো সাহিত্য চর্চাও করতেন। তাঁর মূল্যবান কবিতাগুলি এখনও সুরক্ষিত আছে। তাঁর কবিতার মধ্যে গভীর ধর্মভাব, পার্থিব সকল বস্তুর নশ্বরতা, সকল কিছুই অস্থায়ী এইভাব তাঁর লেখার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি কোরআনের ৫৫ নং সূরা রহমানের ২৬-২৮ এই তিনটি আয়াত (বাক্য) অত্যন্ত ভালবাসতেন। যাদের ভাব অর্থ—'যা কিছু জগতে আছে সে ধ্বংসময়, তুমি শুধু বাকি রবে সর্বসারময়, মহত্ত্বে গৌরবে তুমি এত সুমহান, জগৎ জুড়িয়া দান, নাহি প্রতিদান।" মুসলিম-জাহানের গোরস্থানের বাঁধান কবরগুলিতে প্রায়ই এই কথাটি লেখা থাকে—কোথাও কোরআনের ভাষায়, কোথাও আপন আপন মাতৃভাষার ভাবানুবাদে। এই খলিফার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খলিফার পদমর্যাদাও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হল। আমিরুল উমারা হলেন সর্বময় কর্তা। তাঁর ইচ্ছামতোই খলিফাকে সিংহাসনে বসান হত ও সিংহাসন-চ্যুত করা হত।

মুত্তাকি (৯৪০-৪৪ খ্রীঃ)ঃ

খলিফা রাদির মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মুত্তাকি খলিফা হলেন। তাঁর সময় আমিরুল উমারা পদের জন্য ভীষণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। কেননা আমিরুল উমারা হওয়ার অর্থ খলিফার মুনিব বা মুরুব্বি বা মালিক হওয়া। নিষ্ঠুর তুর্কী আমিরুল উমারা তুজুন মুত্তাকিকে অন্ধ করে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং তাঁর ভ্রাতা মুস্তাকফিকে খলিফার পদে আসীন করেন।

পরবর্তী নামধারী খলিফাগণঃ

আল-মুস্তাকফি—৯৪৫-৪৬ খ্রীঃ	আল মুস্তাজিদ—১০৯৭-১১১৮ খ্রীঃ
আল-মুতি—৯৪৬-৭৪ খ্রীঃ	আল-মুস্তারশিদ—১১১৮-১১৩৪ খ্রীঃ
আত-তাই—৯৭৪-৯১ খ্রীঃ	আর-রশিদ—১১৩৪-১১৩৫ খ্রীঃ
আল-কাদির—৯৯১-১০৩১ খ্রীঃ	আল-মুক্তাফি—১১৩৫-১১৬০ খ্রীঃ
আল-কাইম—১০৩১-১০৭৫ খ্রীঃ	আল-মুসতানজিদ—১১৬০-১১৭০ খ্রীঃ
আল-মুকতাদি—১০৭৫-১০৯৪ খ্রীঃ	আল-মুসতাদি—১১৭০-১১৮০ খ্রীঃ

দ্বিতীয় পর্ব

আব্বাসীয়া খেলাফতের সময় স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

পশ্চিম অঞ্চল

উমাইয়া রাজত্বকালে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে খলিফার যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, আব্বাসীয় খেলাফতে তা বিঘ্নিত হয়। অর্থাৎ আব্বাসীয় খেলাফতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র খলিফার একক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাম্রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চলে যে সমস্ত স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়, সেগুলি প্রধানত ছিল আরব। এবং অনুরূপভাবে পূর্ব অঞ্চলে যেগুলির উদ্ভব হয়, সেগুলি ছিল—পারসী বা তুর্কী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

পশ্চিমাঞ্চলের স্বাধীন রাজবংশগুলি ঃ

স্পেন ঃ ৭৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল আব্বাসীয়গণ দামেস্ক অধিকারের ঠিক ছ' বছর পর ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ মে উমাইয়া বংশের খলিফা হিশামের পৌত্র যুবরাজ আব্দুর রহমান স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য ষষ্ঠ পর্ব দ্রষ্টব্য।

প্রথম শিয়া রাজবংশ ঃ ইমাম হাসানের প্রপৌত্র ইদ্রিস ইবন-আব্দুল্লাহ ৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে মদিনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে মরক্কোতে পলায়নপূর্বক সেখানে একটি স্বাধীন শিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম শিয়া রাজবংশ। দু' শতাব্দী ধরে (৭৮৮-৯৭৪) ইদ্রিসী বংশ নামে অভিহিত এই রাজবংশ ফাস (ফেজ) হতে রাজত্ব করতে থাকে। স্পেনের খলিফা দ্বিতীয় হাকাম কর্তৃক এই বংশের পতন ঘটে।

আগলবী বংশ ঃ ইদ্রিসী বংশ যেমন উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে সুন্নীগণ আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে আগলবী বংশের প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে রাজ্য চালান। খলিফা হারুণ-আর-রশিদ ৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহিম ইবন আগলবকে ইফ্রিকিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই বংশের শাসনকর্তাগণ আপনাদের জন্য আমীর উপাধিকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁরা এক শতাব্দীর অধিককাল (৮০০-৯০৯) কায়রোওয়ান রাজধানী হতে ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিজেদের চরম আধিপত্য বিস্তার করে শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে ইতালি, ফ্রান্স, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়ার উপকূলে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ৯০২ খ্রীস্টাব্দে সিসিলি অধিকৃত হয়। এই যুগেই মুসলমানগণ তাঁদের অপ্রতিহত শক্তি দ্বারা মালটা ও সার্ডিনিয়া অধিকার করেন। এথেন্স প্রাপ্ত তিনটি শিলালিপি হতে জানা যায়—সেখানেও আরব আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। এই বংশের জিয়াদাতুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ইব্রাহিম কায়রোওয়ানের বিখ্যাত শাহী মসজিদ নির্মাণ করেন। এই সময় এই অঞ্চলে আরব প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতখানি প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, আগলবী শাসন

আমলে ইফ্রিকিয়া ল্যাটিন ভাষাভাষী খ্রীস্টদেশ হতে আরবী ভাষাভাষী মুসলমান দেশে রুপান্তরিত হয়। আগলবী বংশের তৃতীয় জিয়াদাতুল্লাহ ৯০৯ খ্রীস্টাব্দে ফাতেমীয়দের আগমনের ফলে পলায়নপর হলে তিনিই আগলবী বংশের শেষ আমীর বলে পরিগণিত হন।

তুলুনী বংশ ঃ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমদ ইবন তুলুন। তিনি ছিলেন তুর্কী। ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মিশরের গভর্নরের সহকারী হিসাবে বাগদাদ হতে মিশরে গমন করেন। আপন যোগ্যতার বলে সেখানে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে স্বাধীনভাবে শাসন আরম্ভ করেন। ৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার গভর্নরের মৃত্যু হলে তিনি বিনা বাধায় সিরিয়া দখল করে মিশরের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন হতে বহু শতাব্দী পর্যন্ত সিরিয়া মিশরের অধীনে থাকে। আহম্মদ ছিলেন একজন বিচক্ষণ সুশাসক। তাঁর শাসনকালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি হয়। তিনি সেচব্যবস্থার জন্য ক্যানেল বা খাল কাটার ব্যবস্থা করেন। যার ফলে দেশে উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণের রোগ নিরাময়ের জন্য বিমারিস্থানের (হাসপাতাল) ব্যবস্থা করেন। মিশরের জামে মসজিদ তাঁরই কীর্তি। পরবর্তীকালে আহমদের পুত্র খুমারাওয়াইহ তুলুন একটি সুবর্ণ রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে তার প্রাচীরগাত্রে নিজের ও পরিবারের অন্যান্য লোকের ছবি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। এটি হতে তাঁর শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রাসাদের চারিদিকে ছিল মনোরম সুগন্ধময় ফুলের বাগান। উদ্ভিদজগৎ হতে প্রাণিজগতের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম ছিল না। তিনি একটি পশুশালা ও পক্ষীশালা স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর কার্যের দ্বারা একজন সুরুচিবান পুরুষের পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি খলিফা মুতাদিদের সাথে তাঁর মেয়ে পরমাসুন্দরী কাতরুন্নাদার (শিশির কণা) বিবাহ দেন। এবং বংশের চতুর্থ শাসক শায়বানের সময় মিশর পুনরায় আব্বাসীয়দের শাসনাধীনে চলে যায়।

ইখশিদী বংশ ঃ তুলুনী বংশের পর ইখশিদী নামক আর একটি তুর্কী বংশের সিরিয়া ও মিশরে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —মহম্মদ ইবন তুগজ। তিনি ৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে খলিফা রাদির নিকট হতে ইরানী 'ইখশিদ' উপাধিপ্রাপ্ত হন। ইখশিদ পরবর্তীকালে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের ওপর নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। পরে মক্কা ও মদিনাও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহম্মদ ইবন তুগজ ইখশিদের দুই পুত্রের শাসনকালে হাবসী খোজ কাফুরই সকল ক্ষমতার প্রকৃত মালিক হন। তিন অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে মিশর ও সিরিয়াকে হামদানিফের আক্রমণ হতে রক্ষা করেন। ৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে শেষ ইখশিদী শাসক আবুল 'কাওয়ারস' আহমদ ফাতেমীয় সেনাপতি জওহরের হাতে পরাজিত হলে তাঁর রাজ্য ফাতেমীয়দের হস্তগত হয়। ফলে ইখশিদী বংশ এখানেই লোপ পায়।

হামদানি বংশ ঃ হামদানি বংশের প্রথম উদ্ভব মেসোপটেমিয়ায়। রাজধানী ছিল মসুলে। এঁবা গোত্রে ছিলেন শিয়া। ৯০৪ খ্রীস্টাব্দে আব্দুল্লাহ ইবন হামদান মসুলের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে এই বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ফলে এই বংশেব আরো অনেকে উত্তর মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হন। আব্দুল্লাহ তাঁর পুত্র হাসানকে মসুলে তাঁর সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত কবেন। তাঁর অপর এক ভ্রাতা আলি ৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ইখশিদীগণের নিকট হতে আলেপ্পো ও হিমস দখল করে সেখানে প্রায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। বাগদাদে বুখাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে দুঃসাহসিক ক্ষমতার যুদ্ধ আরম্ভ হযেছিল, তখন হাসান ও আলি বাগদাদ দখল করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তখন খলিফা মুত্তাফী হাসানকে আমীরুল উমারা নিযুক্ত করেন। হাসান এবং আলি খলিফা কর্তৃক নাসিরুদ্দৌল্লাহ ও সায়ফুদ্দৌল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু তুর্কী আমীর তুজন হামদানি ভ্রাতৃদ্বয়কে বাগদাদ হতে বিতাড়িত করেন। ৯৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে দিয়ার বকর, দিয়ার বরীয়া ও দিয়ার মুদার বুয়াইয়া আদুদ্দৌল্লাহ কর্তৃক অধিকৃত হয়। তখন সায়ফুদ্দৌল্লাহর পৌত্র সাইদুদ্দৌল্লাহ ১০০৩ খ্রীস্টাব্দে ফাতিমীগণের অধীনতা স্বীকার করেন। এই হামদানি বংশের আলি সায়ফুদ্দৌল্লাহ গ্রীকদের সাথে যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্য শাসক ছিলেন।

তিনি কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর রাজসভাতে সে-যুগেব জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের সমাবেশ দেখা যায়—যেমন দার্শনিক আল-ফারাবি, সাহিত্যিক আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানি, বিশ্ববিখ্যাত পর্যটন ইবন বতুতা, মহাকবি মুতান্নাবি ও হামদানি প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ইস্পাহানি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল আগানী' সায়ফুদ্দৌল্লার অনুপ্রেরণাতেই রচনা কবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব অঞ্চল

তাহিরী বংশ ঃ খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সময় তাঁর অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি তাহির ইবন হুসাইন কর্তৃক পূর্বাঞ্চলের খোরাসানে প্রথম স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। সেনাপতি তাহির এক চক্ষুবিশিষ্ট মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর যোগ্যতা ছিল অতি অসাধারণ। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যেভাবে তাঁর দু' হস্তকেই পরিচালনা করতে পারতেন, তা বিস্ময়কর ছিল। সেইজন্য খলিফা মামুন তাঁকে 'সব্যসাচী' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে ৮২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে বাগদাদের পূর্ববর্তী সকল অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ নিশাপুর হতে পাক-ভারত সীমান্ত পর্যন্ত কার্যত স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। ৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সাফফারী বংশের ইয়াকুব তাঁদের রাজ্য অধিকার করে নেন।

সাফফারী বংশ ঃ এই বংশের ইয়াকুব ছিলেন পেশাগত সাফফার বা কর্মকার বা তাম্রকার। তিনি সিজিস্হানের একদল দস্যুশ্রেণীর মানুষের নেতা হিসাবে অনেক দুঃসাহসিক ও সংগঠনমূলক কাজে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিলে সিজিস্তানের গভর্নর তাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। পরে আপন যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে গভর্নর পদেও নিযুক্ত হন। এইভাবে শিরাজ-সহ হিরাত ও ফারস দখল করেন। ৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ইয়াকুব খোরাসান দখল করে বাহুশক্তি বৃদ্ধি করেন। অতঃপর তিনি তাবারিস্থানে একটি যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করে হজরত আলি (রাঃ) বংশের হাসান ইবন জায়েদকে পরাজিত করে স্বয়ং খলিফা মুতামিদের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর তিনি শিরাজ ও আহওয়াজ অতিক্রম করে সরাসরি বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু খলিফার ভ্রাতা মুওয়াফফাক কর্তৃক পরাজিত হন। ৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইয়াকুব পরলোকগমন করলে তাঁর ভ্রাতা উত্তরাধিকারী আমর কর্তৃক খোরাসান, ফারস, কুর্দিস্হান ও সিজিস্হানের শাসনকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু ইয়াকুবের বাগদাদ আক্রমণের অভিপ্রায়ের সময় হতেই খলিফা এই সাফফারী বংশকে সুনজরে দেখছিলেন না। ফলে ৯০০ খ্রীস্টাব্দে স্বয়ং খলিফা সামানী বংশের ইসমাইলকে সাফফারী রাজ্য আক্রমণ করতে ইন্ধন জোগালে উভয়পক্ষের ভীষণ সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে আমর পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর কিছুদিন পর্যন্ত সাফফারী বংশের শাসন সিজিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকে।

সামানী বংশ ঃ বলখের অধিবাসী সামান নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অগ্নি-উপাসকের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বংশধর

সুদীর্ঘ ১২৫ বছর যাবৎ ট্রান্সক্সিয়ানা ও পারস্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। সামানের পৌত্র নাসর (৮৭৪-৮৯২) এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নাসরের ভ্রাতা ইসমাইল (৮৯২-৯০৭) সাফফারীগণের নিকট হতে খোরাসান দখল করে 'দশত কবীর' (বৃহৎ পারস্য মরুভূমি) হতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত এবং পাক-ভারত সীমান্ত হতে বাগদাদের নিকট পর্যন্ত অঞ্চলে তাঁরা ক্ষমতা বিস্তার করেন। দ্বিতীয় নাসরের সময় (৯১৩-৪৩) গুবগণ, তাবারিস্থান ও রাই অঞ্চলও সামানীদের অধিকারে আসে। সামানীগণ খলিফার আনুগত্য স্বীকার করলেও মূলত স্বাধীন ছিলেন।

সামানীগণ শুধু যে রাজ্য সম্প্রসারণেই মত্ত ছিলেন, তা নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকেও তাঁরা যথেষ্ট মূল্য দিয়েছিলেন। সামানীদের রাজধানী বুখারা ও প্রাচীন নগরী সমরকন্দ মুসলিম সভ্যতার গৌরবময় প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। সমরকন্দ ও বুখারা তদানীন্তন বিশ্বে জ্ঞানীদের তীর্থস্থানে পরিগণিত হয়েছিল, যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এই দুটো শহর ইতিহাস-বিখ্যাত বাগদাদকেও ম্লান করে দিয়েছিল। এই অঞ্চলে আরবী-ফারসীর চর্চা সমভাবেই চলতে থাকে। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ আর-রাজি তাঁর অমূল্য গ্রন্থ আল-মনসুরী এই বংশের একজন যুবরাজ আবু-সালিহ মনসুরের নামে উৎসর্গ করেন। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ইবন সীনা এই বংশের শাসক দ্বিতীয় নুহ (৯৭৬-৯৭) কর্তৃক অত্যন্ত সমাদরের সাথে বুখারায় আমন্ত্রিত হয়ে সেখানকার সুবিশাল গ্রন্থাগারে আপন জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করেন। সমগ্র ইসলাম জগতের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তি এবং হাদিস শাস্ত্রের প্রবাদ পুরুষ 'ইমাম বুখারী' এই বুখারারই স্বনামধন্য পণ্ডিত।

পরে সামানীদের রাজ্যের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বুয়াইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামানী বংশের ক্ষমতা খর্ব হতে থাকে। অন্যদিকে, পারসিক সামানীগণ তুর্কী সেনাদের নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীস্থানের ইলকখান বুখারা দখল করেন। যক্ষু নদীর উত্তর অঞ্চলে ও দক্ষিণাঞ্চলে গজনবী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সামানী বংশের শাসনাবসান ঘটল।

জিয়ারী বংশ ঃ এই শিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মারদাবীজ ইবন জিয়ার। তিনি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে তাজাকিস্থানে ও গুর্গাওঁয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রায়, হামদান ও ইস্পাহান দখল করেন। বুয়াইয়া ভ্রাতৃদ্বয় আলি ও হাসান, যাঁরা পরে খলিফা কর্তৃক ইমাদুদ্দৌল্লাহ ও রুকনুদ্দৌল্লাহ উপাধি লাভ করেন, তাঁরা উভয়েই শিয়া মারদাবীজের অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত হন, যখন মারদাবীজকে অধিকাংশ আপন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য একাধারে সামানীগণ ও খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। মারদাবীজের একান্ত ইচ্ছা ও কামনা ছিল খলিফার নিকট হতে বাগদাদ দখল করে পুনরায় ওখানে পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন করা। কিন্তু তিনি তাঁর অগণিত অবাধ্য তুর্কী

সেনার মন জয় করতে না পারায় সেনাবাহিনীর কিছু বিশ্বাসঘাতক ৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে মারদাবীজকে শোচনীয়ভাবে হাম্মামখানায় হত্যা করে। এইভাবে ঘরে-বাইরে পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল হওয়ায় হতভাগ্য পরলোকগত মারদাবীজের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকার ওয়াশমাগীর বাধ্য হয়েই সামানীগণের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁদের সাথে একটা গোপন চুক্তি সম্পাদিত করে তাঁদের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতায় বুয়াইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু এটি সত্ত্বেও তাঁর রাজ্য তাবারিস্থান ও গুর্গাওঁয়েই সীমাবদ্ধ থাকল। পরবর্তীকালে ওয়াশমাগীর পুত্র বিপন্ন পরিস্থিতিকে অনুকূলে পাওয়ার জন্যই বুয়াইয়া আজুদুদ্দৌলাহ সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিয়ে মৈত্রী স্থাপন করেন। কিন্তু পরিণতি খুব একটা ভাল হল না। তাই বিস্তুনের পুত্র কাবুসের সঙ্গে বুয়াইয়াদের বাধল সংগ্রাম। কাবুস পরাজিত হয়ে খোরাসানের সামানী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৮ বছর পর তিনি পুনরায় গুর্গাওঁয়ে প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে বিস্তুনের আশ্রয়দাতা সামানী আমীর আল-মুনতাসির ইলকখান কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে একদিনের তাঁর আশ্রিত কাবুসের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তখন কাবুস তাঁর পরিণত বয়সে পুত্র মিনুচিহারের নিকট শাসনভার অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করেও নিস্তার বা নিষ্কৃতি পেলেন না। তাঁকেও ১০১২ খ্রীস্টাব্দে বিক্ষুব্ধ সেনাদল নিহত করে।

কাবুস আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত মনীষী আবু রায়হান আল-বেরুনি কাবুসের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আসার' কাবুসের নামে উৎসর্গ করেন। কাবুসের পুত্র মিনুচিহার ও পৌত্র আনুশিরওয়ান গজনীর সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করে গুর্গাওঁয়ে ও তাবারিস্থানে রাজত্ব করতে থাকেন। সুলতান মহম্মদ মিনুচিহারের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দেন। একদিন সুলতান মাহমুদের ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে কাব্য জগতের প্রবাদপুরুষ 'শাহনামার' রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসী এই মিনুচিহারের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেলজুকদের শাসন উক্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বংশের শাসকগণ গুর্গাওঁয়ের পার্বত্য অঞ্চলের সামান্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক হিসাবে ১০৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হাসান সাবা কর্তৃক এই বংশের অবসান ঘটে। কায়ফাউস নামক একজন শাসক তাঁর পুত্র গিলান শাহের জন্য ১০৮২ খ্রীস্টাব্দে 'কাবুসনামা' নামে একটি উপদেশগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তৎকালীন সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা বিস্তারিতভাবে জানা যায়। তাই এটি একটি মূল্যবান সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থ।

গজনবী বংশ ঃ যে সমস্ত তুর্কী মমলুক (ক্রীতদাস) সামানীদের অধীনে উচ্চপদে কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আলপ্তগীন ছিলেন অন্যতম। তিনি সামানীদের সামান্য দেহরক্ষী হিসাবে যোগদান করে আপন যোগ্যতা বলে প্রধান

দেহরক্ষী হতে খোরাসানের গভর্নর পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সামানী শাসনকর্তাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হলে তিনি খোরাসানের গভর্নরের পদ ত্যাগ করে ৯৬২ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্তানের গজনী অধিকার করে তথায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গজনবী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলতে আলপ্তগীনের মমলুক (ক্রীতদাস) ও জামাতা সবুক্তগীন। এই বংশের ষোলজন উত্তরাধিকারী সকলেই ছিলেন এই সবুক্তগীনের বংশধর বা অধস্তন পুরুষ। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সবুক্তগীনের দিগ্বিজয়ী পুত্র সুলতান মাহমুদ (৯৯৯-১০৩০)।

সুলতান মাহমুদ ঃ সুলতান মাহমুদ সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। একাধারে তিনি দিগ্বিজয়ী বীর, সুশাসক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের খুবই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি যক্ষু নদীর দক্ষিণ তীরে সামানী বংশের অবসান ঘটিয়ে বুয়াইয়াদের নিকট হতে কালবিলম্ব না করে গুর্গাওঁয়ের জিয়ারী শাসককে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। এইভাবে সুলতান মাহমুদ তাঁর চতুর্পার্শ্বস্থ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশগুলিকে একের পর এক গ্রাস করে সেখানকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সফল চেষ্টা করেন। এবং তাঁর চেষ্টাও সফলতা লাভ করে। পার্শ্ববর্তী সকল বিঘ্নের অবসান ঘটলে এবার তিনি দৃষ্টি দিলেন বাগদাদের খলিফার দিকে। তখন বাগদাদের খলিফার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন আল-কাদির বিল্লাহ। সুলতান মাহমুদ খলিফার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করে একটি পত্র প্রেরণ করলে খলিফা আনন্দের সাথে তাঁকে 'ইয়ামীনুদ্দৌল্লাহ' ও 'আমিনুলমিল্লাহ' উপাধি দান করেন। কথিত আছে—সুলতান মাহমুদ ১০০১ ও ১০২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ১৭ বছরে ১৮ বার ভারত আক্রমণ করেন। এবং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গজনী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিশ্বের খ্যাতনামা সমরনায়কদের একজন ছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা ছিল—পূর্বে পাঞ্জাব, পশ্চিমে রায় ও গুর্গাওঁ, উত্তরে বলখ, খোরাসান ও ট্রান্সক্সিয়ানার অংশবিশেষ ও দক্ষিণে সিজিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। সুলতান মাহমুদ যে শুধু রাজ্যসীমার বিস্তৃতি ও ধনরত্ন সংগ্রহেই ব্যস্ত ছিলেন তা নয়। তিনি শিল্পেরও সমাদর করতেন। গজনীকে তিনি একটি সুরম্য শহরে পরিণত করে মনোরম রাজপ্রাসাদে শোভিত করে তোলেন। শিক্ষা সম্পর্কেও তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর রাজধানী গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করে শিক্ষানুরাগীরও পরিচয় রেখে যান। তিনি উদার হস্তে জ্ঞানী ও গুণীজনের সমাদর করায় মধ্য এশিয়ার নানা প্রান্ত হতে বহু কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পন্ডিতগণ তাঁর রাজদরবারকে জ্ঞানী ও গুণীর দরবারে পরিণত করেন। বিশ্ববিখ্যাত 'শাহনামা' মহাকবি ফেরদৌসী কর্তৃক তাঁরই দরবারে রচিত হয়। মহাকবি আসজাদী ও ফারুকী তাঁর সভাকবি ছিলেন। ঐতিহাসিক বায়হাকী ও উৎবী, দার্শনিক আল-ফারাবি,

জগদ্বিখ্যাত পর্যটক মনীষী আল-বেরুনি প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁর সভাকে করেছিলেন ধন্য। তাঁর রাজ্যে সুখ-শান্তি বিরাজ করেছিল। কোথাও শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে দেননি। তিনি যেমন ছিলেন সম্রাট, তেমনি ছিলেন শাসক। সুদূর খোরাসান হতে লাহোর পর্যন্ত মানুষ দিবা-রাত্রি নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করতে পারত। সুলতান মাহমুদের জীবনে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন গোলাপের মতো ফুটে উঠেছিল। তাই শাসক মাহমুদ, রাজনীতিবিদ মাহমুদ, শিক্ষাদরদী মাহমুদ ও শিল্প-অনুরাগী মাহমুদ, সংগঠক মাহমুদ বিশ্বের নেতৃস্থানীয় রাজা-বাদশাদের অন্যতম। কালক্রমে সেলজুকদের অভ্যুত্থানের ফলে মধ্য এশিয়ায় গজনবী বংশের ক্ষমতার অবসান ঘটে। পশ্চিমাঞ্চলে গজনবী বংশের হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বল হয়ে পড়েন। গজনবী বংশের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পূর্ব অঞ্চলে ও আফগানিস্তানে ঘোর বংশীয়গণের অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানের ফলে আফগানিস্তানেও গজনবী বংশের পতন ঘটে। ফলে ১১৮৬ খ্রীস্টাব্দে শেষ গজনবী সম্রাট খসরু মালিক মহম্মদ ঘোরীর নিকট পরাজিত হলে এই বংশের চিরপতন ঘটে। দু'শ বছরের অধিককাল পর্যন্ত গজনবী বংশধরগণ এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে সগৌরবে রাজত্ব করেন।

আব্বাসীয় খেলাফতের সময় এইভাবে কতকগুলি স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব ঘটেছিল। তদানীন্তন আব্বাসীয় খলিফাগণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন রাজবংশগুলি কখনও খলিফার নিকট অনুগ্রহপূর্বক আনুগত্য দেখিয়ে, কখনও বা সামান্য মনগড়া খেলাত পাঠিয়ে স্বাধীনভাবে আপন আপন রাজ্য পরিচালনা করতেন। এই রাজবংশগুলির সাধারণত একের পতনে হত অন্যের উত্থান। তাই তাঁদের মধ্যে উত্থান-পতনের লড়াই অবিরাম চলত। এই স্বাধীন রাজবংশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রূপ নিয়েছিল—বুয়াইয়া ও সেলজুক বংশ।

তৃতীয় অধ্যায়

বুয়াইয়া বংশ (৯৪৪-১০৫৫ খ্রীঃ)

অভ্যুত্থান—আবু সুজা বুয়াইয়াঃ আব্বাসীয় খেলাফতে যে কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়ের সূচনা করে শিয়া-মতাবলম্বী বুয়াইয়া আমীরদের অভ্যুত্থান। আবু সুজা দশম শতাব্দীতে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরের পর্বত অঞ্চল দাইলামের উপজাতিদের নেতৃত্ব দান করে সাসানীয় রাজবংশের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে প্রাচীন সাসানীয় বংশের উত্তরাধিকারিত্ব দাবি করে 'বুয়াইয়া' উপাধি ধারণ করে স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। আবু সুজার সুযোগ্য তিন পুত্র আহমদ আলি ও হাসান দক্ষিণ দিকে অভিযান পরিচালনা করে ৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে সিরাজ, ইস্পাহান ও পরবর্তীকালে কিরমান, খুজিস্থান প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। অধিকৃত অঞ্চলগুলির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় সিরাজে। অতঃপর আহমদ ইবন আবু সুজা বুয়াইয়া ৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদ অভিমুখে অভিযান করলে বাগদাদের বিশ্বাসঘাতক, ভীরু দেহরক্ষক ও প্রহরী সৈনিকগণ খলিফাকে পরিত্যক্ত করে পলায়ন করলে তদানীন্তন বাগদাদ খলিফা মুসতাফি (৯৪৪-৪৬ খ্রীঃ) সেনাবাহিনীর এই বিশ্বাসঘাতকতায় চরম আঘাত পেয়ে ও তাঁদের ঔদ্ধত্যে এবং দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়েই খেদে ও ক্ষোভেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার নিমিত্ত অভিযানকারী আহমদকে নিজেই রাজধানীতে আহ্বান করেন। আহমদ এই অপূর্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কালবিলম্ব না করে বাগদাদে প্রবেশ করা মাত্রই ৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে খলিফাকে একেবারেই শক্তিহীন ক্রীড়নকে পরিণত করে পিতা আবু সুজা বুয়াইয়ের নামানুসারে বংশের নামকরণ করলেন—'বুয়াইয়া বংশ'।

মুইজ-উদ-দৌলাহ (৯৪৫-৬৭) আমীর-উল-উমারাহ ঃ

খলিফা বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদকে মুইজ-উদ-দৌলাহ উপাধিতে ভূষিত করে আমীর-উল-উমরাহ পদে অধিষ্ঠিত করলেন। এবং অপর দুই ভ্রাতা আলি ও হাসানকে যথাক্রমে 'ইমদাদ্দৌলাহ' ও 'রুকনুদ্দৌলাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। খলিফা আহমদের আক্রমণে বেইমান অপদার্থ বিশ্বাসঘাতক তুর্কী সেনাদের হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়ে যেমন একদিকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, অপরদিকে তেমনি বুয়াইয়াদের প্রভাবাধীনে সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি হারিয়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠলেন। শিকার যেন বাঘের কবল হতে সিংহের কবলে পতিত হল। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পারসিক বুয়াইয়াগণ আরব সুন্নী সম্প্রদায়ের ওপর যথেষ্ট প্রভুত্ব আরম্ভ করলে সুন্নী সম্প্রদায় বড়ই বিব্রত বোধ করতে থাকল। খলিফার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুইজ-উদ-দৌল্লাহ রাজধানীতে অবস্থান করে শুধুমাত্র সমস্ত শক্তিকে গ্রাস করলেন না, বরং খলিফার সার্বভৌমত্বকেও খর্ব করে গ্রাস করে নিজে সুলতান উপাধিও গ্রহণ করে মুদ্রায় নিজ নাম অংকিত করলেন, জুম্মার

খোতবায় আপন নামকে উল্লেখ করতে বাধ্য করলেন। এই পর্যায়ে খলিফা অস্বস্তি বোধ করতে থাকায় বিশ্বাসঘাতক, ক্ষমতালোভী ও অবিবেচক আহমদ তাঁকে চিরতরে বিদায় দেওয়ার জন্য ৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে হতভাগ্য খলিফা মুসতাকফীকে অন্ধ করে চির বিদায় দিয়ে বিগত অষ্টাদশ খলিফা আল-মুকতাদিরের পুত্রকে 'আল-মুতি' (৯৪৬-৭৪ খ্রীঃ) উপাধি দান করে সিংহাসনে বসালেন। এইভাবে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সুন্নী গোত্র হতে শিয়া গোত্রে হস্তান্তরিত হলে সুচতুর আহমদ শিয়া সম্প্রদায়ের পূর্ণ সহানুভূতি লাভের আশায় ১০ই মহররমকে শিয়াদের জাতীয় বাৎসরিক শোক দিবসে পরিণত করে একে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাও দান করেন। অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"শিয়া সম্প্রদায়ের হাতে খেলাফতের হীন ও জঘন্য অধ্যায়ের সূচনা হল। এবং ক্ষমতালিপ্সু বুয়াইয়াগণ শত বছরব্যাপী স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে আব্বাসীয় খলিফাকে সাক্ষীগোপালে পরিণত করল।" খলিফা দৈনিক ৫০০ দিনার বৃত্তি পেয়ে আমীর-উল-উমরার অনুগৃহিত ও আশ্রিত হলেন। মুইজ-উদ-দৌলাহ বাগদাদ নগরীর হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করে সিরাজ, গজনী, কায়রো, কর্ডোভা প্রভৃতি নগরগুলিকে মুসলিম শাসনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। ৯৪৫-১০৫৫ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত বুয়াইয়া আমীরগণ সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আপনাদের বংশের স্বার্থে, কোথাও বা আপন খেয়াল-খুশিমতো খলিফাকে অধিষ্ঠিত ও অপসারিত করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নানা সুষমামণ্ডিত রাজপ্রাসাদে বসবাস করতে থাকেন। এইগুলির নাম ছিল—দার-উল-মামলকা', 'দার-উস-সালাম' প্রভৃতি। ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তাঁরা নিষ্ঠুর ও নির্মমতার পরিচয় দিলেও বুয়াইয়া শাসকগণ শিক্ষা ও শিল্পানুরাগীও ছিলেন।

ইজ-উদ-দৌলাহ (৯৬৭ খ্রীঃ):

মুইজ-উদ-দৌলাহর (আহমদ) মৃত্যুর পর ৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পুত্র বখতিয়ার ইজ-উদ-দৌলাহ উপাধি গ্রহণ করে আমীর-উল-উমারা পদে অধিষ্ঠিত হন। আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতি (৯৪৬-৭৪ খ্রীঃ) প্রায় ত্রিশ বছর বুয়াইয়াদের নাগপাশে খলিফার নামে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ থেকে অসুস্থ অবস্থায় পুত্র আত-তাইকে ৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে খেলাফত দান করেন। একবার ইজ-উদ-দৌলাহ আল-মুতির খেলাফত কালে একদল তুর্কী কর্তৃক বিপদগ্রস্ত হলে তাঁর পিতৃব্য পুত্র অজুদ-উদ-দৌলাহ তাঁকে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিপন্মুক্ত করেন। এই বিপন্মুক্ত করার পরবর্তী ইতিহাস বড়ই করুণ ও মর্মান্তিক। বিপন্মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই অজুদ-উদ-দৌলাহ ইজ-উদ-দৌলাহকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ অমান্য করলে নির্দেশদাতা তাঁকে অপমানজনক ভাবে পদচ্যুত করেন এবং পিতার (হাসান-রুকনুদ্দৌলাহ) একান্ত অনুরোধকেও উপেক্ষা করেই তাঁকে হত্যাও করলেন।

উচ্চাভিলাষী অজুদ-উদ-দৌলাহ এবার নির্বিঘ্নে আমীর-উল-উমারা পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আপন মনোবাঞ্ছাকে চরিতার্থ করার পথকে বেছে নেন।

অজুদ-উদ-দৌলাহ (৯৬৭-৮৩ খ্রীঃ)ঃ হাসান রুকনুদ্দৌলাহর পুত্র অজুদুদ্দৌলাহ প্রথম জীবনে তাঁর পিতৃব্য আলি-ইমাদুদ্দৌলাহর অধীনে ফরাসের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরে তিনি তাঁর পিতৃব্য মুইজদুদ্দৌলার পুত্র বখতিয়ারকে পরাজিত করে তাঁর নিকট হতে ইরাক দখল করেন। আজুদের ভ্রাতা মুয়াইয়িদুদ্দৌলাহ তাঁর পক্ষে জিবাল, রায় ও ইস্পাহান শাসন করতেন। তিনি কুর্দিস্তানের বিদ্রোহী নেতাগণকে পরাজিত করে ঐ অঞ্চল আপন অধিকারে এনে শান্তি স্থাপন করেন। এইভাবে তিনি উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর হতে দক্ষিণে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত এবং পূর্বে বৃহৎ পারস্য মরুভূমি (দাশতকারির) হতে পশ্চিমে ফুরাত নদী পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে আপন ক্ষমতা বিস্তার করেন। অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"অজুদ-উদ-দৌলাহর সময়েই বুয়াইয়া শক্তি সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়।" ঐতিহাসিক আরনল্ড বলেন—"বুয়াইয়া রাজ্য গৌরবের উচ্চ শিখরে উপনীত হল। ৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাস্পিয়ান সাগর হতে পারস্যোপসাগর এবং ইস্পাহান হতে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের অধিপতি হন। ক্রমশ তিনি ইরাকে প্রাধান্য কায়েম করে পরে বাগদাদের খলিফার প্রভু হলেন।" খলিফা আত-তাই অজুদকে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা সমর্পণ করে বলেন—"আল্লাহ্ আমার হাতে যে সকল কর্তব্য ন্যস্ত করেছেন, তার সমুদয় আমি আপনাকে সমর্পণ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি; অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্বে ও পশ্চিমে আমার সকল প্রজাবর্গের সকল ব্যাপারে সকল ব্যবস্থাপনা আপনি গ্রহণ করবেন। শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত মান-মর্যাদা, সম্পত্তি, মালমাত্তা ও গৃহাভ্যন্তরের জিনিসপত্রগুলি ব্যতীত অন্য সকল কিছু আপনাকে অর্পণ করলাম।"

শাহানশাহ, নজিরবিহীন বিবাহঃ অজুদ-উদ-দৌলাহ ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন অতিব অধ্যবসায়ী, কর্মদক্ষ এবং উচ্চাভিলাষী। জীবনের পরবর্তীকালে তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ বুয়াইয়া আমীরই ছিলেন না, তদানীন্তনকালের একজন বিখ্যাত শাসকও ছিলেন। ইরাক ও পারস্যে ছড়িয়েছিল বুয়াইয়া আমীরদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি, যেগুলিকে তিনি একত্রিত করে খলিফা হারুণের ন্যায় একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চাভিলাষী অজুদ-উদ-দৌলাহ এবার তিনি তাঁর উচ্চ কামনা ও বাসনাকে একের পর এক রূপ দিতে আরম্ভ করেন। তিনিই প্রথম বুয়াইয়া আমীর যিনি নিজেকে সুলতান উপাধি দিয়েও ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না যতক্ষণ না খলিফার শাহানশাহ উপাধিকে গ্রাস করলেন। তিনি এখন সুদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ও একটি স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন—যাতে করে ভবিষ্যতে বুয়াইয়া রাজপুত্রকে বিনা দ্বিধায় ও বিনা বাধায় সোজাসুজি আব্বাসীয় সিংহাসনে খলিফা বলে অধিষ্ঠিত

করা যায়। এই উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধিলাভ করে তার জন্য তিনি আপন কন্যার সঙ্গে খলিফা আত-তাইয়ের বিবাহ সম্পন্ন করেন। এইখানেই অজদ-উদ-দৌলাহ ক্ষান্ত হওয়ার মানুষ ছিলেন না, তিনি নিজেও খলিফার এক কন্যার পানিগ্রহণ করলেন। যাতে করে দু'দিক হতেই এই দুই বিবাহ বন্ধনের যে কোন সন্তান দাবি করতে পারেন যে তাঁরা খলিফার বংশজাত সন্তান। সুতরাং খলিফা হওয়ার পথে তাঁদের আর কোন বাধা-বন্ধন থাকবে না। এইভাবে বুয়াইয়া বংশের ভবিষ্যৎ নির্মাতা অজদ-উদ-দৌলাহ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এমন দুটো বিবাহ সম্পন্ন করলেন যাঁরা পরস্পর পরস্পরের একই সাথে জামাতা ও শ্বশুর। ইতিহাসে এরূপ বিবাহ সত্যিই নজিরবিহীন ও বিরল দৃষ্টান্ত।

খেলাফত হরণঃ ক্ষমতালোভী অজদ-উদ-দৌলাহ মুসলিম সাম্রাজ্যের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব সকল বিষয়ের সর্বময় ক্ষমতাধিকারী খলিফাকে কথায় কথায় ও প্রতিটি পদক্ষেপে অবমাননা করতে কুণ্ঠিত হননি। এক কথায় তিনি খলিফার নিকট হতে খেলাফতকে হরণই করলেন। প্রথম খলিফার খেলাতকেই হরণ করে খলিফাকে দাসানুদাসে পরিণত করলেন। পরে দাবি করলেন যাঁর নিকট কোন খেলাতই নেই, তিনি খলিফার "মণিমুক্তা খচিত মুকুট" রাখতে পারেন না। সুতরাং খলিফা যেন অনতিবিলম্বে ঐ মূল্যবান জিনিসটাকে আমীর-উল-উমারার নিকট পাঠিয়ে দেন। খলিফা আত-তাইকে সেই হুকুমই সুবোধ বালকের মতো মানতে হল। অতঃপর খলিফা অনুরূপভাবেই পর পর আরও তিনটি হুকুমনামা বা ফরমান পেলেন, প্রথমটি খলিফার 'ব্রেসলেটের' জন্য, দ্বিতীয়টি সম্মানিত তরবারি দুটোর জন্য। তৃতীয়টি রাষ্ট্রীয় পতাকা প্রদানের জন্য। এইভাবে অসহায় খলিফা বাধ্য হলেন সবক'টি ফরমান মেনে নিতে। এই সময়ে খলিফাগণ এতই নিরুপায় ছিলেন যে, তাঁদের কোনরূপই ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছুই ছিল না। আমীর-উল-উমারার হুকুমেই তাঁদের উঠতে ও বসতে হত। এমনকি খলিফার সাথে আমীর-উল-উমারার কন্যার যে বিবাহ ও আমীরের সাথে খলিফার কন্যার যে বিবাহ—এ দুটো বিবাহ ও খলিফার প্রতি আমীরের ফরমান বা হুকুম ব্যতীত কিছুই ছিল না। তাই তদানীন্তন আরবীয় খলিফাগণ আরবীয় কেনা গোলাম বা ক্রীতদাস ব্যতীত কিছুই ছিলেন না। ক্রীতদাস দাসীদেরও আত্মহত্যার একটি সুযোগ ছিল, কিন্তু হতভাগ্য খলিফাদের পদত্যাগ বা আত্মহত্যারও কোন সুযোগ ছিল না। সবকিছুই হরণ করা হয়েছিল।

নহবতঃ অতঃপর আমীর-উল-উমারা দ্বিতীয় পদক্ষেপ রাখলেন। খলিফার রাজপ্রাসাদে সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে নহবত বাজত। আমীর লোকচক্ষুর খাতিরে সেটাকে একেবারেই বন্ধ না করে দিলেও ম্লান করে দিলেন ব্যয় সংকোচনের অজুহাতে। তাঁর যুক্তি ছিল যিনি প্রকৃত খলিফা নন, তাঁর প্রাসাদে নহবত বাজানো অন্যায়, তাই মহামান্য আমীর খলিফার বাজনাটাকে কাঁসির বাজনাতে পরিণত করে

আপন প্রাসাদে ঐটাকে প্রকৃত ঢাকের বাজনাতে পরিণত করলেন। ঠিক অনুরূপ ভাবেই জুম্মার নামাজের খোতবা (বক্তৃতা) পাঠে খলিফার নাম সগৌরবে উচ্চারিত হত। সেখানেও নহবতের অবস্থাই দাঁড়াল। আমীরের তৃতীয় পদক্ষেপ ছিল, আব্বাসীয় খেলাফতের একটা সাধারণ নীতি বা নিয়ম ছিল, খলিফা স্বয়ং বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা জানাতেন, কিন্তু আমীর সেটাকেও বন্ধ করে দিয়ে কায়রোর ফাতেমী খলিফার রাষ্ট্রদূতকে নিজেই অভ্যর্থনা জানান। এইভাবে আমীর-উল-উমারা অজুদ-উদ-দৌলাহ খলিফার ঘরে-বাইরে বা কিছু শক্তি মান-মর্যাদা ছিল, সব কিছুকেই হরণ করলেন। প্রয়োজনবোধ করলে আমীরগণ মাঝে মাঝে অকাতরে খলিফার প্রাণটিকেও হরণ করতেন, যদি খলিফাগণ মহামান্য আমীরের ফরমান মানতে এতটুকু দ্বিধা বা বিলম্ব করতেন। ঐতিহাসিক আরনল্ড বলেন—"বুয়াইয়া রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হল। ৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাস্পিয়ান সাগর হতে পারস্য উপসাগর এবং ইস্পাহান হতে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের অধিপতি হন। ক্রমশ তিনি ইরাকে প্রাধান্য কায়েম করে পরিশেষে বাগদাদের খলিফার প্রভু হলেন।"

জনহিতকর কার্যকলাপ ঃ অজুদ-উদ-দৌলাহর রাজত্বকাল শুধু রাজ্যের সীমা বৃদ্ধিতেই সীমিত ছিল না। জনহিতকর কার্যকলাপ, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য প্রভৃতি তাঁর রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করেছিল। এই সময় মুসলিম কৃষ্টিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সারা রাজ্যে বহু খাল খননেরও ব্যবস্থা করেন। অজুদ বাগদাদ ও ইরাকের যাবতীয় সেচ ব্যবস্থা ও নদীনালার সংস্কার করেন। এখানকার বহু খাল-বিল ভরাট হয়ে গিয়েছিল। বাঁধগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে বন্যার সময় মানুষের দুরবস্থার কোন সীমা থাকত না। অজুদ জনসাধারণের এই কষ্ট লাঘব করার জন্য বাঁধগুলির পুনর্নির্মাণ করে খাল-বিলগুলির নতুনভাবে বিন্যাস করেন। তিনি ইস্তাখর নামক স্থানে একটি লেকও নির্মাণ করেন। সিরাজের নিকট 'বাঁধ-ই আমীর' নামে একটি ঐতিহাসিক বাঁধ নির্মাণ করেন। তখনকার দিনের এই দুটো কাজ সেদিনের ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অজুদের এই কীর্তি সম্পর্কে সেদিনের জনপ্রিয় প্রবাদ—"তিনি সাগরে একটি পর্বত নির্মাণ করেছেন, এবং পর্বতে একটি সাগর খনন করেছেন।"

তিনি জনসাধারণের সুবিধার জন্য বহু রাস্তাঘাটও নির্মাণ করেন। যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তেমনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিমারিস্থান বা হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণে। বাগদাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 'বিমারিস্থান' আল-আজদি ২৪ জন খ্যাতনামা চিকিৎসক-সহ তিনিই নির্মাণ করেন। এক লক্ষ দিনার ব্যয়ে এই হাসপাতালটি নির্মিত হয়। শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন জ্ঞানী অজুদ-উদ-দৌলাহর পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও প্রভূত উন্নতি হয়।

বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন মনীষীগণ তাঁর রাজসভাকে অলংকৃত করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবু-আলি মিসকাওয়াইহর তাজাবিরুল ওমাস বুয়াইয়ার যুগের বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। ইব্রাহিম ইবন হিলাল আস-সাবীর কিতাবুত তাজি অনুরূপ একটি গ্রন্থ। প্রখ্যাত কবি আল-মুতানাবী তাঁর সভাকবি ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাবিদ ইখওয়ানুস-সাফাহ সম্প্রদায় তাঁর সময়েই জ্ঞান সাধনা করে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আবু-আলি আল-ফারসী কিতাব-উল-ইজাহ গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ সমাদর লাভ করেন। ঐতিহাসিক মাসুদি, দার্শনিক আবু নাসর, ফারাবি, আবুল ফারাজ মনীষীগণ তাঁর দরবারকে জ্ঞানী ও গুণীর দরবারে পরিণত করেন। তাঁর সময়ে রাজ্যে শুধু বহু মসজিদই নির্মিত হয়নি, খলিফার খ্রীস্টান উজির নসর-ইবন-হারুণ খলিফার আদেশক্রমে বহু গির্জা ও মঠ নির্মাণ করে তাঁর রাজ্যকে সর্বজাতির মিলনভূমিতে পরিণত করেন। ঐতিহাসিক মিসকাওয়ার বলেন—"যদিও অজুদ-উদ-দৌলাহর রাজধানী সিরাজে ছিল, তথাপি বাগদাদ নগরীর সৌন্দর্যও শতগুণে বৃদ্ধি পায়।" অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"অজুদ-উদ-দৌলাহর সময়েই বুয়াইয়া শক্তি সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়।"

পরবর্তী বুয়াইয়া আমীরগণ—সামস্‌-উদ-দৌলাহ ও শরাফ-উদ-দৌলাহ: ৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে অজুদ-উদ-দৌলাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সামসু-উদ-দৌলাহ উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সামসু-উল-মিল্লাত বা 'ধর্মের সূর্য' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়—তাঁর ভ্রাতা শরাফ-উদ-দৌলাহ ধর্মের সূর্যকে সন্ধ্যায় অস্তমিত হওয়ার মতো সুযোগ না দিয়ে প্রত্যুষেই উদিত সূর্যের যবনিকা টেনে দিয়ে নিজেই পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। সামসু-উদ-দৌলাহ শুধু ক্ষমতাচ্যুতই হলেন না, একেবারেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। নিষ্ঠুর পরিণতি, নির্মম পরিহাস, নির্লজ্জ ইতিহাস—সূর্য অন্য সকলকে আলো বিতরণ করার পরিবর্তে নিজেই ঘোর অন্ধকারে পতিত হল। এরই নাম হয়তো রাজ-চরিত্র, রাজ-ইতিহাস ও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। শরাফ-উদ-দৌলাহ ৯৮৩ হতে ৯৮৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে সসম্মানে রাজ্য পরিচালনা করেন। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনিও খলিফা আল-মামুনের মতো একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকালেও বহু শিক্ষাবিদ, গণিতবিদ, জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ এবং অন্যান্য বিশারদগণ তাঁর দরবারকে আলোকিত করেন। তাঁদের মধ্যে ইবন-উস-সালাম, আব্দুর রহমান এবং আবুল ওয়াকা অন্যতম।

আবু নসর-বাহা-উদ-দৌলাহ (৯৮৯-১০১২): অজুদ-উদ-দৌলাহর অপর পুত্র আবু নসরবাহা-উদ-দৌলাহ আমীর শরাফ-উদ-দৌলাহর মৃত্যুর পর নুর-উল মুলক 'রাজ্যের আলো' উপাধি গ্রহণ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এবার ইতিহাসের আবার পুনরাবৃত্তি হল। পিতা ও বুয়াইয়া বংশের প্রকৃত

প্রতিষ্ঠাতা লৌহমানব অজুদ-উদ-দৌলাহ একদিন আব্বাসীয়কে খলিফা আত-তাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় করার জন্য ও নিজ আখেরাতকে গোছাবার জন্য শুধু আপন কন্যার সঙ্গে তাঁরই বিবাহই দেননি; বরং খলিফার কন্যারও পানিগ্রহণ করেছিলেন। ৯৯১ খ্রীস্টাব্দে নসরবাহা-উদ-দৌলাহ পিতার সেই মনোনীত খলিফা এবং এর সাথে শ্বশুর ও জামাই আত-তাইকে পদচ্যুত করে খলিফার অপর এক ভ্রাতা আব্বাস আহমদকে 'আল-কাদির বিল্লাহ' উপাধি দান করে বাগদাদের সিংহাসনে খলিফার আসনে অভিষিক্ত করে আপন গোষ্ঠীকে মজবুত করেন। এই ছিল বাহা উল্লার রাজ-চরিত্র।

অন্যদিকে, তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ, দয়ালু, ধী-শক্তিসম্পন্ন মানুষ ও সুশাসক। তাঁর সময়ে সারা রাজ্যে আধ্যাত্মিক প্রতিপত্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তিনি ধর্মের কোন রকম গোড়ামিকেই পছন্দ করতেন না। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নীতি ও দর্শন ছিল—উদারতাই ধর্মের প্রাণস্বরূপ। যে ধর্মের উদারতা নেই, সে ধর্মের প্রাণ নেই। সে ধর্মের গতি নেই, তা নিষ্প্রাণ ও গতিহীন ও তা মৃত্যু-প্রায়। তাই তিনি একপেশে মুতাজিলা মতবাদের বিরোধী ছিলেন। ৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদে তারই অনুপ্রেরণায় ও আন্তরিকতায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর প্রখ্যাত পারস্যবাসী মন্ত্রী সাবুর-ইবন-আবদাশির ১০,০০০ পুস্তক সংবলিত একটি পাঠাগার-সহ একটি আকর্ষণীয় গবেষণাগার নির্মাণ করেন। বিখ্যাত সিরীয় কবি আল-মা'বী শৈশবে উক্ত পাঠাগারে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ের পর হতেই বুয়াইয়াদের অধঃপতন শুরু হয়।

বুয়াইয়া যুগের জ্ঞানচর্চা: বুয়াইয়া যুগের আমীরগণ যেমন বিচক্ষণ ছিলেন, তাঁদের উজিরগণও তেমনি বিদ্বান ছিলেন। আমীরগণ যেমন গুণীব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের উজিরগণও তেমনি গুণগ্রাহী ছিলেন। মুইজুদ্দোলাহর উজির মুহাল্লাবি, রুকনুদ্দোলাহর উজির আবুল ফজল ইবনুল আসিদ, মুয়াইয়িদ্দোলাহ ও ফকরুদ্দোলাহর উজির সাহিব ইবন-আব্বাস ও বাহাউদ্দৌলার উজির ফসরুল মুলক ও সাবুর এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন বিরাট মনীষী। নিজেরা যেমন মান-মর্যাদাশালী ব্যক্তি ছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে সকল মানী ব্যক্তিকেও দিতেন যথাযথ সম্মান। অর্থাৎ আমীরদের দরবারে জ্ঞানী ও গুণীদের ছিল উপযুক্ত স্থান। মন্ত্রী সাবুরের উৎসাহেই বাগদাদে স্থাপিত হল—জ্ঞানকেন্দ্র ও বিশাল গ্রন্থাগার। অজুদের পুত্র শরাফুদ্দোলা বাগদাদে স্থাপন করলেন একটি মানমন্দির। সেখানে একত্রিত করলেন দেশবিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের, যেমন ইবন-রুস্তুম আল-কুহি প্রমুখ ব্যক্তিগণ। বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ আবুল ওয়াকাও তাঁর দরবারকে অলংকৃত করেছিলেন। এই যুগেই বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী 'ইখওয়ানুস সাফাহ' বসরায় জ্ঞানসাধনা করে খ্যাতিলাভ করেন। বুয়াইয়া যুগে আমীর জালালুদ্দৌলাহর সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর দুটো বিখ্যাত

গ্রন্থ রচিত হয়—মাওয়ারদী ও অন্যটি ইবন আবি ইয়ালা। গ্রন্থ দুটোর নামকরণ একই দেওয়া হয়—আহকা-মুস-সুলতানিয়া। এই গ্রন্থে খলিফা ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত বুয়াইয়া আমলে প্রখ্যাত পারস্য দার্শনিক আবু সীনা, ঐতিহাসিক মিসকাউই, ভূগোল বিশারদ ইস্তাখারি, অংকশাস্ত্র বিশারদ মিস সাউই এবং অন্যান্য আরো বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি বুয়াইয়া যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উর্বর ভূমিতে পরিণত করে গেছেন।

বুয়াইয়া যুগের পতন ঃ শতাব্দীর অধিককাল বাগদাদে বুযাইয়া শাসন শিয়াগণকে অতিরিক্ত ভালবাসতে গিয়ে সুন্নীগণের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। বুয়াইয়া আমীরগণ ভারসাম্য রাখতে পারেননি। তাই দিনে দিনে তাঁরা শক্তিহীন ও দুর্বল হয়ে পড়তে থাকলেন। বুয়াইয়াগণ বাগদাদে দুটো শিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান চালু করেন—একটি ১০ মহররমের শোকানুষ্ঠান, যাকে আশুরাও বলা হয়ে থাকে। (এর বিস্তৃত বিবরণের জন্য ইসলামের ইতিহাস—ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম ইয়েজিদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অপরটি হল—গাদিবের আনন্দোৎসব। জিলহজ্জ মাসে এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। শিয়াদের মতে—ঐ দিন হজরত মহম্মদ (সাঃ) হজরত আলি (রাঃ)-কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেছিলেন। বিপদ হল—এই দুই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাগদাদে প্রতি বছর শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা বাধত। বুয়াইয়াদের এই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে ফাতেমী খলিফা আল-আজিজুর এনেসা, হামা, আলপ্পো এবং মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চল দখল করলেন। একদিকে আব্বাসীয় দুর্বল অসহায় ও সবের উর্ধ্বে নিষ্ক্রিয় খলিফা এবং অন্যদিকে স্বাধীন, কপট, অলস, বিলাসপ্রিয় পরবর্তী বুয়াইয়া আমীরগণ ফাতেমিদের আক্রমন প্রতিরোধ করতে মোটেই সক্ষম হয়নি। ১০১২-১০২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান-উদ-দৌলাহ, ১০২৪-১০৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইমাদ-উদ-দৌল্লাহ আমিরুল-উমারার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা অপদার্থ ও একেবারেই অযোগ্য ছিলেন। এই গণ্ডগোলের বাজারে অবশেষে আব্বাসীয় নিষ্ক্রিয় খলিফা আল-কাইম (১০৩১-৭৫) বুয়াইয়াগণের ব্যবহারে একেবারেই উত্যক্ত হয়ে সেলজুকদের নেতা তুঘ্রিল বেগকে বাগদাদে আসতে আমন্ত্রণ জানান। এইভাবেই এই পথেই একদিন আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতাকফি (৯৪৪-৪৬) তুর্কি সেনাদের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়েই বুয়াইয়া বীর আহম্মদকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অবশেষে বুয়াইয়াগণ যে পথ ধরে যে ভাবে এলেন, সেই পথ ধরেই সেই ভাবেই বিদায় নিলেন। অবলীলায় এলেন, অবহেলায় গেলেন। ১০৫৫ খ্রীস্টাব্দে সেলজুক বংশের তুঘ্রিল বেগ বাগদাদ দখল করে সর্বশেষ বুয়াইয়া আমীর মালিকুর-রহিমকে (১০৪৮-৫৫) পদচ্যুত ও বন্দী করে বাগদাদের শিয়াপন্থী বুয়াইয়া শাসনের চিরাবসান ঘটালেন।

বুয়াইয়াদের বা বুয়াইহিদদের পতনের কারণ ঃ

শিয়া ও সুন্নী দ্বন্দ্ব ঃ একদিন যেমন হাশিমীয় ও উমাইয়া কলহ উমাইয়া

রাজবংশের পতনের অন্যতম কারণ হয়েছিল, বুয়াইয়া রাজবংশের পতনেও শিয়া এবং সুন্নী কলহ ঠিক অনুরূপ স্থান দখল করে। বলা বাহুল্য, বুয়াইয়া আমীরগণ প্রধানত ছিলেন শিয়া, এবং আব্বাসীয় খলিফাগণ সাধারণত ছিলেন সুন্নী। এবং এখানে মূলত বেধেছিল শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব। একথা বলার অবকাশ রাখে না যে, বুয়াইয়া আমীরগণ প্রায় শত বছর শাসনকালে আব্বাসীয় খলিফাগণকে শুধু সাক্ষীগোপাল স্বরূপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রেখেই ক্ষমতাচ্যুত করেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পার্থিব ও ধর্মীয় সকল সম্মান ও প্রতিপত্তিকে একেবারেই লোপ করেন। এ যেন এক বিবাহিতা নারী তাঁর স্বামীকে সাক্ষীগোপাল খাড়া করে রেখে সমাজে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ানো। বুয়াইয়া যুগে আব্বাসীয় খলিফাদের অবস্থাও ঠিক এই সাক্ষীগোপাল স্বামীর মতো শোচনীয় রূপ ধারণ করেছিল। খলিফার এই শোচনীয় অবস্থা সুন্নী মতাবলম্বীদের নিকট দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠতে থাকল। কেননা পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য অবস্থা এরূপই দাঁড়িয়েছিল যে সুন্নী ইসলামের নেতা আমীর-উল-মুমেনীন আব্বাসীয় মতাবলম্বী আমীরুল-উমারার নিকট বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কোথাও খলিফার নামের সাথে, কোথাও বা খলিফার নামের পরিবর্তে বুয়াইয়া আমীরদের মুদ্রায় নাম অংকন ও খোতবায় নাম পঠন ইত্যাদি কাজের দ্বারা খলিফাদেরকে রাত দিন হেয় প্রতিপন্ন করা হতে থাকে। বুয়াইয়া আমীরগণ খলিফার মতো দেহে পোশাক-পরিচ্ছদ, মাথায় মুকুট, হাতে বাজুন্দ, সম্মুখে পতাকা, পশচাতে তরবারি প্রভৃতি ব্যবহার করেও খলিফার সম্মানকে চরমভাবেই আঘাত দেন। এমনকি আমীর অজুদ-দৌলাহ মহাসমারোহে রাজকীয় সমস্ত জাঁকজমক পালন করতে থাকায় খলিফার শেষ চিহ্নটুকুও যেন বিলোপ পেল। সকালে 'নহবত' বেজে উঠত আমীরের রাজপ্রাসাদে, যার ফলে প্রকাশ্যভাবেই জনগণের সম্মুখে খলিফাকে হেয় করাও হল। এই সমস্ত কারণে শুধু খলিফাই আঘাত পেলেন না, আঘাত পেল বিশাল জনতা। এই বিশাল জনতাই ইসলামের সুন্নী সম্প্রদায়। সমগ্র সুন্নী সম্প্রদায় শিয়া প্রবণতার তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁদেরকে নেতৃত্ব দিলেন হাম্বলি গোষ্ঠী। ফলে বাগদাদে বিদ্রোহ দেখা দিল। ধীরে ধীরে সমগ্র সাম্রাজ্যে এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল এবং বুয়াইয়াদের পতনকে করল ত্বরান্বিত।

আরব-পারস্য প্রতিযোগিতা : আব্বাসীয় খেলাফতে একবার বার্মেকি উত্থানে আরব বংশধররা এই উত্থানকে আরবদের ওপর পারসিকদের প্রভুত্ব বলে মনে করেছিলেন। পরে নানা কারণে সেই বংশধরেরাও একেবারেই বিলীন হয়ে যায়। তখন খলিফা হারুণ-আর-রশিদের খেলাফত কাল। বুয়াইয়াগণ আব্বাসীয়া খেলাফতের রাজধানী বাগদাদের পরিবর্তে পারস্যের সিরাজে তাঁদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এইভাবে নানা দিক থেকে পারসিকগণ আরবদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলে আরবগণ ধীরে ধীরে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন।

শুধু তাই নয়, বুয়াইয়া আমীরগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদের অনুকরণে গড়ে উঠল—পারস্যের সিরাজ, ইস্পাহান, কিরমান, আহওয়াজ প্রভৃতি শহরগুলি। এইভাবে নানা দিক থেকে বার্মেকি বংশের পতনের পর বুয়াইয়াগণ পারস্যের মান-মর্যাদা ও গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকলে আরব বংশোদ্ভূত আব্বাসীয়গণ মনেপ্রাণে এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন না করে বরং পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে বিপরীতমুখী পদক্ষেপ রাখলেন। তখন আরব-পারস্যের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। ফলে বুয়াইয়াদের রাজত্বকাল আর উত্থানমুখী ও উত্থানশীল না হয়ে হল পতনমুখী। এটাই ছিল বুয়াইয়াদের পতনের প্রধানত দ্বিতীয় কারণ।

ক্ষমতার দম্ভ ঃ রাজ-ক্ষমতার মোহ, মাদকতা, গর্ব, দম্ভ বুয়াইয়া আমীরদের অন্ধ করে দিয়েছিল। সে কারণে তাঁরা যা করতেন তা নিজেরাই জ্ঞানচক্ষুতে অবলোকন করতে পারতেন না। যার ফলে তাঁরা আব্বাসীয় খলিফা হতে দেশের তামাম জনগণকে শুধু উপেক্ষাই করলেন না, বরং নিজেদের খামখেয়ালি ও আতম্ভরিতা দ্বারা তাঁদেরকে যথারীতি উত্যক্ত করে ছাড়লেন। বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহম্মদ (মুইজ-উদ-দৌলাহ) আব্বাসীয় খলিফা মুস্তাকফিকে অন্ধ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু নিজ বিবেকের দিক থেকে অন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যকে অন্ধ করা যায় না। তাই বিবেকের দিক থেকে বুয়াইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিলেন নিজেই অন্ধ ও অমানুষ। বুয়াইয়া বংশের জন্মলগ্নেই প্রতিষ্ঠাতা আহম্মদের এই অমানবিক কাজ ও অমনুষ্যত্বই বুয়াইয়া বংশের ধ্বংসের ও পতনের বীজকে অসংখ্য মানুষের মনের কোণে অজ্ঞাতে রোপণ করে দিয়েছিল। তাই একদিন বিশাল মহীরুহ পতনাকার রূপে দেখা দিল।

সাক্ষীগোপাল খলিফা ঃ বুয়াইয়া বংশের আমীরগণ আপন আপন সুবিধা ও সুযোগের জন্য আব্বাসীয় খলিফাকে একেবারেই ক্রীড়নক বা সাক্ষী-গোপাল করে পাথরের বাঁধানো একটি মূর্তি আকারে সিংহাসনে বসিয়ে রাখলেন। প্রয়োজনমতো আহার করতেন। দরকারমতো বিহার করাতেন। ইচ্ছামতো অপমান করতেন, পছন্দমতো প্রহার করতেন, মর্জিমতো অন্ধ করতেন। আমীর আলি বলেন—"ফ্রান্সের মোরাভিঞ্জিয়ান সম্রাটগণের শাসনামলে চার্লস মার্টিনের যেরূপ মর্যাদা ছিল, তাঁর অর্থাৎ আহম্মদের মর্যাদাও সেইরূপ ছিল; কারণ তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাসীন ছিলেন। খলিফা ছিলেন তাঁর অনুগৃহিত বা আশ্রিত মাত্র; তিনি রাজকোষ হতে দৈনিক ৫০০০ দিনার বৃত্তিরূপে অনুগ্রহ লাভ করতেন।" এইখানে বুয়াইয়া আমীরগণ একটি মারাত্মক ভুল করেছিলেন খলিফাকে একেবারেই নিষ্ক্রিয় করে। খলিফা একেবারেই নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে আমীরদের কাজের সমালোচনা করার মতো আর কেউই অবশিষ্ট থাকলেন না। বাকি যাঁরা ছিলেন সবই স্তাবকের দল। ফলে একদিন বুয়াইয়া আমীরদের অসংযত অশ্ব অশ্বারোহীকে এমন একটি স্থানে নিয়ে গিয়ে হাজির করল, যেটা ছিল তাঁদের বধ্যভূমি স্বরূপ। তাই আব্বাসীয়

খলিফাদের একেবারেই সাক্ষীগোপাল করাটা বুয়াইয়া আমীরদের পতনের পথটাকেই প্রশস্ত করেছিল।

অন্তর্দ্বন্দ্ব, গোত্রীয় কলহঃ বুয়াইয়া আমীরদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুরভিসন্ধি, হিংসা, দ্বেষ, গোত্রীয় কলহ তাঁদের পতনকে ত্বরান্বিত করল। যেটা প্রতিটা রাজবংশের ধ্বংসের চিরন্তন পথ ও পন্থা। বুয়াইয়া আমীরগণের নিজেদের মধ্যে হানাহানি, রেষারেষি, দ্বন্দ্ব, কলহ অনিবার্যভাবে তাঁদের দুর্বল করে তুলল। অধিকন্তু তাঁরা হয়েছিলেন বিলাসপ্রিয়, অলস, অকর্মণ্য, অপদার্থ ও অযোগ্য। যার ফলে বুয়াইয়া আমীরদের রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। প্রথম দিকের বুয়াইয়া আমীরগণের ধর্মীয় ও মানবিক কোন গুণ না থাক, কিন্তু তাঁরা ছিলেন প্রকৃত সংগঠক ও বলিষ্ঠ শাসক। সংগঠনের গুণে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, আবার শাসন ক্ষমতার গুণে রাজ্য পরিচালনা করতেও সফল হয়েছিলেন। কিন্তু শেষের দিকের আমীরগণের কোন গুণই ছিল না, তাঁরা না ছিলেন সংগঠক, না ছিলেন সুশাসক। অধিকন্তু ছিলেন বিলাসপ্রিয় ও দুর্বল চরিত্র। ফলে ১০২৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁদের পূর্বাঞ্চল গজনবী বংশ কর্তৃক অধিকৃত হল এবং অবশিষ্ট অংশের জন্য আব্বাসী খলিফা আল-কাইম অযোগ্য আমীরদের প্রতি আর আস্থা রাখতে না পেরে সেলজুকদের নেতা তুঘ্রিল বেগকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানান। তুর্কী প্রধান তুঘ্রিল বেগ বাগদাদে তুর্কীদের প্রাধান্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। পরিশেষে বুয়াইয়া আমীরদের কোন্দল, আত্মকলহ, হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও খলিফার আহ্বান বেগকে সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ সহজে এনে দিল। সেলজুক নেতা তুঘ্রিল বেগ তার সদ্ব্যবহার করলেন ১০৫৫ খ্রীস্টাব্দে শেষ বুযাইয়া আমীর সালিকুর রহিমকে বন্দী ও পদচ্যুত করে। এইভাবে নানা কারণে শিয়া-বুয়াইয়া আমীর ও তাঁদের প্রায় ১০০ বছরের বুয়াইয়া শাসনের অবসান হল।

চতুর্থ অধ্যায়

সেলজুক বংশ (১০৫৫—১১৯৪ খ্রীঃ)

অভ্যুত্থান ঃ ইসলামের ইতিহাসে ও আব্বাসীয়া খেলাফতে তুর্কী সেলজুকদের অভ্যুত্থান একটি নতুন ও বিস্ময়কর অধ্যায়ের সূচনা করে। একাদশ শতব্দীর প্রারম্ভে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ছিল। যখন বুয়াইয়া ও গজনবী বংশের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ছিল, যখন স্পেনে উমাইয়াগণ, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমিগণ বহু পূর্ব হতেই স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন, যখন উত্তর সিরিয়ায় ও মেসোপটেমিয়ায় বহু বিদ্রোহী আরব নেতার আবির্ভাব হয়েছিল, যখন এঁরা কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন, যখন স্বয়ং পারস্যেই বুয়াইয়া বংশের ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, তখন আব্বাসীয় খলিফার এই শতধা বিভক্ত রাজ্যে এক নতুন রাজশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, তারই নাম ঐতিহাসিক—'সেলজুক বংশ'।

সেলজুকদের বংশ-পরিচয় ঃ সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনী রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত সেলজুকগণ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেলজুকগণ জাতিতে তুর্কমান ছিলেন। তাঁদের গোত্রের নাম ছিল—'ওঘুজ'। এই গোত্রের নেতৃত্ব দান করেন সেলজুক। তখন হতে এই বংশ তাঁদের নেতার নামানুসারে সেলজুক বা সলজুকীয় নামে পরিচিত। ৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে সেলজুক তাঁর তুর্কোমান দলবল-সহ তুর্কীস্থানের কিরঘিজ উপত্যকা হতে দক্ষিণ ট্রান্সক্সিয়ানার বুখারা অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করেন। সেলজুক জাতি ইসলাম-ধর্ম গ্রহণের পূর্বে বড়ই অসভ্য, বর্বর, নিরক্ষর ও হিংস্র প্রকৃতির ছিল। দুর্ধর্ষ এই সেলজুক জাতি ইসলামধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁরা তাঁদের অপরিমিত প্রাণ-শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পেরে যেন সৌভাগ্যের চাবিকাঠিটি পেয়ে গেলেন, যা ঘটেছিল একদিন অসভ্য বেদুইন আরব জাতিতেও।

যুদ্ধে জয়লাভ ও দলপতি নির্বাচিত ঃ সুলতান মাহমুদ সেলজুক তুর্কীদের অভ্যুত্থানে খুবই শঙ্কিত ছিলেন। ১০৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর দুর্বল পুত্র ও উত্তরাধিকারী মাসুদের রাজত্বে একদিকে গজনবী বংশের দ্রুত পতন ও অন্যদিকে সেলজুক বংশের দ্রুত অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। সেলজুকের বংশধররা গজনীর অধঃপতনে ইলক খান ও সামানী রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে সরাসরি গজনী রাজ্যে হানা দিতে থাকে। সেলজুকের পৌত্র তুঘ্রিল বেগ ও চাগরি বেগ প্রভৃত শক্তি অর্জন করে খোরাসানের ওপর পতিত হলেন এবং একের পর এক

যুদ্ধে খোরাসানের গজনবী বংশের আমীরগণকে পরাজিত করে খোরাসানের প্রধান নগরসমূহ দখল করেন। ১০৩৭ খ্রীস্টাব্দে দুর্বল গজনীর অধিপতি মাসুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে হিবাতের নিকট এই যুদ্ধে তাঁকে একেবারেই পরাজিত করে সেলজুকগণ ঐ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। এই আধিপত্য লাভের পর যখন সেলজুকগণ বুঝতে পারলেন যে তাঁদের সুদিন আগতপ্রায়, তখন তাঁরা তাঁদের শক্তিকে আরো সুশৃংখলিত ভাবে পরিচালিত করার জন্য আদি সেলজুক নেতার পৌত্র তুঘ্রিল বেগকে দলপতি নির্বাচিত করেন।

তুঘ্রিল বেগ (১০৫৫-৬৩ খ্রীঃ):

সেলজুকের পৌত্র তুঘ্রিল বেগকে সেলজুক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। তুঘ্রিল বেগ সেলজুক তুর্কীদের দলপতি নিযুক্ত হয়ে তাঁর ভ্রাতা চাগরি বেগের সহায়তায় ১০৩৭ খ্রীস্টাব্দে ২৪ মার্চ গজনবী সুলতানকে মার্ভের নিকট পরাজিত করে মার্ভ ও নিশাপুর দখল করেন। মার্ভের মসজিদ সমূহে চাগরি বেগের নামে ও নিশাপুরের মসজিদে তুঘ্রিল বেগের নামে খোতবা পাঠ করা হয়। অচিরেই সেলজুকগণ বলখ, গুর্গাঁও, তাবারিস্থান, খাওয়ারিজম, জিবাল, হামাদান, দিনাওয়ার, হলওয়ান, রায় ও ইস্পাহান দখল করেন। শতাধিক বছরের পুরাতন বুয়াইয়া রাজবংশ সেলজুক বংশের বিজয় অভিযানের মুখে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। শেষ বুয়াইয়া আমীর মালিকুর রহিমের প্রধান সেনাপতি ছিলেন একজন শিয়া, যাঁর নাম বাসাসিরি, আবার কেউ বলেন—বাসাসির। প্রধান সেনাপতি আল-বাসাসিরি সময়ের সুযোগ বুঝে বুয়াইয়া শেষ আমীর মালিকুর রহিমকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেকে আমীর-উল-উমারা বলে ঘোষণা করেন। তখন ১০৫৫ খ্রীঃ দুর্বল ও ক্রীড়নক আব্বাসীয় খলিফা কাইম বিল্লাহ আমীরের প্রতাপ ও প্রতিপত্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে সেলজুক নেতা তুঘ্রিল বেগের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

তুঘ্রিলকে আমন্ত্রণ: সেলজুক নেতা তুঘ্রিল বেগ খলিফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে একটি পত্র দিলেন। এবং ১০৫৫ খ্রীঃ এই দুর্ধর্ষ তুর্কী নেতা বাগদাদ অভিমুখে রওনা হলেন। এবং ঐ বছরই (৪৪৭ হিজরীর ২৫ রমজান) ডিসেম্বর মাসে তিনি সদলবলে বাগদাদে প্রবেশ করলে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ও আমীর আল-বাসাসিরি রাজধানী হতে পলায়ন করেন। তখন বৃদ্ধ ও ক্ষমতাহীন খলিফা কাইম ১০৫৫ খ্রীঃ ৮ ডিসেম্বর তুর্কী নেতা তুঘ্রিলকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নগরের বাইরে গেলেন এবং তাঁকে পরিত্রাণকর্তা হিসাবে রাজদরবারে সাদরে আমন্ত্রণ জানান। অতঃপর খলিফা মসজিদের খতিবদের নিকট ফরমান পাঠালেন যে খোতবায় যেন খলিফার নামের পরে ও মালিকুর রহিমের নামের পূর্বে তুঘ্রিলের নাম পড়া হয়। তুঘ্রিলের বাগদাদে প্রবেশের কিছুদিনের মধ্যেই জনসাধারণ তুর্কী সেনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে প্রাক্তন আমীর মালিকুর রহিমের উসকানি আছে এই সন্দেহবশত তাঁকে

বন্দী করা হয়। তিনি বন্দী অবস্থায় ১০৫৮-৫৯ খ্রীঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইখানেই বুয়াইয়া বংশের আমীরদের যবনিকার পতন হল।

আল-বাসাসিবির বিদ্রোহ ঃ অতঃপর তুঘ্রিল বাগদাদে সেলজুক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে পারস্য অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে গমন করলে ইত্যবসরে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ও আমীর আল-বাসাসিবি (১০৫৮) পুনরায় বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে আব্বাসীয় খলিফার স্থলে ফাতেমি বংশের খলিফা মুসতানসির বিল্লাহকে বাগদাদে ইসলামের ধর্মীয় নেতা হিসাবে ঘোষণা করে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন। এবং বাগদাদের সকল মসজিদে খলিফা কাইমের পরিবর্তে ফাতেমি খলিফা মুসতানসিরের নামে খোতবা প্রবর্তিত করেন। আব্বাসীয় খলিফা আল-কাইমকে খেলাফতের সকল দাবি পরিহার করে খেলাফতের সকল নিদর্শনসমূহ, যথা— পোশাক, পাগড়ি, মিম্বর, প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু কায়রোতে ফাতেমির খলিফার নিকট প্রেরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হলে তিনি উক্ত নির্দেশ অমান্য করলে জোর-পূর্বক ঐ সমস্ত বস্তু তাঁর নিকট হতে হরণ করে তাঁকে যথোচিত শাস্তিদানের জন্য বন্দী করা হল। সঙ্গে সঙ্গে আল-বাসাসিবি বাগদাদের প্রধান কাজী ও আলাবি এবং আব্বাসীয় নেতাগণকে মুসতানসিরের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল। এক বছর পর্যন্ত বাগদাদে ফাতেমি খলিফার নামে শাসনও চলল। অবশেষে ১০৫৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে এই সংবাদ তুঘ্রিলের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি কোথাও আর কালবিলম্ব না করে দ্রুতগতিতে বাগদাদে ফিরে এসে আল-বাসাসিবিকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এইবার তুর্কী নেতা তুঘ্রিলের দুই পার্শ্বের দুই শত্রুই নিধন হল—একজন বুয়াইয়া আমীর মালিকুর রাহিম ও অন্যজন সেনাপতি আল-বাসাসিবি।

তুঘ্রিলের সংবর্ধনা ঃ অতঃপর তুর্কী নেতা তুঘ্রিল পুনরায় আব্বাসীয় খলিফা আল-কাইমকে বাগদাদের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলে খলিফা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তুঘ্রিলকে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব দান করেন। এক্ষণে আব্বাসীয় খলিফা আল-কাইম তুর্কী নেতা আমীর-উল-উমারা তুঘ্রিলের সম্মানে রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করে খলিফা হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর পোশাক পরে ও হাতে লাঠি নিয়ে যবনিকার অন্তরালে আসন গ্রহণ করলেন। তুঘ্রিলের আগমনে এই পর্দা উত্তোলিত হল। তুঘ্রিল অভিবাদন-সহ আসন গ্রহণ করে দোভাষীর মাধ্যমে খলিফার সাথে কথোপকথন করলেন। খলিফা তুঘ্রিলকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রাজা বলে সম্বোধন করলেন, এবং তাঁকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করলেন।

তুঘ্রিলের কৃতিত্ব ঃ তুঘ্রিল একজন প্রভাবশালী সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবন আসীর বলেন—"তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, জ্ঞানী, দানশীল, ধার্মিক, অনাড়ম্বর, বিশ্বাসী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি।" তুঘ্রিল সুলতান হিসাবে

আব্বাসীর সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি কখনও খলিফা কাইমকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেননি। তিনি বাগদাদের পরিবর্তে তাঁর প্রধান কার্যালয় মার্ভে স্থাপন করেন। আমীর আলি বলেন—"তুঘ্রিলের আমলে সেলজুকগণ এশিয়াতে একটি প্রতাপশালী জাতিতে পরিণত হয়। সমসাময়িক জাতিদের তুলনায় তাঁরা ছিলেন অনেক উন্নত। তাঁরা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক রূপে পরিচিত হন।" তুঘ্রিলের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব তিনি আব্বাসীয় খেলাফতের হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করেন। অতঃপর দেশের পর দেশ জয় করে বিখ্যাত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তে উপনীত হয়ে সেখানকার সম্রাটকে কর দিতে বাধ্য করেন। ১০৬০ খ্রীঃ তিনি বাইজান্টাইনদের ডোসিয়া ও ফিজিয়া হতে বিতাড়িত করেন। ১০৩৭ হতে ১০৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত তুঘ্রিল অত্যন্ত যশের সাথেই সগৌরবে শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব বলতে তিনি সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শিয়া দাইলামি সম্প্রদায়ের বুয়াইয়া প্রভুত্বকে একেবারেই ধ্বংস করে সুন্নী আব্বাসীয়দের প্রাধান্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে আব্বাসীয় যুগের ও খলিফার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

আলগ-আরসালান (১০৬৩-৭৩ খ্রীঃ) ঃ

আব্বাসীয় খেলাফতের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে গ্রীকগণ খলিফার রাজ্যে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছিলেন, যার ফলে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দক্ষিণে এন্টিয়ক ও পূর্বে আর্মেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হল। ১০৬০ খ্রীস্টাব্দে সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুঘ্রিল বেগ বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁদের কানাডোসিয়া ও ফিজিয়া হতে বিতাড়িত করলে পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলগ-আরসালান ঐ সকল অঞ্চল স্থায়ী ভাবে জয় করেন। এবং ১০৬৩ খ্রীস্টাব্দে তুঘ্রিল বেগের মৃত্যুর পর তিনি সেলজুকদের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়ে খলিফা কর্তৃক সুলতান উপাধি লাভ করে জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া চূড়ান্তভাবে জয় করার পর আজারবাইজানের খোই নামক স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন।

বাইজান্টাইনদের সাথে সংঘর্ষ, মানজাকার্দের যুদ্ধঃ বাইজান্টাইন সম্রাট ডায়োজিনাস রোমানাস আরসালানের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাগদাদ নগরীকে সমূলে ধ্বংসের পরিকল্পনামতো দু' লক্ষ সুসজ্জিত সেনাবাহিনী-সহ এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেন। কনস্টান্টিনোপল হতে ইতিপূর্বে এত বৃহৎ ও সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী আর কখনও এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেনি। এই দুঃসংবাদে আরসালান কোনরূপ বিচলিত না হয়ে ধীর ও স্থিরভাবে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য মাত্র ৪০ হাজার সৈন্য-সহ বাইজান্টাইন আক্রমণ প্রতিহত করতে আর্মেনিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। মুসলমানগণ মানজাকার্দ নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করলেন। প্রথমদিকে মুসলিম সেনাবাহিনী গ্রীক সৈন্যসংখ্যা লক্ষ্য

করে কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়লে আরসালান তাঁর সামান্য সেনাবাহিনীর সম্মুখে এমন একটি জ্বালাময়ী উদ্দীপ্ত ভাষণ দিলেন যার ফলে ঐ ৪০ হাজার সেনাবাহিনী যেন ৪ লক্ষ শত্রুর মোকাবিলা করার শক্তিলাভ করল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধল। মুসলিম সেনাবাহিনী বীরবিক্রমে প্রবল বেগে যুদ্ধ চালিয়ে পরিশেষে গ্রীক সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে সম্রাট ডায়োজিনিস রোমানাসকে সভাসদ-সহ বন্দী করল। পরাজিত রোমানাস আরসালানের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। আরসালান রোমানাসের প্রার্থনানুযায়ী তাঁকে একটি সন্ধির সুযোগ দিলেন। এই সন্ধির প্রথম শর্তানুযায়ী সম্রাট রোমানাস তাঁর কন্যাদের আরসালানের পুত্রদের সঙ্গে বিবাহ দেন। দ্বিতীয় শর্তানুযায়ী যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য রোমানাসকে ১০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তৃতীয় শর্তানুসারে বার্ষিক রাজস্ব স্বরূপ ৩ লক্ষ ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রতি বছর দেওয়ার অঙ্গীকারে বন্দীদশা হতে মুক্তি পেলেন। বন্দীমুক্ত রোমানাস এবার আরসালানের অনুমতি-সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পথিমধ্যেই সংবাদ পেলেন তাঁর প্রজাগণ তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও সিংহাসনচ্যুত করেছেন। এই দুঃসংবাদ আরসালানের দরবারে পৌঁছান মাত্র তাঁর পুত্রবধূদ্বয় আরসালানকে অনুরোধ করলেন তাঁদের পিতাকে সাহায্য করার জন্য। মহানুভব সুলতান রোমানাসকে সাহায্য করার নিমিত্ত কিছু দূর অগ্রসর হয়ে জানতে পারলেন যে বিদ্রোহীগণ বাইজান্টাইন সম্রাটকে বন্দী করে অতিব নিষ্ঠুরতার সাথে তাঁর চক্ষু উৎপাটিত করে তাঁকে হত্যা করেছে। অতঃপর এই প্রসঙ্গে সুলতানের আর কিছু করার না থাকায় তিনি প্রত্যাবর্তন করেন।

মানজাফার্দের যুদ্ধের গুরুত্বঃ মানজাফার্দের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কেননা এই যুদ্ধের পর এশিয়ায় বাইজান্টাইন ক্ষমতার অবসান ঘটল। অন্যদিকে সেলজুক তুর্কীদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ফলে এশিয়া মাইনরের মালভূমি এক্ষণে স্থায়ীভাবে 'দারু-উল ইসলামের' অন্তর্গত হল। এর সমস্ত কৃতিত্ব একমাত্র আরসালানেরই প্রাপ্য। আরসালান যুদ্ধজয়ের পর অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার পিতৃব্য পুত্র সুলায়মানের হস্তে অর্পণ করেন। এইভাবে সুলায়মান এশিয়া মাইনরে জায়গীরপ্রাপ্ত হলেন, এবং ১০৭৭ খ্রীস্টাব্দে রুমে সেলজুকদের সুলতানাত প্রতিষ্ঠিত করেন। বিচক্ষণ এবং সুদক্ষ শাসক সুলায়মান তাঁর রাজ্যসীমা উত্তরে হেলেসপণ্ট এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করে বাইজান্টাইন সম্রাটকে কর প্রদানে বাধ্য করেন এবং বিথিনিয়ার নাইসিয়া নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু ক্রুসেডের যুদ্ধে এটি অধিকৃত হলে ১০৮৪ খ্রীস্টাব্দে আইকোনিয়াস বা রুমে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। সিরিয়ায় আরসালানের পুত্র তুতুশের শাসনাধীনে আরও একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। তুতুশ স্বয়ং আলেপ্পোও অধিকার করেন। তিনি শুধু ফাতেমিদের অগ্রগতিকেই

রোধ করেননি, বরং তাঁদের নিকট হতে মক্কা ও মদিনাও উদ্ধার করেন। এই যুদ্ধের বিশেষ গুরুত্ব বলতে এশিয়া মাইনরে তুর্কী প্রভাব শুধু ইসলামের রাজ্য ও ধর্ম বিস্তারেই সহায়ক ছিল না, বরং এই প্রভাবটি পূর্বতন বীজ রূপে লুকিয়ে না থাকলে পরবর্তীকালে অটোমান তুর্কীদের আবির্ভাব হত কি না তা কে জানে, এবং একে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয়ের প্রথম পদক্ষেপ বলেই মনে করা হল। এই যুদ্ধের ফলে এশিয়া মাইনরে সেলজুক আধিপত্য বিস্তার লাভ করে এবং এশিয়ায় বাইজান্টাইন ক্ষমতা লুপ্ত হল।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ ১০৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইউসুফ নামক এক বিদ্রোহীর অতর্কিত আক্রমণে আরসালান নিহত হন। তিনি সেলজুক বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাজ্য সম্প্রসারণের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে যান। তাঁর কর্মময় জীবনে সত্য, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ইবনুল আসির বলেন—"আরসালান উদার, মহানুভব, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক, দয়ালু, পরোপকারী ও সাহসী বীব ছিলেন।" তিনি রোমান সম্রাটের প্রতি যে সদয় ব্যবহার করেন তাতে তাঁর মহানুভবতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি মার্ভ হতে ইস্পাহানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সুলায়মান ও তাঁর অন্যান্য উত্তরাধিকারিগণ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথেই এশিয়া মাইনের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁরা রুমের সুলতান বলেও পরিচিত ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি মসনভী প্রণেতা মওলানা জালালুদ্দিন রুমি পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দিনের পৃষ্ঠ-পোষকতায় আধ্যাত্মিক জগতের বহু কালজয়ী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আলগ আরসালান খাজা হাসান নামক জনৈক মনীষীকে 'নিজাম-উল-মুলক' উপাধি দান করে তাঁর উজির নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁকে বেসামরিক শাসনের সমুদয় ক্ষমতা দান করেছিলেন। আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ 'জালালুদ্দৌলাহ' উপাধি গ্রহণ করে সুলতান হলেন। এই বংশে তিনজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন—তুঘ্রিল (১০৩৭-৬৩), আলগ-আরসালান (১০৬৩-৭৩) এবং মালিক শাহ (১০৭৩-৯২)। অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"তুঘ্রিল ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলগ-আরসালান এবং মালিক শাহের মুসলিম শাসনকাল প্রাচ্যে সেলজুক অভ্যুত্থানের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে।",

মালিক শাহ জালালুদ্দৌলাহ (১০৭৩-৯২ খ্রীঃ) ঃ

বুয়াইয়া ও সেলজুক বংশ ঃ সেলজুক সুলতানদের প্রথম দু'জন বাগদাদে বসবাস করতেন না। প্রাদেশিক শাসনকর্তা গভর্নর বা সামরিক শাসনকর্তার সাহায্যে তাঁরা বাগদাদ শাসন করতেন। তুঘ্রিল বেগ মার্ভে অবস্থান করতেন, তাঁর পুত্র আরসালান কখনও বাগদাদে আসেননি। তিনি ইস্পাহান হতেই রাজ্যশাসন করতেন। পরে মালিক শাহ তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এখানেও খলিফা সুলতানের হাতের ক্রীড়নক

হয়েছিলেন। তবে বুয়াইয়া যুগের সাথে সেলজুক যুগের একটা পার্থক্য ছিল যে, বুয়াইয়াগণ কঠোর শিয়াপন্থী ছিলেন, সেখানে সেলজুকগণ সুন্নীপন্থী হলেও কট্টর ছিলেন না। এই ছিল বুয়াইয়া বংশের সুলতানদের সাথে সেলজুক বংশের সুলতানদের মূলগত পার্থক্য।

মালিক শাহ, রাজ্যসীমানা : ১০৭৩ খ্রীস্টাব্দে আলপ-আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্যপুত্র মালিক শাহ 'জালাল-উদ-দৌলাহ' উপাধি লাভ করে সেলজুক সুলতান রূপে সমাদৃত হলেন। হিট্টি বলেন—"মালিক শাহের শাসন আমলে সেলজুক ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হল।" মালিক শাহ সেলজুক সুলতানদের মধ্যে শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠই ছিলেন না বরং তৎকালীন নৃপতিদের মধ্যে অন্যতমও ছিলেন। তাঁর আমলেও আব্বাসীয় খলিফাগণ নামে মাত্র খলিফা বা ইমাম ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মালিক শাহ। তাঁর রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বে কাশ্মীর হতে পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগর পর্যন্ত এবং উত্তরে জর্জিয়া হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এককথায় তাঁর বিশাল রাজ্য দৈর্ঘ্যে তুর্কীস্থানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কাশগড় হতে জেরুজালেম পর্যন্ত এবং প্রস্থে কনস্টান্টিনোপল হতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মহানুভব মালিক শাহ : মহানুভব মালিক শাহ মনে করতেন রাজ্যের সম্প্রসারণ অপেক্ষা শান্তিই বেশি কাম্য হওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি রাজ্যের শান্তি-শৃংখলা ও সুশাসনের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রাজ্যলাভের জন্য অশান্তি, রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য অশান্তি কোনটাই তাঁর কাম্য ছিল না। মালিক শাহের রাজত্বের প্রথমদিকে কয়েকটি বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিলে তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁর আপন ভ্রাতাও এই সময় বিদ্রোহ করলে মালিক শাহ যে পথ অবলম্বন করেন তা শান্তিরই পথ। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান বর্ণিত একটি ঘটনা হতে মালিক শাহের চরিত্র সম্পর্কে ও তাঁর মহানুভবতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। ঘটনাটি হল—তুস নগরীতে তিনি উজির নিজাম-উল-মুলক-সহ একটি মসজিদে নামাজ পড়েন ও প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা শেষে তিনি উজিরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কি প্রার্থনা করলেন। উজির উত্তর দিলেন, তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন যে, আল্লাহ্ যেন সুলতানকে তাঁর বিদ্রোহী ভ্রাতার ওপর জয়ী করেন। তখন মালিক শাহ বললেন—"আমি আপনার ন্যায় প্রার্থনাও করিনি ও জয়ী হতে চাইনি, আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি যে, আমাদের দুজনের মধ্যে যে মুসলমানদের শাসন পরিচালনা করার জন্য বেশি উপযুক্ত, এবং যার শাসন প্রজাবর্গের জন্য বেশি উপকারী হবে তিনি যেন তাকেই জয়ী করেন।" বিদ্রোহী ভ্রাতার সাথে এই যুদ্ধে মহানুভব মালিক শাহ তাঁর আপন মহানুভবতার জন্য জয়ী

হলেন। তাঁর প্রার্থনাই আল্লাহর দরবারে গৃহিত হল। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রার্থনার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন—আপন শাসনে ও প্রশাসনে, ব্যক্তিজীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে।

খলিফা মুকতাদির ঃ এই সময় আব্বাসীয় খলিফা কাইমের মৃত্যু হলে তাঁর দৌহিত্র আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ 'মুকতাদির বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে খলিফা হন। মুকতাদির ধার্মিক, পুণ্যবান ও কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁকেও মহানুভব খলিফা বলা হত। এমনকি তিনি আব্বাসীয় বংশের মহান খলিফার খ্যাতিও লাভ করেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অত্যন্ত পছন্দ করতেন, তাই নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধানে তিনি নানাবিধ প্রকল্প প্রস্তুত করেন। জনগণের মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর একমাত্র কামনা। তিনি আব্বাসীয়দের মধ্যে হাম্বলি ও হানাফিদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চিরাবসান করতেও যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এক কথায় সুলতান ও খলিফা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত মহানুভব। তাই তাঁদের সময় তাঁদের মিলন হয়েছিল মধুর ও রাজ্যে কাজ হয়েছিল প্রচুর। এ ছিল মহান ও মহানুভবের মহামিলন।

নিজাম-উল-মূলক, শাসন সংস্কার ঃ সুলতান মালিক শাহের রাজত্বকালে শুধু যে মহানুভব সুলতান ও মহান খলিফার মহামিলন হয়েছিল তাই নয়। সেখানে আরো একটি মিলন হয়েছিল, তিনি ছিলেন অতি বিচক্ষণ উজির খাজা হাসান। যাঁকে সুলতান আলপ-আরসালান তাঁর বিচক্ষণতার জন্য নিজাম-উল-মুলক (রাজ্যের সংগঠক) উপাধি দান করে উজির নিযুক্ত করেন। মহামিলন এই তিনজনেরই হয়েছিল। তাই মালিক শাহের সময়ই সেলজুক বংশের উন্নতির চরম ও চূড়ান্ত যুগ বলে বর্ণিত।

সেলজুক রাজত্বের শাসন সংস্কার, সমৃদ্ধি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য বিশেষ ভাবে মালিক শাহের সুযোগ্য ও বুৎপত্তিসম্পন্ন উজির খাজা হাসানের অবদান ছিল অপরিসীম। নিজাম-উল-মুলকের বিচক্ষণতা, সাহসিকতা, দূরদর্শিতা কর্ম নৈপুণ্যতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্যই মালিক শাহের রাজত্বকাল এত মহিমান্বিত, এত গৌরবান্বিত ও এত চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান বলেন—"মালিক শাহের বিশ বছরের রাজত্বকালে নিজাম-উল-মুলক স্বীয় হস্তে সমস্ত কার্য এরূপ ভাবে কেন্দ্রীভূত করেন যে সুলতানের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকা অথবা মৃগয়ায় যাওয়া ব্যতীত আর কোন কাজই ছিল না। নিজামের একনিষ্ঠ সেবা, আত্মত্যাগ, আন্তরিকতা, বিচক্ষণতা ও জনমঙ্গলকর শাসনে সুলতান মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'আতাবেগ' (আমীরের শাসনকর্তা) উপাধিতে ভূষিত করেন। অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি অলংকার স্বরূপ।"

সিয়াসতনামা ঃ নিজাম-উল-মুলক নিজে শুধু সুপণ্ডিত ও বিদ্বানই

ছিলেন না, তিনি সকল পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদ্বান ও বিদ্যার অত্যন্ত পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। একবার মালিক শাহ রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণামূলক পুস্তক প্রণয়নের জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ উজির নিজামুল-মুলক এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে সময় দিতে পারবেন এ ধারণা কেউই করতে পারেননি। অবশেষে দেখা গেল এই বিষয়ে লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নিজামুল-মুলক রচিত 'সিয়াসতনামা' সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হল। ৫০ অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বিশাল গ্রন্থে রাষ্ট্র পরিচালনার এমন কোন দিক ছিল না, যাকে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়নি। তাই এই সিযাসতনামাকে রাষ্ট্র পরিচালনার অভিধানও বলা হয়ে থাকে। অতীতের বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হতে বর্তমানের নজির ও ভবিষ্যতের বহু সাবধানী ও সতর্কবাণী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে লেখক চরমপন্থী ও নাস্তিকবাদীদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। বিশেষ করে বাতিনী ও কারমাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এই পুস্তক সম্পর্কে ঐতিহাসিক আরনল্ড বলেন—"রাজনৈতিক নীতিমালা সংবলিত এটি একটি দার্শনিক নিবন্ধই শুধু ছিল না, বরং এতে স্থান পেয়েছে শাসন প্রণালী, দরবার, বিচারকার্য, সামরিক বিচার, নৈতিক হতে অর্থনৈতিক শিক্ষা এবং আরো বহু মূল্যবান বিষয়গুলি। এই গ্রন্থে তিনি রাজতন্ত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা দান করেন।" তাই আজও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নিজামের 'সিয়াসতনামা' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বলে সুধীজন দ্বারা স্বীকৃত।

নিজামিয়া মাদ্রাসা ঃ নিজামুল-মুলক ইসলামের ইতিহাসে তাঁর অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন শিক্ষাক্ষেত্রেও। বিদ্যোৎসাহী নিজাম শিক্ষা সম্প্রসারণকল্পে বাগদাদে ১০৬৫-৬৭ খ্রীস্টাব্দে 'নিজামিয়া মাদ্রাসা' নামে ইসলামের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস নিজাম কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত আল-আজহারের সমতুল্য বাগদাদে একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শাফেয়ী ও আশয়ারী মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৩৯৩ খ্রীস্টাব্দে মুসতানসিরিয়া নামক মাদ্রাসার সাথে এটি এক হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের অবিস্মরণীয় ধর্মতাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ ইমাম গাজ্জালি (১০৫৮-১১১১ খ্রীঃ) ১০৯১ হতে ১০৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ইসলাম জগতে তাঁর অবদান অপরিমিত ও অসামান্য। অন্যান্য অধ্যাপকদের মধ্যে নাসির-ই-খসরুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক ও ইসমাইলী প্রচারকও ছিলেন। তাঁর লিখিত সফরনামায় তদানীন্তন মুসলিম জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। এই নিজামিয়া মাদ্রাসাতে বিশ্ববিখ্যাত পারস্যের অমর কবি আধ্যাত্মিক জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাকবি সেখ সাদীও অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানতাপস

নিজাম বলখ, মার্ভ, ইস্পাহান, বসরা ও দেশের নানা স্থানে অগণিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার প্রভূত সম্প্রসারণ করে যান।

মানমন্দিরঃ মালিক শাহের রাজত্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম-উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। সেখানে সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব প্রাধান্য পেলেও বিজ্ঞান চর্চাও চরম শিখরে উপনীত হয়। জ্ঞানবীর উজির নিজামুল-মুলকের পরামর্শানুযায়ী সুলতান মালিক শাহ ১০৭৫ খ্রীস্টাব্দে নিশাপুরে একটি ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিদ সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নিশাপুরে বিশ্ববিখ্যাত মানমন্দিরও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশবিখ্যাত দার্শনিক, প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ, কবি, সাহিত্যিক, গাণিতিক প্রমুখ সকল মনীষীদের তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হল নিশাপুর। সেখানে মানমন্দির হল যেন জ্ঞানের কাবা। এই সম্মেলনের প্রাথমিক ও প্রধান বিষয় ছিল চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌরমাস অনুযায়ী গণনার প্রথা প্রচলিত করা। এবং প্রচলিত গণনা পদ্ধতির যাবতীয় ভুল সংশোধন করে একটি বিশুদ্ধ নতুন পঞ্জিকা তৈরি করা। মালিক শাহ জালাল-উদ-দৌলাহর নামানুসারে এই সংশোধিত পঞ্জিকার নাম দেওয়া হল 'জালালী পঞ্জিকা'। তদানীন্তন প্রচলিত পঞ্জিকা অপেক্ষা বেশি সূক্ষ্ম ও নির্ভুল ছিল। এই পঞ্জিকা গ্রীগরীয় পঞ্জিকা অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ ছিল। গ্রীগরীয় পঞ্জিকায় ৩৩৩০ বছরে একদিন ভুল হয়। কিন্তু জালালী পঞ্জিকায় ৫000 বছরে একদিনের প্রমাদ ঘটে। ঐতিহাসিক গীবন বলেন—"এটি জুলিয়াসের পঞ্জিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং গ্রিগরীর পঞ্জিকার নির্ভুলতার সমকক্ষতা দাবি করে।" এই মহাসম্মলনের সভাপতি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ জগতের চিরপ্রবাদপুরুষ ওমর খৈয়াম। তিনি নিশাপুরের নব প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরেরও মহাপরিচালক ছিলেন। নিশাপুর ও নিশাপুরের মাদ্রাসা এবং মানমন্দির সে যুগের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ইমাম গাজ্জালি, মহাকবি শেখ সাদী ও দার্শনিক ওমর খৈয়াম প্রমুখ প্রবাদপুরুষদের বক্ষে ধারণ করতে পেরে যেন নিজেকে ধন্য করেছে সর্বকালের জন্য। যতদিন জগৎ আছে, যতদিন জ্ঞানচর্চা বলে কিছু আছে বা থাকবে ততদিন নিশাপুরের ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের অমরত্ব কেড়ে নেয় সেই শক্তি মহাকালেরও নেই।

নিজামের আকস্মিক মৃত্যুঃ মালিক শাহের রাজত্বের শেষ ভাগে একদল নাস্তিকতাবাদী ঘাতক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এদের নেতৃত্ব দেন উগ্র ইসমাইলীপন্থী হাসান সাব্বাহ অথবা 'পর্বতের বৃদ্ধলোক' নামক এক জনৈক ব্যক্তি। তিনি প্রথম জীবনে নিজামের সহপাঠীও ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে হাসান সাব্বাহ উচ্চপদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে হিংসা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। তিনি নিজামের প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে খুবই

ঈর্ষান্বিত ছিলেন, অধিকন্তু তিনি নিজামের সুন্নীপ্রবণতাকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষ ও ছোরার সাহায্যে নেতার আদেশক্রমে মানুষকে হত্যা করত। এই সম্প্রদায় মাজান্দারানের পার্বত্য অঞ্চলে দুর্ভেদ্য আলামুত দুর্গে ঘাটি স্থাপন করে নিজেদের কার্য চালাত। তাঁরা এমনি শক্তিশালী ও কৌশলী ছিলেন যে স্বয়ং মালিক শাহও তাঁদের দমন করতে ব্যর্থ হন। ১০৯২ খ্রীস্টাব্দে তাঁদের একজন সুফী ছদ্মবেশী গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিজামুল-মুলক অতি আকস্মিক ভাবেই নিহত হন। এই বছরই সুলতান মালিক শাহও একুশ বছর সগৌরবে রাজত্ব করে মাত্র ৩৯ বছর বছর বয়সে ১০৯২ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক ইবনুল আসির বলেন—"নিজামুল-মুলক তাঁর সদগুণাবলী ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেরই নিকট সমাদৃত ছিলেন।" আমীর আলি বলেন—"এশিয়া যে কয়েকজন সুদক্ষ উজির ও শাসকের জন্ম দিয়েছে, তন্মধ্যে সম্ভবত ইয়াহিয়া বার্মেকির পর নিজাম-উল-মুলকই শ্রেষ্ঠ।"

মালিক শাহ ও নিজামের মৃত্যুর ফল : নিজামুল-মুলক ও মালিক শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেলজুকদের গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে। যোগ্য সুলতান মালিক শাহ ও তাঁর যোগ্য মন্ত্রী নিজামুল-মুলকের গমনের পর মনে হল সেলজুক যুগের সূর্য ও চন্দ্র যেন অস্তমিত হল। যার পরিণতি স্বরূপ দুর্বল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আরম্ভ হল গৃহযুদ্ধ, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে বিরাট সেলজুক সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। ১০৮৭ খ্রীস্টাব্দে সেলজুকগণ সামরিক সামন্ত প্রথার প্রবর্তন করেন, পরবর্তীকালে এই প্রথানুযায়ী সামন্তগণ নিজ নিজ অঞ্চলে বংশানুক্রমিক শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, যার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। কালক্রমে এরা পারস্যের মূল কেন্দ্রীয় সেলজুক শাখার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। পরে এই বিভিন্ন স্বাধীন শাখা-গুলির নাম হয়—ইরাক ও কুর্দিস্থানের শাখা, কিরমানের শাখা, সিরিয়ার শাখা, রুমের শাখা প্রভৃতি। শেষোক্ত শাখাটি ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে উসমানি তুর্কীদের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। উসমানি তুর্কীগণ ইসলামের বিজয় পতাকা ইউরোপে উড্ডীয়মান করতেও সক্ষম হন। সুতরাং মালিক শাহের মৃত্যু ও নিজামের পরলোকগমনের আঘাতকে সেলজুক বংশ সহ্য করতে না পারায় তাদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল।

জনহিতকর কার্যাবলী : মালিক শাহ প্রজাবৎসল সুলতান ছিলেন। তিনি যে শুধু বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন তাই নয়। সুলতান তাঁর বিশাল রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য পরিস্থিতি আপন চোখে পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কষ্টকর পরিভ্রমণ করতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। কথিত আছে, তিনি প্রজাবৃন্দের অভাব-অভিযোগ আপন কানে

শ্রবণ করার জন্য স্বাদশবার তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তিনি হারুণ রশিদ ও মামুনের ন্যায় ব্যবসিক ও তীর্থযাত্রী এবং পরিব্রাজকদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রহরার ব্যবস্থা এবং বিশ্রামের জন্য সরাইখানা ও বিশ্রামাগার প্রভৃতি নির্মাণ করেন। মৃগয়ায় তাঁর আসক্তি ছিল, কিন্তু নির্যাতন বা উৎপীড়ন কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। এটা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ। তাই দয়ালু সুলতান কোন গর্ভবতী বা দুগ্ধবতী হরিণী শিকারে ধরা পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে দয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। এই সময়ে নানা কারণে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, বণিকগণ ট্রান্সক্সিয়ানা হতে সিরিয়া পর্যন্ত বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারত, এমনকি দু'-একজন পথযাত্রী বা পরিব্রাজকও বিনা দ্বিধায় দূরগামী পথও অতিক্রম করতে ভয় পেতেন না। যার ফলে দেশের কৃষি ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার প্রভূত উন্নতি দেখা দেয়। অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে ছিল মন্ত্রী নিজামের দূরদর্শিতা। নিজাম সুষ্ঠু কর ব্যবস্থার প্রচলনের জন্য সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে সৈনিকদের মধ্যে জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করে, তাঁদের নিকট হতে নিয়মিত কর আদায়ের প্রথা প্রবর্তন করেন। স্থাপত্যশিল্পের দিক হতেও মালিক শাহের রাজত্বকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইস্পাহানের জামে মসজিদ নির্মাণে নিজাম যে স্থাপত্য রীতির প্রচলন করেন, তা সেলজুক বংশের স্থাপত্যশিল্পের চরম নিদর্শন। সেলজুক নির্মিত অসংখ্য ইমারতের মধ্যে ইরানের সংবস্ত, দামগা, সাভা, ইস্পাহান ও বিস্তারের মসজিদ ও মিনারসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিজামের পরামর্শ মতো মালিক শাহ তাঁর রাজ্যের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশেষ কীর্তি রেখে যান। বিশেষ করে বাগদাদ নগরীর হামামখানা, ময়লা পানি নিষ্কাশনের জন্য নালার ব্যবস্থা ও সারা রাজ্যে হাসপাতাল স্থাপন তাঁর অমর অবদান। সুতরাং জনহিত কার্যকল্যাণে সুলতান মালিক শাহ তাঁর জনদরদী মনের স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

পরবর্তী সেলজুকগণঃ মালিক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী তুরখানের অনুরোধক্রমে খলিফা আল-মুকতাদি (১০৭৫-৯৪) শিশুপুত্র মহম্মদকে (১০৯২-৯৪) নাসির-উদ-দুনিয়া-ওয়া-দীন উপাধি দান করে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর কিয়ারুক তাঁকে পদচ্যুত করে 'রুকনুদ্দীন' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সাথে ভ্রাতা মহম্মদের গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং মহম্মদ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর পরে সিনজার সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন। মালিক শাহের মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধ সেলজুক বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে। এবং সেলজুক সুলতান পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১০৫৫ খ্রীস্টাব্দ হতে সেলজুক কর্তৃত্ব আব্বাসীয়

খলিফা আল-কাইমের ওপর আরম্ভ হয়ে খলিফা আল-নাসিরের (১১৮০-১২২৫) আমলে ১১৯৪ খ্রীঃ বিলীন হয়।

সেলজুকদের অবদান : ১০৫৫ খ্রীঃ হতে ১০৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এই চল্লিশ বছর সেলজুক বংশ সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রের পরিচয় দেয়। এই সময়ের মধ্যেই সেলজুক বংশের অন্যান্য সাধারণ তিনজন সুলতানের আবির্ভাব ঘটে—তুঘ্রিল বেগ, আরসালাম ও মালিক শাহ এবং সেই সঙ্গে আবির্ভাব ঘটে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলকের (খাজা হাসান)। ইতিহাসের যে কোন যুগ, যে কোন প্রতিষ্ঠান বড় হয়েছে, চিরস্মরণীয় হয়েছে শুধু সেই যুগের অবিস্মরণীয় প্রাতঃ-স্মরণীয়, লৌহমানব, যুগমানব ও কর্মবীরদের নিয়ে মাত্র। সেলজুক যুগে এ সত্যের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাই ঐতিহাসিক গ্রুনিবাম বলেন—"সংঘবদ্ধ সেলজুক রাষ্ট্র চল্লিশ বছর যাবৎ রাজত্ব করে এবং প্রকৃতপক্ষে এটি পারস্য এবং ইরাকে সীমাবদ্ধ ছিল। সেলজুক রাজত্বে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়; এই রাজত্ব সুন্নী ইসলামকে সুসংহত করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শিক্ষা-দীক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নিজাম-উল-মুলক আব্বাসীয় খলিফা এমনকি সেলজুক সুলতানের ওপরও অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে প্রায় ৩০ বছর যাবৎ শাসনকার্য সুদৃঢ়রূপে পরিচালিত করেন।" ইসলামের ইতিহাসে সেলজুক বংশ অসামান্য অবদান রেখে গেছে, যাদের আমরা মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি—রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি।

রাজনৈতিক অবদান : আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতি সেলজুক সুলতানগণের বহু দানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুটো বড় দান, প্রথমটি আব্বাসীয় খলিফাকে বুয়াইয়া আমীরদের স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক ব্যবহারের লাঞ্ছনা হতে মুক্তি দান, অপরটি আব্বাসীয় খেলাফতকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা। বুয়াইয়া আমীর-গণের অত্যাচার আব্বাসীয় খেলাফতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে, ফলে বিদ্রোহীগণ নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লে সাম্রাজ্য দিন দিন সংকুচিত হতে থাকে। সেলজুক সুলতানগণ অনাচারী বুয়াইয়া আমীরদের ধ্বংস করে আব্বাসীয় খেলাফতের পতনকে রুখে দিতে সক্ষম হন। একদিকে অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল, বিদ্রোহ, অপর-দিকে বহিঃশত্রুদের অতর্কিত আক্রমণ এই দুটোকেই এক সাথে স্তব্ধ করে সমগ্র সাম্রাজ্যকে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত করে আব্বাসীয় খেলাফতকে নবজীবন দান করতে সক্ষম হন। তুঘ্রিল বেগের অসাধারণ রণকৌশল ব্যতীত ইসলামি সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা এবং নিরাপত্তা আর কোনদিন ফিরে আসত কি না তা কে জানে। যোগ্য পিতা তুঘ্রিল বেগ সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, পরবর্তীকালে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র আলপ-আরসালান মানজাফার্দের যুদ্ধে বাইজান্টাইন সম্রাটের অতর্কিত বিশাল আক্রমণকে শুধু প্রতিহত করেই নয়, বরং

সম্রাটকে পরাজিত ও বন্দী করে আব্বাসীয় খেলাফতের মর্যাদাকে বিশ্ব-দরবারে মহিমান্বিত করেন। তাঁরা অযোগ্য বুয়াইয়া আমীরদের মতো খলিফার খেলাত, মণিমুক্তা খচিত মুকুট, ব্রেসলেট, তরবারি প্রভৃতি নিয়ে কাড়াকাড়িতেই ব্যস্ত ছিলেন না, মেয়েদের মতো শুধু নহবত শুনতেই ভালবাসতেন না। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক জীবনে যথার্থ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় রেখে গেছেন।

সামাজিক অবদানঃ উমাইয়া খেলাফতে আরব ও অন-আরব প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়েছিল। সেখানে অন-আরবগণ মনে করতেন তাঁরা বহু কিছু হতে বঞ্চিত। কোথাও অবাঞ্ছিত, কোথাও অনাহূত, কোথাও বা অপমানিত, কিন্তু একই রথের চাকা আব্বাসীয় যুগে অন্যদিকে ঘুরে গেল। ইতিহাস এখানে যেন কাউকেই ক্ষমা করল না। কিন্তু সেলজুকে আমরা এর একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম—মহামিলনে ও সহ-অবস্থানে। যদিও সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে দেখা যাবে যে সমগ্র আব্বাসীয় খেলাফতে পারস্য রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্যান্য সকল কিছুর দ্রুত প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় সমাজব্যবস্থাকে কিছুটা টেনে নিয়ে পারসীকরণ করা হয়। বাগদাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের রায়, হামদান, ইস্পাহান প্রভৃতি শহরগুলি কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। আরব ও অন-আরবের মধ্যে বহু দিনের যে তিক্ত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা জমেছিল, তা অপসারিত হল সেলজুক সুলতানদের অকৃত্রিম আন্তরিকতায়। সেদিনের সমাজ-জীবনে এটিই ছিল সেলজুক সুলতানদের অবিস্মরণীয় অবদান।

ধর্মীয় অবদানঃ সেলজুক সুলতানগণ শুধুমাত্র আরব ও অন-আরব দ্বন্দ্ব দূরীভূত করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা যেমন আরব ও অন-আরব মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি সক্ষম হয়েছিলেন খলিফা ও সুলতানের মিলনেও। বুয়াইয়া আমীরগণ ছিলেন শিয়া-মতাবলম্বী এবং আব্বাসীয় খলিফাগণ ছিলেন সুন্নী-মতাবলম্বী। শিয়া আমীরগণ সুন্নী খলিফাগণকে কখনও কখনও অনুগ্রহের চোখে না দেখে ঘৃণার চোখেই দেখতেন। যার ফলে হতভাগ্য খলিফাদের ভাগ্যে সর্বপ্রকারের অবমাননা ব্যতীত আর কিছুই জুটত না। বিশেষ করে আমীর আজুদ-উদ-দৌলাহ খলিফা আত-তাইয়ের সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, যে ধর্মীয় আচরণ করলেন, তা বড়ই শোচনীয় ও মর্মান্তিক। খোতবাতে নিজ নাম পাঠ করানো, মুদ্রাতে নিজ নাম অঙ্কিত করা, মাথায় রাজমুকুট ব্যবহার করা, দরবারে নহবত বাজানো, সবার ঊর্ধ্বে আমীর হতে সুলতান, আবার সুলতান হতে শাহানশাহ উপাধি গ্রহণ যেন আব্বাসীয় খলিফাকে দাসানুদাসে পরিণত করেছিল। সেলজুক সুলতানদের হস্তক্ষেপে খলিফার প্রতি সেই অপমানজনক আঘাত দূরীভূত হল। সুলতান তুঘ্রিল বেগ কখনও প্রকাশ্য দরবারে খলিফার অনুরোধ সত্ত্বেও খলিফার সিংহাসনেরও পার্শ্বে উপবিষ্ট হতেন

না। এমনি ছিল তাঁর আপন ও অপরের সম্পর্কে আত্মমর্যাদা জ্ঞান। যার ফলে সুলতান খলিফার প্রীতি অর্জন করলেন, এবং খলিফাও সুলতানের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এইভাবে প্রীতি ও ভালবাসা, স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাজ্যের সাংস্কৃতিক জীবনে জোগাল এক অপরিমিত শক্তি ও সঞ্জিবনী সুধা। যে শক্তিতে জন্ম নিল বাগদাদের কালজয়ী নিজামিয়া মাদ্রাসা, যার প্রাণপুরুষ ছিলেন নিজামুল-মুলক, যেখানে অধ্যয়ন করলেন মহাকবি সেখ সাদির মত জগদ্বিখ্যাত কবি, যেখানে অধ্যাপনা করলেন ইমাম গাজ্জালির মতো ক্ষণজন্মা পুরুষ ও অচিন্ত্যনীয় প্রতিভাধর ব্যক্তি। সেলজুক সুলতানদের ধর্মীয় বোধ কোথাও কাউকে আঘাত করেনি, করেছে আপন, কাউকে অপমানিত করেনি, বরং সম্মানিত করেছে। ইসলামের উদারতা, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা সেলজুক সুলতানদের চরিত্রের ভূষণ ছিল। এক কথায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সেলজুক তুর্কী সুলতানদের আবির্ভাবে ও ক্ষমতালাভে প্রকৃত ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বুয়াইয়া যুগের ঘৃণা-বিদ্বেষ, হিংসামাখা ইসলাম সেলজুক যুগে সংশোধিত হয়। ইসলামের প্রতি সেলজুকদের এইটাই সর্বাপেক্ষা বড় অবদান।

প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবদান : বিখ্যাত ও বিচক্ষণ উজির খাজা হাসান প্রশাসনিক সংস্কার দ্বারা শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হন। খাজা হাসানের এই অসমান্য কৃতকার্যতার জন্য তাঁকে নিজামুল-মুলক (রাজ্যের সংগঠক) এবং 'আতা' বেগ (আমীরের নেতা) উপাধি দান করা হয়। স্মুলার বলেন—"সেলজুকগণ তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হন।" সমস্ত গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। জনগণের নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হয়। কর প্রথার সুষ্ঠ সমন্বয় করা হয়। এই সমস্ত সুষ্ঠভাবে রূপায়ণ করতে নিজামুল-মুলক অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার শ্রেষ্ঠ নজির হিসাবে তিনি তাঁর রচিত 'সিয়াসতনামা' রাজনীতির অভিধান রেখেও গেছেন। সামন্ত প্রথা বা জায়গীর প্রথা প্রবর্তন করে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি নিজামের অন্যতম কৃতিত্ব। এই প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাও চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

সাংস্কৃতিক অবদান : আব্বাসীয় খেলাফতের যুগে সাংস্কৃতিক অবদানের জন্য উজির নিজামুল-মুলকের সাহিত্য বিদ্যোৎসাহী খলিফা আব্দুল্লাহ-আল-মামুনের তুলনা করা যায়। তাঁর বিদ্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা ও নিশাপুরের মানমন্দির। পরবর্তীকালে নিজামিয়ার অনুস্মরণে মুসতান সারিয়া মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হয়। সুন্নী মতবাদ প্রচারে এই প্রতিষ্ঠানটি অতুলনীয়। মালিক শাহের রাজত্বকালে তাঁর দরবারে একত্রিত হয়েছিলেন কয়েকজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যাঁদের জ্ঞানগরিমা আজও আধুনিক জগৎকে

প্রভাবান্বিত করছে। অতিন্দ্রীয়বাদী কবি ফরিদউদ্দীন আত্তার, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক কবি ওমর খৈয়াম, কবি ও পরিব্রাজক নাসির খসরু, সাহিত্যিক নিজামি, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ইমাম গাজ্জালি প্রমুখ মনীষীগণ মালিক শাহের রাজত্বকালকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে কৃষ্টি ও সভ্যতার এক চরম সীমায় হাজির করতে পেরেছিলেন। খলিফা মামুনের সময় উন্নতি ছিল কিছুটা শিয়া ঘেঁষা, মালিকের সময় ছিল কিছুটা সুন্নী ঘেঁষা। তবে মামুন যেমন বড় বড় পণ্ডিতদেরকে শিয়া মনোভাবাপন্ন বা শিয়া-মতাবলম্বী করতে আদা জল খেয়ে নেমেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে মালিক শাহের জীবনে এই দুর্ভাগ্যটি ঘটে নি। জ্ঞানী সেখানে স্বাধীন ছিলেন, জ্ঞান যেখানে মুক্ত ছিল।

স্থাপত্যশিল্পেও সেলজুকগণ অসাধারণ কীর্তি রেখে গেছেন। পোড়া মাটির ইট, কারুকার্য খচিত মসজিদ, মাদ্রাসা, প্রাসাদ, অট্টালিকা প্রভৃতি সে যুগের স্থাপত্য-শিল্পের চরম নিদর্শন তুলে ধরে। পোপ বলেন—"মালিক শাহের ধর্মীয় অনুরাগ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা অনুপ্রাণিত করে পারস্যের বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানে, পরবর্তীকালে যেগুলি ইসলামী সাম্রাজ্যে জ্ঞানগরিমার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।" সেলজুক রাজত্বের অতুলনীয় স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে অন্যতম ছিল —রায়ের তুঘ্রিলের সমাধি (১১৩৯), ইস্পাহানের জামে মসজিদ (১০৭৫), আরদিস্তানে জামে মসজিদ (১১৮০), জাওয়ারা (১১৫৩) ও গুলপাইগানের জামে মসজিদ (১১২০-৩৫), মার্ভে সুলতান সালজারের সমাধি মন্দির (১১৫৭-৬০)।

এতদ্ব্যতীত সেলজুক বংশের কয়েকটি বড় অবদান—সুন্নী ইসলামের রক্ষা ও প্রচার এশিয়া মাইনরে বায়জান্টাইনদের আধিপত্যকে ধ্বংস করে মুসলিম প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা, যা প্রকারান্তে অটোমান সুলতানদের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করে। খ্রীস্টানদের পরাজিত করায় মুসলমানরা জেহাদের (ধর্মযুদ্ধ) অনুপ্রেরণা লাভ করে। সুতরাং সুন্নী ইসলামের পুনর্জীবন, খ্রীস্টানদের পরাজয়, অটোমানদের আগমন, শিয়া মতবাদের স্তিমিতকরণ, সবই সেলজুকদেরই অবদান। এক কথায় বলা বাহুল্য যে, সেলজুকদের পতন কালে ইসলামের ইতিহাসের পতন, যার অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের চিরবিদায় ঘনীভূত হল।

গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়, হাসান আল-সাব্বাহ: ইসলামী সাম্রাজ্যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের আবির্ভাব ঘটেছে, এটা নতুন কিছু নয়। এটা ছিল রাজ্যলাভের, ক্ষমতালাভের সংগ্রাম। কিন্তু কয়েকটি দুর্ভাগ্যজনক বিদ্রোহ উদ্দেশ্যবিহীন, ভাবে শুধু রক্তলোলুপ অধ্যায়ের সূচনা করে। যাদের উদ্দেশ্য বলতে শুধু ছিল লুঠতরাজ, হত্যা ইত্যাদি। তাদের কাজ ছিল গোপনে, তারা ছিল গুপ্তঘাতক। সুলতান মালিক শাহের রাজত্বের শেষ ভাগে এই নিকৃষ্ট গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ইসলামের ইতিহাসে একটি রক্তলোলুপ অধ্যায়েরও সূচনা করে অনেক

মূল্যবান প্রাণনাশ করে। মালিক শাহের রাজত্বের গুপ্তঘাতক দলের নেতা ছিল আল-হাসান আল-সাব্বাহ। সে ইরানের উত্তর-পশ্চিমে আলামুত পর্বত শিখরে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তাকে বলা হত 'Shaikh al Jibal' বা 'Old man of the Mountain'—'পর্বতের বৃদ্ধ লোক। আল-হাসান বাল্যকালে পারস্যের তুস অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু বংশ-মর্যাদা লাভের আশায় তিনি নিজেকে দক্ষিণ আরবের হিমারীয় বংশের মানুষ বলে দাবি করতেন। রায় নামক স্থানে তিনি 'বাতেনি' মতবাদে দীক্ষিত হয়ে মিশরে ফাতেমিদের আশ্রয়ে দেড় বছর অতিবাহিত করেন। পরে ফাতেমিদের সমর্থক ও প্রচারক হিসাবে তিনি ইরানে ঘাঁটি স্থাপন করেন। আলপ-আরসালানের সময় তিনি কিছুদিন সুলতানের রাজকীয় দণ্ড বা গদা বহনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে মালিক শাহের আমলেও তিনি তাঁর রাজত্বে চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু এইখানেই বাধল যত বিরোধ। হাসান ছিলেন মালিক শাহের রাজত্বের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, নিজামুল-মুলকের বাল্য বন্ধু ও সহপাঠী। হাসান তাঁর অসাধারণ বন্ধুর সমকক্ষ চাকরি ও সম্মান অর্জনে অক্ষম ও অসমর্থ হয়ে ঈর্ষা, দ্বেষ ও হিংসায় ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ও ব্যক্তি কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য সেলজুক রাজ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হন। এখানে তিনি রাজনৈতিক মদত, আশ্রয় ও সাহায্যও পেয়েছিলেন ফাতেমিদের। কেননা ফাতেমিগণ তাকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গুপ্ত সংগঠনে ও হিংসাত্মক এবং জিঘাংসামূলক কার্যকলাপে সাহায্য করেন। ফাতেমীদের সাহায্য ব্যতীত হাসান কখনও ব্যক্তি প্রচেষ্টায় বা একাকীভাবে ১০৯০ খ্রীঃ সমুদ্রের উপরিভাগ হতে ১০,২০০ ফুট উচ্চ আলামুত পর্বতে ঘাঁটি স্থাপন করতে সক্ষম হত না। একে 'ঈগলের বাসা' বলা হত। এটা ছিল মিশরীয় ফাতেমিদের রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক চাল। হাসানের শিষ্য ফিদাইগণ মাঝে মাঝে লুঠতরাজ, কখনও লুণ্ঠন, কখনও নৃশংস হত্যা প্রভৃতি দ্বারা রাজ্যে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করলে মালিক শাহ দুবার অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু সুলতান হাসানকে নির্মূল করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। হাসান কোন প্রকারেই নিজামুল-মুলকে হত্যা করতে না পেরে পরিশেষে কার্যোদ্ধারের জন্য একজন ফিদাইকে গভীর ষড়যন্ত্রে ছদ্মবেশে নিযুক্ত করলেন। তখন জনৈক 'ফিদাই' সুফীর ছদ্মবেশে সুফী প্রেমী ও সুফী গুণগ্রাহী নিজামুল-মুলকে অতি অতর্কিতে ও আকস্মিকভাবে হত্যা করে প্রভু হাসানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেলজুক রাজত্বের তথা মানব সভ্যতার একজন অভ্রান্ত দিশারীকে ধরনীর বুক হতে সরিয়ে দিলেন। পৃথিবীর রাজনীতি এমন জিনিস ও যার কূটনীতি এমনি মারাত্মক যন্ত্র, যা মানবমণ্ডলীর কোন দিকই, কোন কল্যাণই চিন্তা করে না শুধু চিন্তা করে ক্ষমতালোভী প্রভুর কথা ও কুমন্ত্রণামাত্র। এই গুপ্তঘাতক দল এমনি সুরক্ষিত

দুর্গে বসবাস করত, ১২৫৬ খ্রীঃ হালাকু খান ব্যতীত অপর কোন সুলতানের পক্ষে তাদের ধ্বংস করা সম্ভবপর হয়নি।

খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সময় (৮২২-৩৩ খ্রীঃ) বাবেক-খুররামির বিদ্রোহ, খলিফা মুতামিদের সময় (৮৭০-৯২ খ্রীঃ) আলি-ইবন-মহম্মদের 'জাঞ্জ' বিদ্রোহ, খলিফা মুতাজিদের সময় (৮৯২-৯০২ খ্রীঃ) হামদান কারমাতির বিদ্রোহ এবং সুলতান মালিক শাহের সময় (১০৭৩-৯২ খ্রীঃ) হাসান সাব্বাহের বিদ্রোহ, সব একই শ্রেণীর বিদ্রোহ। মূলগত এদের কোন পার্থক্য ছিল না, আবার গুণগত দিক থেকেও এরা একই। এদের মূল ভাল লক্ষ্য বলে তেমন কিছুই ছিল না, যদিও বা কারো কিছু ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যলাভের পথ ও পন্থা এতই বিভ্রান্তিকর ছিল যে, তা কোনদিনই হবার ছিল না। সকলেই লুণ্ঠন, হত্যা ও রমণী-সম্ভোগ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তাই এই বিদ্রোহগুলির কোনটাই কালের গর্ভে বেশিদিন টিকে থাকতেও পারেনি। তখনকার দিনে এই সমস্ত বিদ্রোহ হওয়ার বিশেষ কয়েকটি কারণ বা সুযোগও ছিল। যেমন যানবাহন ব্যবস্থা তখন বড়ই দুর্বল ছিল, সংবাদ সরবরাহ খুবই দেরিতে হত। বিশাল রাজ্যে কে কোথায় কি করছে, সহজে জানা যেত না। সেনাবাহিনী এক স্থানে পৌঁছবার পূর্বেই অন্য স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিত। তবুও এগুলির কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হত না। কেননা এদের কোন স্থায়ী নীতি বা লক্ষ্য ছিল না।

তৃতীয় পর্ব

আব্বাসীয় খেলাফতের শেষ লগ্ন

১১৮০–১২৫৮ খ্রীস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

শেষ প্রহরে শেষ চেষ্টা

খলিফা আল-নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রীঃ)

খাওয়ারিজমের শাহকে আহ্বান : আব্বাসীয় খেলাফতে যখন পতনের হাওয়া প্রবাহিত, খেলাফতের জোয়ার যখন একেবারেই ভাটার মুখে, পরিস্থিতি যখন প্রতিকূল, পরিবেশ যখন শত্রুভাবাপন্ন, তখন আব্বাসীয় খেলাফতের ৩৪তম খলিফা আবুল আব্বাস আহম্মদ 'আল-নাসির দীনিল্লাহ' উমাইয়া খলিফা হিশামের মতো খেলাফতের পূর্ব গৌরব ফেরাতে বদ্ধপরিকর হলেন। আব্বাসীয় খেলাফতের জন্মলগ্ন হতেই খেলাফতের মধ্যেই কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভবের চেষ্টা হতে থাকে। যেমন আব্বাসীয়গণের দামেস্ক অধিকারের (২৬ এপ্রিল, ৭৫০ খ্রীঃ) ঠিক ছয় বছর পরই (১৪ মে, ৭৫৬ খ্রীঃ) উমাইয়া রাজবংশের একজন যুবরাজ স্পেনে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তখন হতে আরম্ভ হয় আব্বাসীয় খেলাফতের স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব, যা চলতে থাকে সেলজুক বংশের পতন (১১৯৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত। এই সমস্ত স্বাধীন রাজবংশের মধ্যে অন্যতম ছিল—শিয়া বুয়াইয়া রাজবংশ ও সুন্নী সেলজুক রাজবংশ। বিশেষ করে এই দুই রাজবংশের আমলে আব্বাসীয় খলিফাগণ ছিলেন নামে মাত্র স্বাক্ষীগোপাল। এমনকি বুয়াইয়া আমলে তাঁদের অবগতির কোন সীমা ছিল না। রাজ্য-রাজস্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি, অর্থ-সম্পদ ও শান-শওকত সবকিছুরই মালিক ছিলেন বুয়াইয়া আমীর ও সেলজুক সুলতানগণ। সর্বশেষে সেলজুক বংশ যখন আপন গৃহ-বিবাদে মত্ত, আত্মকলহে বিভোর, তখন সুযোগ বুঝে আব্বাসীয় খলিফা আল-নাসির ক্ষমতা হস্তগত করার নিমিত্ত ঝাঁপ দিলেন। তিনি সেলজুক ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য প্রথমেই সেলজুকদের প্রাদেশিক বিদ্রোহী শাসনকর্তা খাওয়ারিজম শাহের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেন। কিন্তু খাওয়ারিজম শাহের শক্তি যখন তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন তিনি তাঁর বিরুদ্ধে মঙ্গলগণকে ইন্ধন যোগাতে বাধ্য হলেন, যদিও কোনটিরই ফল ভাল হয়নি। নিজের উপযুক্ত অর্থবল ও সামরিক শক্তি না থাকার জন্য খলিফা ঐ পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও তিনি ভালভাবেই জানতেন যে কেউ আপন শক্তি ব্যয় করে তাঁকে শাহানশাহ করবেন না। তবুও তিনি শেষ চেষ্টা করেছিলেন।

মঙ্গল নেতা চেঙ্গিজকে আমন্ত্রণ : খলিফা নাসিরের প্ররোচনায় খাওয়ারিজম শাহ তাকাশ ইরাক-ই-আজমের শাসনকর্তা দ্বিতীয় সুলতান তুঘ্রিলকে ১১৯৪ খ্রীঃ

আক্রমণ করে পরাজিত ও নিহত করেন। নাসির মনে করেছিলেন খাওয়ারিজম কিছু ধনসম্পদ সংগ্রহ করে আপন স্থানে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি সেলজুকদের রাজ্য দখল করবেন। কিন্তু শাহ তাকাশ আপন রাজ্য বৃদ্ধিতে এই সুযোগ ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি এখন নিজেকে সেলজুকদের স্থলাভিষিক্ত মনে করে খেলাফতের যাবতীয় জিনিসের দাবি করে বসলেন। খলিফা নাসির প্রমাদ গুনলেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থেকে 'তাকাশ' যখন পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন তখন খলিফা তাঁর উজিরের সাহায্যে খুজিস্তান ও অন্যান্য অঞ্চলগুলি দখল করলেন (১১৯৬ খ্রীঃ)। কিন্তু তাকাশ প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ সকল অঞ্চল পুনর্দখল করেন। তাকাশের মৃত্যুর পরও তাঁর পুত্রও উত্তরাধিকারী খাওয়ারিজমের নতুন শাহ আলাউদ্দীন মুহম্মদের সাথেও খলিফার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে। আলাউদ্দীন পারস্যের সমগ্র অঞ্চল দখল করে বুখারা ও সমরকন্দ অধিকার করেন (১২১০ খ্রীঃ)। আলাউদ্দীন ১২১৪ খ্রীঃ আফগানিস্তানে প্রবেশ করে গজনী অধিকার করেন। অতঃপর তিনি আব্বাসীয় খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে একজন আলাবীকে খলিফার পদে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর আলেমদের দ্বারা একটি ফতোয়া জারি করে নাসিরকে খেলাফতের অনুপযুক্ত ও অযোগ্য বলে ঘোষণা করে এই নতুন খলিফার নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রায় তাঁর নাম অংকিত করলেন। তখন খলিফা নাসির আলাপ-আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে মঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খানকে খাওয়ারিজম শাহ আলাউদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করার জন্য আহ্বান জানালেন।

আব্বাসীয় খেলাফতকে ধ্বংসের পরিকল্পনা: ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন আব্বাসীয় খেলাফতকে চিরতরে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে হামাদান হতে বাগদাদের দিকে যাত্রা করলে তাঁকে বাধাদানের কোন ক্ষমতাই খলিফার ছিল না। কিন্তু নিয়তি আলাউদ্দীনের বাদ সাধল, কঠোর শীতের জন্য আলাউদ্দীন পরের বছর বাগদাদ আক্রমণের কামনা নিয়ে খোরাসানে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। এবারের জন্য সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র বাগদাদ প্রলয় ও ধ্বংস হতে বেঁচে গেল।

চেঙ্গিজ খানের আক্রমণ: ইতিমধ্যে চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মঙ্গলগণ গোবী মরুভূমির উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত মঙ্গোলিয়া হতে বের হয়ে মুসলিম জগতের ওপর ব্যাঘ্র যেন হরিণের পালে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের বর্বর আক্রমণের সম্মুখে বহুদিনের বহু জ্ঞানতাপসের গড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বলখ, বুখারা, হিরাত ও সমরকন্দ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। মনুষ্যজগৎ, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, শিল্প ও স্থাপত্য জগৎ কেউই রক্ষা পেল না। সকলেরই একটিই পরিণত হল—ধ্বংস। নারী, শিশু, বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ কেউই পরিত্রাণ পেল না। মানুষের রক্তস্রোতে ধরণী রঞ্জিত হল। মাত্র ৬০,০০০ মঙ্গলদের আক্রমণের সম্মুখে খাওয়ারিজম শাহ আলাউদ্দীন মহম্মদ পরাজিত হয়ে প্রাণভয়ে

কাস্পিয়ানের একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানেই শোচনীয়ভাবে তাঁর মৃত্যু হয় ১২২০ খ্রীঃ, অথচ এই সেদিন মাত্র ১০৭১ খ্রীঃ সেলজুক বীর আলপ আরসালান মাত্র ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে মানজাফার্দের যুদ্ধে ২,০০,০০০ রোমান বাহিনীকে পরাজিত ও বন্দী করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। আসলে মুসলিমা-বাহিনী পরবর্তী সময় আপন গৃহদ্বন্দ্বেই আপনার আত্মবিশ্বাসকেই হারিয়ে ফেলেছিল।

ঘাতক হাসানের আনুগত্য স্বীকার ঃ মোঙ্গলগণ কিছুকালের জন্য চলে গেলে আলাউদ্দিনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জালালুদ্দিন খলিফা নাসিরকে আক্রমণ করে তাঁর নিকট হতে খুজিস্তান ছিনিয়ে নেন। খলিফা নাসির তখন সর্বক্ষণ পূর্বাঞ্চলে মনোনিবেশ করায় পশ্চিমাঞ্চলের ঘটনাবলীর প্রতি মনোসংযোগ করতে পারেননি। বিশ্ববিশ্রুত মুসলিম বীর সালাউদ্দিন এই সময় ক্রুসেডারদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। আকুল আবেদন করেও খলিফার নিকট তেমন কোন সাহায্য পাননি। খলিফা নাসির মতবাদের দিক দিয়ে কিছুটা উদার ও শিয়া-ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি তাঁর দরবারে শিয়া ও সুন্নীগণের সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফলকাম হননি। তিনি আলামুতের ঘাতক সম্প্রদায়কে সমঝোতার মধ্যে পেলে ১২১২ খ্রীঃ ঘাতক সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু তৃতীয় হাসান খলিফার আনুগত্য স্বীকার করেন।

ফতুয়া সংঘের প্রতিষ্ঠা ঃ খলিফা নাসির ফতুওয়া নামক একটি ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠা করলে বহু ছোটখাটো রাজা-বাদশা ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে তাঁকে নেতা বলে মেনে নেন। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও বিশেষ পোশাক পরিহিত অবস্থায় খলিফা নতুন সদস্যদের দীক্ষিত করতেন। তিনি হজরত আলি (রাঃ)-এর বংশধরদেরও অবাধে গ্রহণ করতেন। এই সংঘের দ্বারা খলিফার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও কিছুটা সাধিত হয়েছিল।

খলিফা নাসিরের মৃত্যু ঃ ১২২৫ খ্রীঃ সত্তর বছর বয়সে খলিফা নাসির দীর্ঘ ৪৭ বছর খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুবরণ করেন। খেলাফতের হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি আজীবন অক্লান্তভাবে সাধনা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। কেননা, তাঁর অর্থবল ও সামরিক শক্তি ছিল বড় সীমিত। যার ফলে তাঁকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও তিনি নানা কারণে ব্যর্থকাম হন। পরিস্থিতি পরিবেশ কোনটাই তার অনুকূলে যায়নি, স্বয়ং নিয়তি যেন বাদ সাধল তাঁর কৃতকার্যতায়। এখানে খলিফা নাসিরের সাথে উমাইয়া খেলাফতের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সুন্দর একটি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়েই কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু উভয়েরই পক্ষে নিয়তি যেন সাড়া দিল না, তাঁদের ভাগ্য যেন পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল।

এত কিছু সত্ত্বেও খলিফা নাসিরের সময় জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। তিনি স্বহস্তে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন, দরিদ্রের প্রতি তাঁর বদান্যতা, শিক্ষার প্রতি আন্তরিকতা, শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ তা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বাগদাদের তাবিজ ফটক ও সামাররায় প্রতিষ্ঠিত মাহদির অদৃশ্য স্থান তাঁর স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন বহন করে। তাবিজ ফটকের ওপর দুটি ড্রাগনের মধ্যস্থলে খলিফার প্রতিমূর্তি তাদের চোয়াল বিযুক্ত করে তাদের জিহ্বা ধরে আছে। খুব সম্ভব ড্রাগন দুটো—আলমুতের প্রধান গুরু তৃতীয় হাসান ও খাওয়ারিজমের শাহ আলাউদ্দিনকে বোঝাচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্তিম শয়ানে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন

খলিফা আল-জাহির—১২২৫-২৬ খ্রীঃ
খলিফা আল-মুসতানসির—১২২৬-৪২ খ্রীঃ
খলিফা আল-মুসতাসিম—১২৪২-৫৮ খ্রীঃ

বহিঃশত্রুকে চারবার আমন্ত্রণ ও তার ফলস্বরূপ শেষ রক্ষা হল না ঃ

আল-মুসতাসিম ঃ খলিফা আল-মুসতানসিরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফা. আল-মুসতাসিম ১২৪২ খ্রীঃ হতে ১২৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত খেলাফতে অধিষ্ঠিত থাকেন। খলিফা একদিকে ছিলেন দুর্বল, আবার অপর-দিকে ছিলেন বিলাসপ্রিয়। রাজ্যে না ছিল অর্থবল ও সামরিক বল, আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতার জন্য রাজ্যে নানা অসন্তোষ দেখা দেয়, আবার সামরিক শক্তি হীনবল হওয়ার বহিঃশত্রুর বাড়াবাড়িও দেখা দেয়। এই অবস্থায় হানাফী ও হাম্বলী সম্প্রদায়ের ঝগড়া, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠে যায়। খলিফা ছিলেন নিজে সুন্নী-মতাবলম্বী, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে খলিফা সকল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের খলিফা, তিনি সবার উর্ধ্বে সকলকে মানিয়ে চলা ছিল তাঁর প্রথম প্রধান কর্তব্য। তিনি তাঁর ঐ মহান কর্তব্য পালন না করে স্বয়ং তাঁর পুত্র আবুবকরকে নির্দেশ দিলেন শিয়াদের বাসস্থান ও কবরস্থানগুলি ধূলিসাৎ করতে। এইভাবে যখন শিয়াদের প্রতি অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করল, তখন স্বয়ং খলিফার শিয়া-উজির মহম্মদ বিন-কামি তাতাতের মোঙ্গল নেতা হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এইভাবে একদিন আব্বাসীয় খলিফা মুসতাকফি (৯৪৪-৪৬ খ্রীঃ) তুর্কী বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বুয়াইয়া আমীর আহম্মদকে প্রথম বাগদাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, ফলে আব্বাসীয় খেলাফতে বুয়াইয়া রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। তবুও আব্বাসীয় খেলাফত ধরার ইতিহাস থেকে একেবারে মুছে গেল না। এইভাবে আব একদিন অন্য একজন আব্বাসীয় খলিফা আল-কাইম দ্বিতীয়বার (১০৩১-৭৫) ১০৫৫ খ্রীঃ বুয়াইয়া আমীরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই সেলজুক নেতা তুঘ্রল বেগকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানান। তৃতীয়বার খলিফা নাসির (১১৮০-১২২৫ খ্রীঃ) মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খানকে আক্রমণের আহ্বান জানান' ১২২০ খ্রীঃ এবারও আব্বাসীয় খেলাফত নামে-বেনামে রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু চতুর্থবার যখন কোন খলিফা নন, বরং খলিফার মন্ত্রী এমন এক ব্যক্তিকে আক্রমণের আমন্ত্রণ জানালেন, যে বার আব্বাসীয় খেলাফত আর শেষ রক্ষা পেল না। তিনবার আল্লাহ্ তাঁদের

ক্ষমা করেছিলেন, চতুর্থবারে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর চাবুককে, (Scourge of god-আল্লাহর চাবুক) বর্বর হালাকু খানকে। খোদার চাবুক হালাকু খান পথিমধ্যে গুপ্তঘাতক দলকে নিশ্চিহ্ন করে তাব্রিজের পথে বাগদাদের দিকে রওনা হন। প্রথমে খলিফা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করলে হালাকু খান বাগদাদ অবরোধ করেন। তখন দুর্বল খলিফা তাঁর দুর্বল সেনাবাহিনী দ্বারা দুর্ধর্ষ ও রক্তপিপাসু মোঙ্গলদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে ১২৫৮ খ্রীঃ বর্বর হালাকু খান ছ সপ্তাহ ধরে বাগদাদে নারকীয় লুঠতরাজ, নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা, অনুপম প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি, শিক্ষায়তন, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল সমস্ত কিছুকে একেবারেই ধূলিসাৎ করে ভস্মীভূত করেন, এবং খলিফাকে সপরিবারে বধ করেন। আমীর আলি বলেন—"পাঁচ শতাব্দী ধরে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে মানবজাতি এক নিমিষে হারাল, একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এবং সারাসিনীয় জগতের চক্ষু এবং কেন্দ্র বাগদাদ নগরী চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।" অন্তিম শয়ানে শায়িত বিশাল বাগদাদ খেলাফত চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ল।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশাল আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের অন্তরালে বিবিধ কারণ

সূচনা ঃ আব্বাসীয় যুগের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস 'সাফফাহ (রক্ত গ্রহণকারী বা রক্তপিপাসু) উপাধি গ্রহণ করে ৭৫০ খ্রীঃ আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৫৮ খ্রীঃ দুর্ধর্ষ ও দুরাত্মা এবং বর্বর মঙ্গলীয় তাতার নেতা হালাকু খানের আক্রমণে এই সুবিশাল খেলাফত একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই অধঃপতন, বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তি এবং মহাপতনের কারণ কি শুধু একমাত্র হালাকু খান, তা নয়। সর্বমোট সাঁইত্রিশজন খলিফা দ্বারা শাসিত বহুধাবিভক্ত এই বিশাল খেলাফতের পতনের মূলে ছিল বহু শতাব্দীর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিশৃঙ্খলা ও বিবিধ কারণ। হালাকু খানের আক্রমণজনিত পতন ছিল ঐ বিশৃঙ্খলা ও বিবিধ কারণগুলির শেষ পরিণতি মাত্র। বিবিধ কারণগুলি—

ইবনে খালদুনের নীতি ঃ একটি ব্যক্তি বা জাতির জীবনের উত্থান ও পতনের নীতি নির্ধারণের ইতিহাসে ইবনে খালদুনের অভিমত বা নীতি প্রায় সর্বজনবিদিত বা স্বীকৃত। উত্থানের যেমন আছে সূচনা, ক্রমবিকাশ ও উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ, পতনেরও তেমনি আছে যথাক্রমে তিনটি ধারা। ইবনে খালদুনের অভিমত, কোন একক ব্যক্তিভিত্তিক বংশানুক্রমিক শাসন শতাব্দীর অধিক কাল স্থায়ী হয় না বা পূর্ণতেজে চলতে পারে না। কেননা একক বংশ হতে উদ্ভূত শাসকগণের মধ্যে পরবর্তীকালে সাংগঠনিক শক্তি যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি বিলাস, আরাম-আয়াসও এসে পড়ে, ফলে রাজ-চরিত্রে এসে যায় নানা দুর্বলতা, রাজশক্তি হয় ক্ষীণ ও ক্ষয়িষ্ণু। সুতরাং যেখানে শক্তি হয় দুর্বল, সেখানে শত্রু হয় প্রবল। এই দুর্বল ও প্রবলের সংঘর্ষে ও সংঘাতে দুর্বলের পরাজয় ও পতন যেমন অনিবার্য হয়, প্রবলের জয়ও তেমনি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আব্বাসীয় বংশের পতনের ইতিহাসে আমরা যা কিছু লক্ষ্য করি, পূর্ববর্তী উমাইয়া খেলাফতের পতনেও তার কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি না। যদিও উমাইয়া খেলাফতের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র নব্বই বছর (৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ), যেখানে আব্বাসীয় খেলাফতের আয়ুষ্কাল প্রায় পাঁচশ' বছর। এই পাঁচশ' বছর আব্বাসীয় খেলাফত বেঁচে থাকলেও তার খেলাফতের প্রকৃতপক্ষে প্রাণশক্তি ছিল মাত্র একশ' বছরের মতো, অর্থাৎ ৭৫০-৮৬১ খ্রীঃ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত মাত্র। কিন্তু আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের সূচনাও হয় এই দশম খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সময় (৮৪৭-৮৬১ খ্রীঃ) হতেই। কেননা খলিফা তাঁর আপন পুত্র অর্থাৎ একাদশ খলিফা আল-মুতাসিম কর্তৃক তুর্কী সেনাদের দ্বারা নিহত হন। আল-মুতাসিম

সিংহাসনে আরোহণ করলেও ক্রীড়নক হলেন তুর্কী বাহিনীর হাতে। সুতরাং আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের বীজ 'বিশৃংখলা' রোপিত হল খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সময়েই (৮৪৭-৬১ খ্রীঃ)। খলিফাকে আকস্মিক হত্যা বা বধ করাটা প্রকারান্তে আব্বাসীয় খেলাফতের শাসন ও শৃংখলাকেই যেন বধ করল। অতঃপর আরম্ভ হল—বিশৃংখলার যুগ। অতএব আব্বাসীয় খেলাফতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বলতে ৭৫০-৮৩৭ খ্রীঃ বা ৭৫০-৮৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় একশ' বছরের মতো। এই একশ' বছর পরই যাঁরাই খেলাফত লাভ করলেন তাঁরা খলিফার প্রকৃত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সবকিছু হারিয়ে আমীর ও উজিরদের ক্রীড়নকরূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন মাত্র। সুতরাং ইবনে খালদুন বর্ণিত ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন যথাসময়েই আরম্ভ হয়েছিল একশ' বছর পর। তাই এই একশ' বছর অতিক্রান্ত হওয়াটাও আব্বাসীয় খেলাফতের পতনেরও অন্যতম প্রথম কারণ ছিল।

অযোগ্য উত্তরাধিকারীগণ: আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল—অযোগ্য, দুর্বল, অপদার্থ, অক্ষম ও বিলাসপ্রিয় উত্তরাধিকারীগণ। সর্বমোট ৩৭ জন খলিফার মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেউই শাসন-কার্যে সুনাম অর্জন করতে পারেননি। তাই ঐতিহাসিক সালাবী বলেন—"খলিফা আল-মনসুর আব্বাসীয় খেলাফতের যে গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা করেন, খলিফা আল-মামুন তা পরিপূর্ণ করেন এবং খলিফা আল-মুতাজিদ তার যবনিকাপাত করেন।" খলিফা আল-মনসুরকে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও বলা যেতে পারে। খলিফা মাহদি ও হারুণ ছিলেন তার যোগ্য উত্তরাধিকারী, কিন্তু আব্বাসীয় খেলাফতের প্রাণপুরুষ ও তার স্বর্ণযুগের প্রবাদ পুরুষ খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মামুন তাঁর অসাধারণ কর্মস্পৃহা, অস্বাভাবিক বিচক্ষণতা, অতুলনীয় বিদ্যোৎসাহিতা এবং দূরদর্শিতার দ্বারা যে অসামান্য কীর্তি রেখে গেলেন তাঁর পরবর্তী অযোগ্য খলিফাগণ ভোগবিলাসে মগ্ন থেকে কোথাও আভ্যন্তরীণ অরাজকতায়, অন্তর্দ্বন্দ্বে, কোথাও বা মন্ত্রীদের শিকারে পরিণত হয়ে, কোথাও সৈনিকদের ষড়যন্ত্রের বন্ধজালে আবদ্ধ হয়ে বিশাল খেলাফতকে বিলীন করলেন। তাই খেলাফতের পতনের মূলে অযোগ্য খলিফাগণ কমদায়ী ছিলেন না।

সাম্রাজ্যের বিশালতা: উমাইয়া খলিফা প্রথম আল-ওয়ালিদ যে বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন, তাকে সাধারণত বলা হত আরব রাজত্ব। এই আরব রাজত্বে আরব জাতীয়তাবাদ প্রাধান্য পেয়েছিল এবং আব্বাসীয় খেলাফতকে বলা হত ইসলামী সাম্রাজ্য, কেননা এই সাম্রাজ্য প্রথমদিকে ইসলামের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ তৎকালীন বিশ্বে সর্ববৃহৎ ইসলামী সাম্রাজ্যের পত্তন করতে সক্ষম হয়। তাই বার্নার্ড লুইস বলেন—"উমাইয়া শাসনকে 'আরব রাজত্ব' ও আব্বাসীয় খেলাফতকে ইসলামী সাম্রাজ্য বলা যেতে পারে।" প্রথমদিকে সাম্রাজ্যের

সম্প্রসারণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপকতাও নিহিত ছিল। পতনের দিক থেকে উমাইয়া খেলাফতের সঙ্গে আব্বাসীয় খেলাফতের তুলনা করলে বলা চলে যে উমাইয়া খেলাফতে গৃহ-দ্বন্দ্ব আরম্ভ হলেও কেন্দ্রীয় শাসন ছিল প্রবল। সেখানে বহিরাগত কেউ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি। কিন্তু আব্বাসীয় খেলাফতে সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য দিকগুলি উন্নতির আকাশ স্পর্শ করলেও কেন্দ্রীয় শাসন ছিল দুর্বল। আব্বাসীয় খেলাফতের কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের অক্ষমতাই এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। আরব সাম্রাজ্যের বিশালতাও কেন্দ্রকে বিব্রত করে তোলে। তদানীন্তন আব্বাসীয় সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে সিন্ধুনদ এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক কথায় এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে যার ব্যাপকতা তার শাসন ব্যবস্থাও সেইরূপ হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাস্তাঘাটের অভাবে দ্রুত যানবাহন সে যুগে ছিল না বললেই চলে, সকল প্রদেশের সংবাদ সময়মতো রাজধানী বাগদাদে পৌঁছাত না, যার ফলে খলিফা বিদ্রোহ দমনে দ্রুত কোন অভিযানও প্রেরণ করতে পারতেন না। দেখা দিল কোথাও প্রাদেশিক বিদ্রোহ, কোথাও বিজাতি বিদ্রোহ, তখন বিশাল সাম্রাজ্য হারাল তার শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা প্রভৃতি। এইভাবে কেন্দ্রীয় দুর্বল শাসকের সাম্রাজ্যের বিশালতা আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ রূপে দেখা দিয়ে ডেকে আসল পতন।

স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে কতকগুলি কারণ ছিল, যেমন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রবর্তনের অভাব, সাম্রাজ্যের বিশালতা, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, সৈনিকদের বিদ্রোহ, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি কারণে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য শতধা বিভক্ত হতে আরম্ভ হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আব্বাসীয় যুগে প্রথম হতেই লক্ষ্য করা যায়। ৭৫০ খ্রীঃ আব্বাসীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৭৫৬ খ্রীঃ স্পেনে উমাইয়া খলিফা হিশামের পৌত্র আব্দুর রহমান একটি স্বাধীন উমাইয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ৮০০ খ্রীঃ উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা ইব্রাহিম ইবন আগলাব কর্তৃক স্বাধীন আগলবী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। স্বয়ং খলিফা মামুনের আমলে স্বাধীন তাহিরী বংশের জন্ম হয়। এতদ্ব্যতীত পরবর্তীকালে সমগ্র আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রের কায়েম হতে থাকে। যেমন—তুলুনীয় বংশ, ইখশীদি বংশ, হামদানি বংশ, সাফফারি বংশ, সামানি বংশ, জিয়ারি বংশ, গজনবী বংশ, বুয়াইয়া বংশ, সেলজুক বংশ এবং ফাতেমি বংশ প্রভৃতি। কোথাও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে, কোথাও সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর অভাব, কোথাও বিশ্বস্ত কর্মচারীর অভাব, এই সমস্ত নানা অভাবে খলিফাদের পক্ষে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যগুলিকে জয় করে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে কেন্দ্র দিনের পর দিন

দুর্বল হতে দুর্বলতর হল, বিশাল সাম্রাজ্য হারাল তার ঐক্য ও সংহতি। তাই হিট্টি বলেন—"রোগী ইতিপূর্বেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল, সে কথার টের পেয়ে চোর দরজা ভেঙে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রাজকীয় সম্পত্তি হতে স্বত্ব অংশ কেড়ে নেয়।" পতনের এটাও ছিল একটি প্রধান কারণ।

দুর্বল সেনাবাহিনী: উমাইয়া যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সামরিক বিজয় এবং আব্বাসীয় যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষ্টি ও সভ্যতার জয়। উমাইয়া যুগের সেনাবাহিনী ছিল আরব জাতীয়তাবাদী, যা ছিল একেবারেই নির্ভেজাল। যার জন্মদাতা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় সৎ খলিফা হজরত ওমর (রাঃ)। চিন্তানায়ক হজরত ওমরের চিন্তা হতেই একদিন এই নির্ভেজাল সেনাবাহিনী জন্ম দিয়েছিল—পৃথিবীর একমাত্র অজেয় বীর সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদ, মুসলিম আলেকজান্ডার—উকবা বিন নাফির, স্পেন বিজয়ী বীর মুসা ও তারিকের, সিন্ধু বিজয়ী বীর মুহম্মদ-বিন-কাসিমের। পরবর্তী যুগে আব্বাসীয় খেলাফত যখন বহু জাতি, বহু ধর্মের, বহু সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে মানুষের কৃষ্টি সভ্যতার দ্বারোদ্ঘাটন করে সংস্কার মুক্ত মনের পরিচয় দিল, তখনই সে তার অজ্ঞাতসারেই তাঁর আরব জাতীয়তাবাদের সম্মোহনী শক্তিকে হারাল, যার ফলশ্রুতি স্বরূপ দেখা দিল দুর্বল সেনাবাহিনী। পরবর্তীকালে তাই দেখা গেল উমাইয়াগণ খেলাফত হারাল তাদের অভ্যন্তরীণ কলহে, যেখানে আব্বাসীয়গণ খেলাফত হারাল বহিঃশত্রুর আক্রমণে।

আব্বাসীয়গণ প্রধানত পারস্য সেনাবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতালাভ করেন, এবং তাঁরা খেলাফত লাভ করার পর তাঁদের সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন জাতি, গোত্র এবং ধর্ম মতাবলম্বীদের সমাবেশ করায় সেনাবাহিনী তার অদম্য শক্তি, অনুপ্রেরণা এবং রণকৌশল হারাল। সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা, ইরাক, পারস্য ও ট্রান্সক্সিয়ানার বহু নব-দীক্ষিত মুসলমানগণ আব্বাসীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে জাতি বা গোত্রভিত্তিক সেনাবাহিনীও গঠন করা হয়, যার ফলে সেনাবাহিনী অধিকতর দুর্বল হয়ে তার প্রাণশক্তি ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আল-মনসুর প্রথম মিশরীয়, মুদারীয় ও খুরাশালী নামে তিনটি পৃথক জাতিভিত্তিক সৈন্যবাহিনী গঠন করে আব্বাসীয় সেনাবাহিনীর মূলে আঘাত করলেন। পরে বিশাল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য আর কোনদিনই সুসংগঠিত বিশাল সেনাবাহিনী গঠিত না হওয়ায় আব্বাসীয় যুগের পতন ধীরে ধীরে অনিবার্য হয়ে উঠল। খলিফা মুতাসিম (৮৩৩-৪২ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ তুর্কীদের নিয়ে একটি প্রবল ক্ষমতা-সম্পন্ন বাহিনী গঠন করলে আরব, ইরান ও তুর্কী সেনা দলের মধ্যে দ্বেষ, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষাপরায়ণতা সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে। অপরদিকে খলিফাদেরও ত্রুটির কোন অভাব ছিল না। খলিফাদের অবহেলা ও উদাসীনতার

ফলে সৈন্যদল নিয়মিত বেতন পাওয়া হতে বঞ্চিত হওয়ায় সামরিক বাহিনীর এতদূর অবনতি ঘটে যে তারা স্বয়ং খলিফা আল-মাতুজকে হত্যা করে আব্বাসীয় বাহিনীকে কলঙ্কিত করে। অপরদিকে, এই বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনী বহিঃশত্রুর ও বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করতেও ব্যর্থ হয়। আল-মুকতাদিরের রাজত্বে বাইজান্টাইনদের আক্রমণ প্রতিহত করতে আব্বাসীয় সেনাবাহিনী যেমন অযোগ্যতার পরিচয় দেয়, ক্রুসেডের (ধর্মযুদ্ধ) যুদ্ধেও তেমনি তারা অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে সর্বশেষ খলিফা আল-মুসতাসিমের রাজত্বে আব্বাসীয় খেলাফতের মহাপতনের স্বাক্ষী রূপে বর্বর তাতার নেতা হালাকু খানের সেনাবাহিনীর সম্মুখে তারা ইসলামের ইতিহাসে একেবারেই অপদার্থতার পরিচয় রেখে যায়। একদিন মাত্র কতিপয় মুসলিম সেনাপতির অপূর্ব রণকৌশলে, অভূতপূর্ব শৌর্যে-বীর্যে, অসাধারণ সাহস ও সংগ্রামে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে ইসলামের যে বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হয়েছিল, তা আজ অযোগ্য অপদার্থ বহু লক্ষাধিক সেনাবাহিনীর স্বারা অবনমিত হল। সেদিনের দক্ষ সেনাপতিগণ ও যোগ্য সেনাবাহিনী সমরে নেমেছিলেন দুটো জিনিসকে মাত্র বক্ষে ধারণ করে—সমরে জিতলে হবো গাজী, হারলে হবো শহীদ (স্বর্গলাভ)। পতনের যুগেও সেনাবাহিনীর বুকে দুটো জিনিসই ছিল—একটি লোভ ও অন্যটি ভয়। তাই আব্বাসীয় পতনের প্রধান কারণ ছিল লোভী ও ভীতু সেনাবাহিনী।

সুনির্দিষ্ট মনোনয়ন নীতির অভাব: উমাইয়া খেলাফতের পতনের একটি অন্যতম কারণ ছিল সুষ্ঠু মনোনয়ন নীতির অভাব। আব্বাসীয় খেলাফতও ঐ রোগ হতে নিষ্কৃতি লাভ করেনি। নির্দিষ্ট নীতির অভাবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে রাজ-পরিবারে দেখা দিল নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ, স্বার্থান্বেষী কোন্দল, ষড়যন্ত্র ও রক্তপাত। এর মূলে ছিল একটিই কারণ, নির্দিষ্ট মনোনয়ন নীতির অভাব। এই নীতির অভাবে যে কোন একজন খলিফার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্য প্রভৃতির মধ্যে আরম্ভ হত প্রবল আত্মকলহ, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি। ফলে রাজ্যের সংহতি ও স্থিতিশীলতা একেবারেই বিনষ্ট হয়। প্রমাণ স্বরূপ হারুণের মতো ন্যায়পরায়ণ খলিফার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আমিন ও মামুনের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তাই গৃহযুদ্ধ নামে পরিচিত। ঠিক এই উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করেই আল-মুনতাসির তাঁর পিতা খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলকে দেহরক্ষী ও সেনাবাহিনীর সাথে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে হত্যা করেন। এইভাবে আব্বাসীয় খেলাফত সুষ্ঠু মনোনয়ন নীতি অভাবে আত্মকলহের একটি আখড়াখানাতে পরিণত হয়ে শেষের দিকে এক মারাত্মক পরিস্থিতির সূচনা করে খেলাফতের পতনকে অনিবার্য করে তোলে।

গোষ্ঠীগত কলহ: একদিন গোষ্ঠীগত কলহ যেমন উমাইয়া রাজত্বকে সর্বনাশের দিকে টেনে এনেছিল, তেমনি আব্বাসীয় রাজত্বেরও সর্বনাশ ডেকে

আনল। আরব-মুসলমান, অন-আরব মুসলমান ও নব-দীক্ষিত মুসলমানদের গোত্র কলহ যেমন উমাইয়াদের দুর্বল করেছিল, আব্বাসীয়দের তেমনি শুধু দুর্বলই করল না, একেবারেই দুনিয়ার মাটি হতে মুছে দিল। ঠিক অনুরূপভাবে হিম্‌রীয় ও মুদারীয় কলহ, পারস্য ও তুর্কী কলহ, হেমেটিক ও বর্বরদের কলহ আব্বাসীয়কেও শক্তিহীন করে তোলে। ইসলামের যে মূলবাণী—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, মানুষ মাত্রকেই ভাই জ্ঞান করা, আত্মার উপলব্ধি ও উত্তরণ, এই সমস্তকে তাঁরা অন্তরের সাথে বরণ করতে পারেননি। তাই উমাইয়া রাজত্বের অর্থই ছিল অন-আরবদের ওপর আরবদের প্রভুত্ব। হারুণের রাজত্বে আরবদের ওপর লক্ষ্য করা যায় পারস্যের গুরুত্ব, আবার আমিনের খেলাফতে পারস্যের ওপর আরবদের প্রভুত্ব, আমিনের পরাজয় ও মামুনের জয়ে লক্ষণীয় হয় বিপরীত জিনিস। এক কথায় আব্বাসীয় খেলাফত উমাইয়া খেলাফতের মতোই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রকে এক সূত্রে বাঁধার কোন নীতি বা প্রেরণা ঘোষণা করতে পারেনি। মহানবীর ঘোষণা ছিল—'সকল মানুষ এক, সকল মুসলমানই ভাই ভাই।' এই মহাবাণীকে মুসলমানগণ পরবর্তী অধ্যায়ে নিজেদের মধ্যে প্রয়োগ করতে না পারায় প্রকারান্তে ধ্বংসকেই আহ্বান জানিয়েছিল। মুসলমানগণ ভুলে গেল মহানবীর মহাবাণীকে এবং কোরআনের পবিত্র বাণীকেও—"আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়েরই অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ চরিত্রের অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।"—১৩ ঃ ১১। মুসলমানদের উত্থানের মূলে ছিল মহানবীর মহাবাণীর প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং তাঁদের পতনেরও মূলে ছিল ঐ মহাবাণীর প্রতি অবহেলা।

ধর্মীয় বিভেদঃ ইসলামধর্ম মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছিল, এককে একত্র করতে বলেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজ্যের কর্ণধার ও মুসলমানগণ সেই ধর্মকেই কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও অনৈসলামিক কার্যকলাপে আব্বাসীয় খেলাফতে অতি নৈরাশ্য-জনক ধর্মীয় অরাজকতার সৃষ্টি করে। উমাইয়াগণ রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসাবে যেখানে খলিফার মর্যাদা লাভ করেন, আব্বাসীয়গণ সেখানে আমীরুল মুমেনীন বিশ্বাসীদের নেতার পদ অলংকৃত করেন। উমাইয়া খলিফাগণ ছিলেন রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু ও অসামান্য শক্তির অধিকারী, কিন্তু আব্বাসীয় 'আমীরুল মুমেনীন'গণ সেই অপ্রতিহত শক্তির প্রতিভূ হতে পারেননি। আব্বাসীয় যুগে একটি ধর্মকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের উদ্ভব দেখা যায়—শিয়া, সুন্নী, দাইলামি, কারমাতি, মুতাজিলা, ঈসমাইলী, আসায়ারি, জিন্দিক, সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism), বাতেনি, ফাতেমি প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত চারটি মুজহারেরও (পথ) উদ্ভব হয়—হানাফী, শাফী, মালেফী, হাম্বলী। এই চারটি মুজহারের ঝগড়া সারা মুসলিম দুনিয়া জুড়ে আজও তুঙ্গে, আব্বাসীয়গণের অভ্যুত্থানের পর আর কোনদিনই ইরানি বংশ-সম্ভূত পারস্যবাসীগণ সেমেটিক বংশীয় আরবদের

প্রভুত্বকে মেনে নেয়নি। এমনকি পারস্যবাসীগণ ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের আপন অগ্নি-উপাসনাকে তারা কোনদিনই মন হতে একেবারেই মুছে ফেলতে পারেনি। আল-মনসুরের রাজত্বে মকুসনেতা সামবাদ ও রাওয়ান্দিয়া খলিফাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করেন। ৭৫৮ খ্রীঃ রাওয়ান্দিয়াগণ খলিফার রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে সমবেত হয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকে—"এটিই আমাদের প্রভুর ঘর—যিনি আমাদের উপজীবিকা প্রদান করে প্রতিপালন করেন।" এগুলি সবই ছিল ঘোর ইসলাম-বিরোধী কথা। হারুণের খেলাফতে সমস্ত রাজকার্য পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বার্মেকিগণ কুক্ষিগত করে। এখানেও শিয়া-সুন্নীর লড়াই চলেছে। আমিনের উজির ফজল-বিন-রাবির সঙ্গে মামুনের উজির ফজল-বিন-সহলের যে দ্বন্দ্ব তা মূলত শিয়া ও সুন্নী দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত।

ইসলাম জগতের বিভিন্ন যুগে বড় বড় পণ্ডিতদের আবির্ভাব ঘটে। বহু খলিফা এই জগদ্বরেণ্য মনীষীদের নির্মমভাবে ঘোড়ার মতো চাবুক সহকারে রাজপথে আনার চেষ্টা করলে জনসাধারণ খলিফাদের এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যবহারে রাগে ও ক্রোধে ফেটে পড়ে। ইমাম জাফর-আস-সাদিকের প্রতি নির্যাতন, ইমাম আবু হানিফা ও মালিকের কারাবাস, ইমাম আহম্মদ-ইবন-হাম্বলের প্রতি বেত্রাঘাত, ইমাম মুসা-ইবন-কাজিমের কারাবাস এইরূপ ছোট-বড় আরো বহু ঘটনা আব্বাসীয় খলিফাদের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করে। খলিফা হারুণ সুন্নী-মতবাদকে প্রাধান্য দেন। খলিফা মামুন মুতাজিলা মতবাদকে শুধু প্রাধান্যই দিলেন না, ৮৩৩ খ্রীঃ একে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করেন। ইমাম হাম্বল তাঁর মতের বিরোধিতা করায় তাঁকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে নির্যাতন করা হয়। আবার ৮৪৮ খ্রীঃ খলিফা মুতাওয়াক্কিল মুতাজিলাদের নির্মমভাবে নির্মূল করেন। এই ধর্মীয় চিন্তানায়কদের প্রতি খলিফাদের স্বৈরাচারী ব্যবহার জনগণকে মোটেই তুষ্ট করতে পারেনি। বরং সকলেই রুষ্ট হয়েছিলেন, যার ফলে রাজশক্তি তার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও শৃঙ্খলা হারিয়েছিল। ইমাম গাজ্জালি মুতাজিলা মতবাদের পরিবর্তে 'আসায়ারী' মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্ব্যতীত জিন্দিক, গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়, কারমাতি সম্প্রদায়ও রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে। কেননা তাদের ভ্রান্ত ও অনৈসলামিক প্রচার নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। দুর্বল আব্বাসীয় খলিফাদের অযোগ্যতার ও অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত দাইলামি বুয়াইয়াগণ সুন্নী খলিফাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সকল মর্যাদাকেই দারুণ ভাবে আঘাত করে। পরবর্তীকালে সুন্নী সেলজুকগণ শিয়াদের একেবারেই নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে।

তাই আব্বাসীয় খেলাফতে কৃষ্টি ও সভ্যতার যথেষ্ট উন্মেষ হলেও ধর্মীয় কলহ-ঝগড়া, বিবাদ-বিসম্বাদ, বিভেদ, বিরোধ, মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব, মতদ্বন্দ্ব সকল কিছু মিলে ধর্মীয়ক্ষেত্রে এক নৈরাশ্যজনক অরাজকতার সৃষ্টি করে খেলাফতকে শুধু দুর্বলই করেনি বরং পতনের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতেই সাহায্য করেছে

কোথাও গোচরে কোথাও অগোচরে। একদিন যে ধর্ম মুসলমানদেরকে শক্তি দিয়েছিল, সাহস দিয়েছিল নিষ্ঠাকে তাদের নীতি করে দিয়েছিল, সততাকে তাদের মূলধন করে দিয়েছিল, এই পথে সকল সফলতাকে তাদের পদতলে হাজির করে যাদেরকে করেছিল জগৎসভায় শীর্ষস্থানীয়, তারা সেই ধর্মকেই করল উপহাসের পাত্র, নিজের ছল-চাতুরির, হীন স্বার্থ-সিদ্ধির ও গোপন ষড়যন্ত্রের বাহানা মাত্র। তাই যে ধর্মকে তারা পেয়েছিল কৃতকার্যের ও উন্নতির চাবিকাঠি স্বরূপ, তার যথার্থ প্রয়োগে অক্ষম না হওয়ায় আব্বাসীয়গণ হারাল তাদের বিশাল সাম্রাজ্যকে, মুসলমানগণ হারাল তার সামাজিক মর্যাদাকে, ব্যক্তি হারাল তার ব্যক্তিত্বকে, মুসলিম সমাজ হারাল তার সামাজিক শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধিকে।

পারস্য বিজয়ঃ বিরাট পারস্য বিজয় মুসলমানদের অবিমিশ্র সুফল দিতে পারেনি। পারস্য বিজয়ের পর বিপুল ধনরত্ন মুসলমানদের হস্তগত হলে খলিফা প্রথম ওমর (রাঃ) অন্যান্য সকলের মতো আনন্দে বিভোর না হয়ে ক্রন্দনরতা নারীর মতো বলে উঠেছিলেন—"এই সমস্ত যুদ্ধলব্ধ ধনের মধ্যে তিনি তাঁর জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ধ্বংসের বীজ দেখতে পাচ্ছেন।" পরবর্তীকালে তাই-ই হল। সংগ্রামী ও সংযমী আরব, আত্মসচেতন ও আত্মনির্ভরশীল আরব, মিতব্যয়ী আরব, অনৈসলামিক উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসিতার জীবনে গা ভাসিয়ে দিল। আরবের সেই নিখুঁত ঈমান সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, কর্মের প্রতি অফুরন্ত উদ্যম, উৎসাহ ও আন্তরিকতা সবকিছুই যেন ধীরে ধীরে মরু সাহারায় বিলীন হল।

বিশেষ করে উমাইয়া যুগে আরব জাতীয় জীবনের অধঃপতন ও ধ্বংসের লক্ষণটা প্রকট ও প্রবলভাবে দেখা না দিলেও আব্বাসীয় যুগে সেটা তার অস্পষ্টতা কাটিয়ে দিবালোকে ভাস্বর হয়ে উঠল। উমাইয়া যুগে আরবগণ রাজ্য হারিয়েছিলেন। কিন্তু আপন আরবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে হারাননি, যেখানে আব্বাসীয়গণ রাজ্য হারানোর পূর্বেই তাঁদের আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে হারিয়েছিলেন। এই দুই বংশের অধঃপতনের যে চারিত্রিক পার্থক্যটা লক্ষ্য করা গেল, তারও মূলে যথাযথ কারণ আছে। উমাইয়া রাজত্ব ছিল আরব জাতীয়তাবাদী রাজ্য, এবং আব্বাসীয় রাজত্ব ছিল পারস্য-প্রভাবান্বিত সাম্রাজ্য। পারস্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত আব্বাসীয় খেলাফতে পারস্যের নানা রূপ আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়, যেগুলির প্রভাবে একদিন পারস্য তার প্রাণশক্তিকে হারিয়ে আরবদের পদানত হল। চরম দুর্ভাগ্যবশত বিজয়ী আব্বাসীগণ সেইগুলিকেই আহ্বান জানাতে আলিঙ্গন করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করলেন না। অধঃপতিত পারস্যের মদ্যপান, জুয়া খেলা, দাবা খেলা, নৃত্য, গান, বাজনা, হারেমের ভোগ-বিলাসিতা, প্রভূত পরিমাণে পরমাসুন্দরী ক্রীতদাসীদের আহ্বান ও আগমন, অনাচার, অবাধ মেলামেশা, নপুংসক রক্ষী-বাহিনী, অসংখ্য উপপত্নী, বিদেশিনীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি

উন্নতগামী আব্বাসীয় রাজবংশকে কলুষিত করল, কলঙ্কিত করল, দূষিত করল ও দুর্বল করল।

আরব অভিজাত্য একদিন এমনি সম্মানীয় বস্তু ছিল যে আরবগণ বিধর্মী বা বিজাতিকে বিবাহ করা দূরের কথা, কোন অন-আরব মুসলমান মহিলাকেও বিবাহ করতেন না বা বিবাহ দিতেন না। কিন্তু আব্বাসীয় যুগে খলিফাগণ অবাধে বিধর্মী, বিজাতি, সকল সুন্দরীদের পানি গ্রহণ করতে থাকায় খলিফাগণ তাঁদের রক্তের আভিজাত্য হারাতে থাকেন, এবং ক্রমশ তাঁরা দুর্বল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং মাত্রাধিক ভোগবিলাসী হয়ে পড়েন। এই পথেই খলিফা মনসুরের মাতা ছিলেন একজন পরমাসুন্দরী বার্বার ক্রীতদাসী। মামুনের মাতা একজন পারস্য ক্রীতদাসী মারাজিলা, আল-ওয়াসিক ও আল-মুহতাদির মাতা ছিলেন গ্রীক ক্রীতদাসী, আল-মুনতাসিরের মাতা আবিসিনিয়ান, আল-মুসতাইন ও আল-মুসতাদির মাতা আর্মেনিয়ান ক্রীতদাসী। সমগ্র আব্বাসীয় খেলাফতের মধ্যে একমাত্র আল-আমিন ছিলেন পিতা ও মাতা উভয়েরই দিক থেকে অকৃত্রিম আরবী রক্তের অধিকারী। অধিকাংশ আব্বাসীয় খলিফাগণের তিনটি প্রধান আকর্ষণ ছিল— নারীনৃত্য, সঙ্গীত ও মদ্যপান। আল-মুতাসিমের রাজত্বে উবাইদা আল-তুনবুরিয়া গায়িকা ও সুন্দরী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। একদিন যে আরব পারস্য-বিজয় দ্বারা গর্ববোধ করেছিল, সময়ের ব্যবধানে সেই পারস্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত গর্বিত আরব বা আব্বাসীয় রাজত্বকে প্রকারান্তে পারস্য-বিজয়ই গ্রাস করল। অতীতের আরব কর্তৃক পারস্য বিজয় ভবিষ্যতের আব্বাসীয়দের পতনের হেতু রূপে দেখা দিল। জাতীয় জীবনের যে চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য আরব পারস্যকে জয় করেছিল, এবং যে চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য আরব কর্তৃক পারস্য বিজিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে আব্বাসীয়গণ বিজিত পারস্যের ঐ দুর্বলতা হতে নিষ্কৃতি লাভ না করায় তাঁদেরও পতন অনিবার্য হল।

খলিফাদের নৈতিক অধঃপতন ঃ আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম দিকের কয়েকজন খলিফা আল-মনসুর, হারুণ ও মুহতাদি ব্যতীত প্রায় সকলেই মদ্যপান করতেন। মানব চরিত্রের অধঃপতন যখন খুবই নিম্নগামী হয় তখন লজ্জা-শরম বলে আর কিছুই থাকে না। আব্বাসীয় খলিফাদের অবস্থাও তাই হয়েছিল, তাঁরা দিবালোকে, প্রকাশ্য সমাজে এই অসামাজিক এবং ইসলামের ঘোর নিষিদ্ধ জিনিসটাকে গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতেন না। এমনকি তাঁদের পাপ যেন পাহাড় ছেড়ে পর্বতে আরোহণ করেছিল, তাই তাঁরা "মদ্য পানাসক্তি" উৎসবও প্রবর্তন করেছিলেন। ব্যভিচার ও উপপত্নী গ্রহণ ইসলামে একেবারেই ঘৃণ্য কাজ ও নিষিদ্ধ ; তবুও আব্বাসীয় খলিফাগণ অবাধে যত ইচ্ছে উপপত্নী গ্রহণ করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সেনাপতিগণ খলিফাদের মনোরঞ্জন হেতু তাঁদের সুন্দরী উপপত্নী উপহার দিতেন। এইভাবেই আব্বাসীয় খলিফাদের অনেকেই ক্রীতদাসী

বা উপপত্নীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। এমনকি খলিফা হারুণ-আর-রশিদ বাইজান্টাইন অভিযানকালে হেলেন নাম্নী একজন পরমাসুন্দরী খ্রীস্টান মহিলাকে বাগদাদে আনয়ন করে তাঁকে ভালবাসার স্মৃতি স্বরূপ তাঁর উদ্দেশে একটি কবিতাও রচনা করেন। এইভাবেই পারস্য-তনয়া ক্রীতদাসী মারাজিলার গর্ভে খলিফার জগদ্বিখ্যাত পুত্র (খলিফা) আব্দুল্লাহ আল-মামুন জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামি রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় সৎ-খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন—একটি মানুষকে, একটি পরিবারকে ও একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য দুটো জিনিসই যথেষ্ট—অবৈধ নারী-আসক্তি ও মদ্যপান। শেষের দিকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণ প্রায়ই ঐ দুটো বস্তুর নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন, ফলে অনাচার ও অশালীন কার্যকলাপে খলিফাদেব রাজোচিত ও মানবিক গুণাবলী-গুলি একের পর এক ধ্বংস হতে থাকে। এইভাবে অগোচরে অজ্ঞাতে খলিফাদের রাজবংশ ও রাজচরিত্র তাঁদের রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই ধ্বংস হয়। সুতরাং আব্বাসীয় খলিফাদের পতনের জন্য অহেতুক কাউকে দায়ী বা দোষী করা ঠিক নয়, বরং খলিফাদের চরিত্রের নৈতিক অধঃপতনই তাঁদের পতনের জন্য প্রধানত দায়ী। পারস্যের অমর কবি সেখ সাদি বলেন—"নিত্য বিরাজিত তুমি চিরবিদ্যমান—রাখিবে আপন হাতে মানীর সম্মান—রাখিলে আপন হাতে আপনার মান।"

অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ঃ অর্থনৈতিক অচলাবস্থা আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের প্রধান কারণও বলা যেতে পারে। ধন-ঐশ্বর্যে ভোরপুর আব্বাসীয় খেলাফতের এ দুরবস্থা হল কেন, কে বা কারা দায়ী সাম্রাজ্যের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য। খলিফাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনই দায়ী ছিল এর মূলে। তাঁদের অসামাজিক অনাড়ম্বরপূর্ণ ও অহেতুক কাজের জন্য অজস্র আর্থিক অপচয় একদিন রাজকোষকেও শূন্য করে ফেলে। খলিফাদের এই দুর্বল চরিত্রের সুযোগ নিয়ে আমীর-উমারা উজিরগণও আপন আপন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরিমিত অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। তাঁরা অনুসরণ করলেন তাঁদের প্রভু খলিফাদের। অমিতব্যয়ী সৌখিন খলিফা আল-আমীন আপন প্রমোদ ভ্রমণে নৌ-বিহারের জন্য পাঁচটি মূল্যবান বজরা নির্মাণ করেন—যেগুলি ছিল সিংহ, হস্তী, ঈগল, সর্প ও অশ্বাকৃতি। প্রতিটি বজরার নির্মাণ খরচ পড়ে তখন প্রায় ৩০ লক্ষ দিরহাম। এইভাবে খলিফা-আমীর-উমারা-উজির প্রভৃতি কর্তাব্যক্তিগণ আপন আপন খেয়াল-খুশির নগ্ন পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য জনসাধারণের ওপর মাত্রাতিরিক্ত করভার চাপিয়ে গরিব প্রজাবৃন্দকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করে তুললে, করভারে জর্জরিত কৃষকবৃন্দ কৃষিকার্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ঠিক অনুরূপ ভাব দেখা দিল ব্যবসা-বাণিজ্যেও। ফলে সকল ক্ষেত্রেই আর্থিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হল, রাজকোষে অর্থ সমাগম প্রায় বন্ধ হল।

সাম্রাজ্যের সকল দিকই যখন প্রায় বন্ধ হয়ে রাজ্য একটি বন্ধ্যানারীর রূপ ধারণ

করল, তখন আরম্ভ হল একটি জিনিস আল্লাহর মার—প্রকৃতির দুর্যোগ, কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও মহামারী, কোথাও দুর্ভিক্ষ। ফলে জনসাধারণের দুর্দশার কোন সীমা থাকল না। রাজকোষ শূন্য হলে খলিফাগণ সৈনিকদের নিয়মিত বেতন দিতে অসমর্থ হওয়ায় সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ল এবং স্থানে স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল, বিদ্রোহ দমনে খলিফা সেনাবাহিনীর আন্তরিকতা হারালেন। আরম্ভ হল ক্ষমতার লড়াই, গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব, তখন খলিফাগণ নির্বিকার অসহায় এবং প্রমাদ গুনলেন। সৈনিকগণ খলিফার গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করার পরিবর্তে রাজ্য পরিচালনায় অযোগ্য, অপদার্থ ও তাঁদের বেতন দিতে অক্ষম ও অসমর্থ খলিফাদেরকেই তাঁরা কখনও সিংহাচ্যুত করে, কখনও বা হত্যা করেই আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের পথকে প্রশস্থ করে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মুসলিম কর্তৃক স্পেন বিজয়ের মতো স্পেনের পতনের পূর্বে তাঁদের সামাজিক অবস্থা যেরূপ হয়েছিল এঁদেরও ঠিক তাই হল। তবে পার্থক্য শুধু সেখানে গিয়েছিলেন সুসভ্য সেনাপতি মুসা ও তারিক। কিন্তু এখানে এলেন বর্বর তাতার নেতা নির্মম পাষণ্ড দুর্ধর্ষ হালাকু খান। আব্বাসীয় খলিফাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতব্যয়িতা এবং বিলাসব্যসন যত ব্যাপক ও বিবেচনাহীন এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়েছিল তাঁদের পতনও ততই করুণ-শোচনীয়-মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক হল। একেই বলে—'Scourge of God'—'খোদার চাবুক', 'খোদায়ী মার'।

আশ্রয়দাতা আশ্রিত: ইতিহাস বিখ্যাত খলিফা হারুণ-আর-রশিদের পারস্য ক্রীতদাসী মারাজিলার গর্ভজাত সন্তান আব্দুল্লাহ আল-মামুন এবং তুর্কী ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তান আল-মুতাসিম। মামুন ছিলেন পারস্য মাতার সন্তান, তাই তিনি অনেকটা পারস্য নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মুতাসিম সেই একই নীতির অনুসরণ করে অনেকটা তুর্কী নির্ভরশীল হয়ে উঠলেন। তিনি আরব ও পারস্য বাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস করার নিমিত্ত বিশাল তুর্কী বাহিনী গঠন করেন। পরে কিন্তু এই তুর্কী বাহিনীই আব্বাসীয় খলিফাদের একেবারেই শক্তিহীন ও ক্রীড়নকে পরিণত করেন। ক্ষমতালোভী এই উচ্ছৃঙ্খল সেনাবাহিনী নিজেদের ইচ্ছামতো খলিফাদের সিংহাসনচ্যুত করে রাজ-পরিবারের যে কোন সদস্যকে খেলাফত প্রদান করত। শুধু তাই-ই নয়, সেনাবাহিনীর অত্যাচারে জনসাধারণ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠে শান্তি ও সৌন্দর্যের ধারক ও বাহক বাগদাদ নগরী অশান্তির আকর হয়ে উঠল। হিট্টি বলেন—"মামুনের শান্তির শহর অরাজকতা ও অশান্তির শহরে পরিণত হল।" খলিফা এই পরিস্থিতি ও পরিবেশ হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই ৮৩৬ খ্রীঃ রাজধানী বাগদাদ হতে সামাররাতে স্থানান্তরিত করেন। সামাররা ৮৩৬-৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৬ বছর আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী ছিল, এখানেও আটজন আব্বাসীয়

খলিফা তুর্কী সেনাবাহিনী ও উজিরদের ছায়াতলে ক্রীড়নকরূপে খেলাফত পরিচালনা করেন। দুর্ধর্ষ এবং বর্বর তুর্কী সেনাবাহিনীর দোর্দণ্ড প্রতাপে ও দৌরাত্ম্যে খলিফাগণ সর্বদাই ভীত ও শঙ্কিত থাকতেন। আব্বাসীয় খলিফাদের দুরবস্থা আর কতখানি শোচনীয় ও অবর্ণনীয় হতে পারে যখন আশ্রয়দাতা স্বয়ং খলিফা তুর্কী সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম্যে আশ্রিত হলেন। সুতরাং আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের আর কিছুই বাকি থাকল না। যেদিন পরিচালক হলেন পরিচালিত এবং আশ্রয়দাতা হলেন আশ্রিত। এটাও ছিল পতনের অন্যতম প্রধান কারণ।

আমীর-উল-উমারাদের ঔদ্ধত্য: আব্বাসীয় খলিফাগণ দুর্ধর্ষ তুর্কী সেনাদের দৌরাত্ম্য হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সৃষ্টি করলেন একের পর এক আমীর-উল-উমারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমীরদের ঔদ্ধত্য সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম্যকেও অতিক্রম করল। দুর্বল খলিফা আল-মুকতাদিরের সময় (৯০৮-৩২ খ্রীঃ) কমপক্ষে ১৫ জন উজিরের উত্থান-পতনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়। দুর্বল খলিফা মুকতাদির তাঁর নপুংসক দেহরক্ষী নেতা মুনীসকে রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করে তাঁকে আমীর-উল-উমারার পদে অভিষিক্ত করেন। পরে সামান্য ব্যাপারে খলিফা আমীর-মুনীসের বিরাগভাজন হলে মুনীসের সেনাবাহিনী কর্তৃক খলিফাকে বধ করা হয়। অতঃপর খলিফার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আল-কাহির সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি মাত্র এক বছর খেলাফত পরিচালনা করে আপন উজির কর্তৃক অন্ধ হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পরবর্তীকালে আমীর ও উজিরদের কৃপায় একজন প্রাক্তন খলিফা অন্ধ কাহিরকে বাগদাদের রাজপথে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। পরবর্তীকালে অপর দুজন খলিফা আল-মুত্তাকি (৯৪০-৪৪ খ্রীঃ) এবং আল-মুসতাকফিকেও (৯৪৪-৪৬ খ্রীঃ) নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। খলিফা আর-রাজির খেলাফতেও (৯৩৪-৪০ খ্রীঃ) এর কোনই ব্যতিক্রম ছিল না। সর্বাপেক্ষা করুণ দৃশ্য ভেসে ওঠে খলিফা আত-তাইয়ের খেলাফতে (৯৭৪-৯১ খ্রীঃ)। যখন আমীর অজদুদ-উদ-দৌলাহ গায়ের জোরেই সুলতান ও শাহান শাহ উপাধি গ্রহণ করে খলিফার ও খলিফা কন্যার অসম্মতিতেই তাঁর বিবাহযোগ্যা রাজকুমারীর পানি গ্রহণ করেন। আমীর ও উমারাদের এই অসামাজিক অমানবিক কার্যকলাপ ও ঔদ্ধত্যপনা বিশাল আব্বাসীয় রাজত্বের পতনের জন্য কম দায়ী নয়।

স্বাধীন খেলাফতের উৎপত্তি: উমাইয়া খেলাফতে সার্বভৌমত্বে কোনদিন আঘাত পড়েনি। কিন্তু বাগদাদ ব্যতীত কায়রো এবং মাহদিয়ায় দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীয় খেলাফতের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয়। ফাতেমি বংশের ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদি কর্তৃক উত্তর আফ্রিকায় (৯০৯ খ্রীঃ) এবং তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্তৃক কার্ডোভায় (৯২৯ খ্রীঃ) স্বাধীন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে

মুসলিম জাহানের নিকট আব্বাসীয় খলিফাদের মর্যাদা এবং প্রাধান্য হ্রাস পায়। খেলাফতের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করল অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীসমূহ এবং বহিঃশত্রুগণ। এইভাবে আব্বাসীয় খেলাফতের মধ্যেই স্বাধীন খেলাফতের উৎপত্তি তার মান-মর্যাদা ও শক্তিকে হ্রাস করে পতনের পথকে প্রশস্থ করে দিল।

বুয়াইয়াগণের প্রভুত্বঃ আব্বাসীয় খলিফাগণ তুর্কী সেনাদের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য খলিফা মুসতাকফি (৯৪৪-৪৬ খ্রীঃ) শিয়া বুয়াইয়া আমীর আহম্মদকে আমীর-উল-উমারা পদে অধিষ্ঠিত করে তাঁকে রাজ্য পরিচালনার যাবতীয় ভার অর্পণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বুয়াইয়া আমীরদের অত্যাচার সকল অত্যাচারকে অতিক্রম করে খলিফাদের জীবনকে কোন সময় লাঞ্ছনাময় করে, কোন সময় দুর্বিষহ করে, কখনও বা হত্যা করেই নিজেদেরকে অসহায় খলিফাদের দন্ডমুন্ডের একমাত্র কর্তারূপে পরিণত করেন। খলিফাগণ সদাই ভীত-সন্ত্রস্থ ও আতঙ্কিত থাকেন, না জানি কখন কি ফরমান তাঁদের প্রতি জারী হয়। আমীর মুইজ-উদ-দৌলাহ খলিফাদের ধর্মীয় মর্যাদা হরণ করে খোতবায় খলিফার নামের সঙ্গে নিজ নাম পাঠের নির্দেশ দিলেন। পরে রাজকীয় মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করে, আমীর নিজে সুলতান উপাধি ধারণ করে মুদ্রায় নিজ নাম অঙ্কিত করার ফরমান জারী করেন। আমীর অজদু-উদ-দৌলাহ প্রমুখ সকলকে ছাড়িয়ে নিজে শাহান শাহ উপাধি ধারণ করে খলিফার সমস্ত শক্তিকে হরণ করে তাঁকে নিছক বেতনভোগী আশ্রিত করুণার পাত্রে পরিণত করে প্রভুত্বের চরম নিদর্শন স্থাপন করেন। তিনি প্রকারান্তে জোরপূর্বক খলিফার বিবাহযোগ্যা কন্যার পানি গ্রহণ করে খলিফার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকেও কম অপমানিত করেননি। পরে কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজ বিবাহযোগ্যা কন্যাকেও খলিফাকে বিবাহ করতে বাধ্য করেন। আমীরের হুকুম অমান্য করার মতো দুঃসাহস খলিফার ছিল না, কেননা আমীর ছিলেন খলিফার দন্ডমুন্ডের কর্তা। একই ব্যক্তি হলেন শ্বশুর ও জামাই। বুয়াইয়া আমীরদের প্রভুত্ব, ক্ষমতালিপ্সা, আত্মম্ভরিতা, আত্মকলহ, নির্যাতন-মূলক পদ্ধতি, গোত্র ও ধর্মীয় ঈর্ষাপরায়ণতা প্রভৃতি একবাক্যে আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের পথকে ত্বরান্বিত করল।

সেলজুক বংশের পতনঃ ১০৫৫ খ্রীঃ আব্বাসীয় বংশের ২৬তম খলিফা কাইম বিল্লাহ বুয়াইয়া আমীরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হযে সেলজুক নেতা তুঘ্রিল বেগের সাহায্য প্রার্থনা করলে তুঘ্রিল বেগ খলিফার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাগদাদ গমন করে সর্বশেষ বুয়াইয়া আমীর মালিক আর-রহিমকে (১০৪৮-৫৫ খ্রীঃ) যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করে আব্বাসীয় খেলাফতের ওপর বুয়াইয়া প্রভুত্বকে চিরতরে ধূলিসাৎ করেন।

সেলজুক তুর্কীগণ বুয়াইয়া আমীরদের স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা হতে আব্বাসীয় খেলাফতকে মুক্তি দান করেন। এই যুগেই আব্বাসীয় খলিফাগণ

সন্ত্রাসমুক্ত হলেন। বুয়াইয়া আমীরগণ সকল দিক থেকেই আব্বাসীয় খেলাফতের ওপর যে অবমাননাকর ব্যবহার করে আব্বাসীয় খেলাফতের মান ও মর্যাদাকে একেবারেই ধূলিসাৎ করেছিলেন, সেলজুক তুর্কীগণ তাকে পুনরুদ্ধার করে আব্বাসীয় খলিফাদের যথার্থ সম্মান দিতে কোনদিন ভুল করেননি। সেলজুক নেতা তুঘ্রিল বেগ খলিফার অনুমতি ও অনুরোধ সত্ত্বেও কোনদিনই প্রকাশ্যে খলিফার সিংহাসনে উপবিষ্ট করা তো দূরের কথা, তাঁর পার্শ্বেও আসন গ্রহণ না করে আব্বাসীয় খেলাফতের মান ও স্থানকে চূড়ান্ত মর্যাদা দান করতে কোনদিনই দ্বিধাবোধ না করে নিজ আত্মসংযমের ও আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়ে যান। আব্বাসীয় খেলাফতের ওপর হতে যেন কোন অদৃশ্য অভিশাপ দূরীভূত হয়ে আশীর্বাদ ঝরে পড়ল। খলিফাগণ ফিরে পেলেন তাঁদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, মান ও মর্যাদা। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, রাজকীয় পরিবেশ ও রাজসম্মান, আর কেউ কোনদিন কোন দুরাচার আমীর পরমাসুন্দরী বিবাহযোগ্যা খলিফার রাজদুহিতাকে ক্ষমতার জেরে জীবনসঙ্গিনী করতেও সাহস পায়নি। খলিফাদের জীবনে পুনরায় এই পাওয়া ছিল একান্ত পরম পাওয়া, চাতকের জলদ দর্শন পাওয়া, চাকরের সুধাকর পাওয়া, বিধাতা পুরুষের পরম আশীর্বাদ পাওয়া। তাই সেলজুক বংশের উৎপত্তি আব্বাসীয় খেলাফতের জন্য আল্লাহর আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল।

সেলজুক বংশের আবির্ভাবে শুধু যে আব্বাসীয় খলিফাগণই তাঁদের হৃত গৌরব, মান ও মর্যাদাকে ফিরে পেয়েছিলেন তা নয়, সমগ্র আব্বাসীয় খেলাফতও ফিরে পেল তার পূর্ব রীতি-নীতি। আচার-ব্যবহার, শাসন সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার নানা প্রসারতা। কেবল মাত্র বাগদাদই যে তার সৌন্দর্য ফিরে পেল তা নয়, সৃষ্টি হল আরো বহু বাগদাদ —পারস্যের রায়, হামদান, ইস্পাহান প্রভৃতি। এই সমস্ত শহরগুলি সৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শতধা বিভক্ত, দলীয় কোন্দলে জর্জরিত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে চরমভাবে দ্বিধাবিভক্ত, অভ্যন্তরীণ ও আত্মঘাতী আঘাতে অবলুপ্তপ্রায় বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে আবার ফিরে এল—ঐক্য ও সংহতি। এই ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা, সুশাসন, জনহিতকর নানা পরিকল্পনা প্রযোজন, আব্বাসীয় বিশাল সাম্রাজ্যকে এনে দিল এক নব প্রাণ, নতুন প্রেরণা ও নব উদ্দীপনা। এই সমস্তের ফলে আব্বাসীয় খেলাফতে যে প্রাণসঞ্চার হয়েছিল তা সেলজুক বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তিরোহিত হল, পতনও ত্বরান্বিত হল। সুতরাং সেলজুক বংশের পতন ছিল আব্বাসীয় খেলাফতের প্রাণদণ্ড স্বরূপ।

জনগণের অসন্তোষঃ আব্বাসীয় খেলাফতে যখন মুসলমানদের মধ্যেই নানা দলাদলি, মতবিরোধ, ধর্মীয় ঝগড়া, সামাজিক কলহ খেলাফতের শান্তিকে

করেছে বিঘ্ন, সমৃদ্ধিকে করেছে বন্ধ, শ্রীবৃদ্ধিকে করেছে স্তব্ধ, তখন অমুসলমানগণও মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে খেলাফতের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। যদিও নবম শতাব্দীর শেষার্ধে খ্রীস্টানগণ উজিরের পদমর্যাদাও লাভ করেন। আল-মুতাদিরের উজির ছিলেন খ্রীস্টান। খ্রীস্টানগণ চিকিৎসাশাস্ত্রেও বুৎপত্তি লাভ করে রাজদরবারে বহু খ্যাতনামা পদ অলংকৃত করেন। বহু ইহুদি টাকশালের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিছু অমুসলমান খলিফাদের বিরোধিতাও করেছিলেন, যেমন মনির সম্প্রদায় অন্যান্য মুসলমানদের সাথে খলিফার বিরোধিতা করার জন্য খলিফা তাদের শূলবিদ্ধ করেন। এই ঘটনার বিশেষ কোন তাৎপর্যও ছিল না। খলিফা হারুণের সময় সীমান্ত অঞ্চলের খ্রীস্টানগণ গুপ্ত ষড়যন্ত্রে মিলিত হয়ে খলিফার বিরোধিতা করলে খলিফা তাঁদের ষড়যন্ত্রের দুর্গ বলে পরিচিত গির্জাগুলিকে ধ্বংসের আদেশ দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আব্বাসীয় খলিফাগণ বিলাসব্যসনে গা ভাসিয়ে দিলে নানা কারণে জনসাধারণের কষ্টের সীমা থাকে না। তখন আপামর জনসাধারণ কি মুসলমান, কি অমুসলমান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রজাবৃন্দই খলিফাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। প্রজাবৃন্দের এই অসন্তোষ খলিফাদের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপই হয়েছিল। পৃথিবীর যে কোন শক্তিধর রাজা-বাদশাহ আপামর জনগণের বিরাগ-ভাজন হয়ে তাদের অসন্তোষ ও আহাজারি মাথায় নিয়ে গৌরবের রাজমুকুট বেশি-দিন মাথায় রাখতে পারেননি। বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শক্তিধর খলিফাগণও গরিব জনগণের রোষদৃষ্টির সম্মুখে বেশিদিন টিকে থাকতে সক্ষম না হওয়ায় সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে এল।

বহিঃশত্রুর আক্রমণঃ বিশ্ব-ইতিহাসের এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায় মুসলিম অধ্যায়—মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। উমাইয়া খেলাফতে এই মুসলিম সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। এইজন্য উমাইয়া খেলাফতের প্রথম আল-ওয়ালিদের রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে আব্বাসীয় খেলাফতে খলিফা হারুণ ও তাঁর পুত্র খলিফা মামুনের সময় কৃষ্টি ও সভ্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। খলিফা হারুণের অদূরদর্শিতা ও মহানুভবতার জন্য বাইজান্টাইগণ বহুবার আব্বাসীয় রাজ্যকে আক্রমণ করেও ক্ষমা পান। সময়ের দূর ব্যবধানে আব্বাসীয় শক্তি হীন ও ক্ষীণ হতে থাকলে শত্রুপক্ষ প্রবল হতে থাকেন। একদিন এমন অবস্থা দেখা গেল যখন আব্বাসীয় খেলাফত শত্রুর মোকাবিলা করার মতো শক্তি ও সাহস দুই-ই হারাল। এইভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইসলামের ইতিহাসের এমন একটি স্মরণীয় ও শোচনীয় দিন এল, যেদিন (১০-২-১২৫৮) বহিঃশত্রুর আক্রমণে হালাকু খান কর্তৃক বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা রবি চির অস্তমিত হল।

হালাকু খানের আমন্ত্রণ ও আক্রমণঃ বিশাল আব্বাসীয় খেলাফতের

পতনের সর্বশেষ কারণ ছিল—বহিঃশত্রুর আক্রমণ। ১২৫৮ খ্রীঃ চেঙ্গিস খানের পৌত্র তাতারের মঙ্গল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণ আব্বাসীয় খেলাফতের স্বাধীনতার শেষ রশ্মিটুকু নির্বাপিত করে। দুটি কারণে হালাকু খান এই আক্রমণ করেছিলেন। প্রথমটি ১২৫৩ খ্রীঃ হালাকু খান একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে পারস্যে গুপ্তঘাতকদের সুরক্ষিত আলামত দুর্গ আক্রমণ করলে তৎকালীন শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতাসিমের (১২৪২-৫৮ খ্রীঃ) নিকট সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে একটি পত্র লিখলে উদ্ধত্য প্রকৃতির খলিফা হালাকুর দূতগণের অপমান করে তাঁর আমন্ত্রণ ও অনুরোধ প্রত্যাখান করায় হালাকু নিজেকে অপমানিত বোধ করে খলিফার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হালাকু একাকীই এই গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তাঁর আক্রোশ, ক্রোধ, ঘৃণা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, রোষ সবকিছুই পড়ল খলিফা আল-মুসতাসিমের ওপর। সুযোগের সন্ধানে ছিলেন হালাকু। আক্রমণের দ্বিতীয় কারণটি সুযোগ রূপে দেখা দিল। অনেকের মতে, খলিফার শিয়া মন্ত্রী মহম্মদ-বিন-কামি এবং শিয়া উপদেষ্টা নাসির-উদ-দীন-তুসি শিয়াদের প্রতি সুন্নী-খলিফার ব্যবহারকে পক্ষপাত-মূলক মনে করে তা বরদাস্ত করতে না পারায় গোপনে ও গভীর ষড়যন্ত্রে তাতারের মঙ্গল নেতা হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে আব্বাসীয় খেলাফতের পতনের শেষ কাজটুকুও অতি জঘন্যভাবে কৃতঘ্নতার সাথে পরিসমাপ্ত করলেন। হালাকু খান এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এতটুকুও দেরি না করে ১২৫৮ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে বাগদাদের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে এই দুই বিশ্বাস-ঘাতকের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে খলিফা আল-মুসতাসিমকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন। ৪০ দিন অবরোধ ও শক্তি পরীক্ষার পর ১২৫৮ খ্রীঃ ১০ ফেব্রুয়ারি হালাকু খানের সেনাবাহিনী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড (Catapult) এবং জ্বলন্ত অগ্নির (Nhaptha) সাহায্যে সমগ্র প্রাচ্যের সুরম্য নগরী বাগদাদের প্রাচীর বিধ্বস্ত করলে ভীত ও সন্ত্রস্ত খলিফা মুসতাসিম তখন নিষ্ঠুর হালাকু খানের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চান।

বর্বর হালাকু খানের নির্মম হৃদয়ও একবার খলিফাকে হত্যা করতে প্রকম্পিত হয়। আরনল্ড বলেন—"নিষ্ঠুর ও রক্তলোলুপ বর্বর হালাকু রসুলের উত্তর-অধিকারীকে হত্যা করতে ইতঃস্তত করেন। কারণ তাঁর সেনাবাহিনীর যে সমস্ত মুসলমান সৈন্যরা বাগদাদ অভিযানে যোগদান করেন তাঁরা তাঁকে সাবধান করে দেন যে যদি খলিফাকে হত্যা করা হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরে উঠবে, সূর্য তার মুখ লুকাবে, বৃষ্টিপাত বন্ধ হবে, গাছপালা আর জন্মাবে না এবং মঙ্গল বাহিনী ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" কিন্তু ধ্বংসযজ্ঞের নায়ক হালাকু খান এতে ভীত হওয়ার পাত্র ছিলেন না। নিরুপায় অসহায় খলিফার প্রাণভিক্ষা ব্যর্থ হল। তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য প্রাণভিক্ষা ব্যর্থ হল, তাঁর রাজপরিবারের শিশু

ও নারীদের জন্য প্রাণভিক্ষা, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদেরও প্রাণভিক্ষা ব্যর্থ হল। খলিফার চোখের সম্মুখেই আরম্ভ হল সারা পৃথিবীর এক তুলনাহীন মর্মান্তিক, করুণ, শোচনীয়, হৃদয়বিদারক ও মর্মভেদী বধ-যজ্ঞ। পরিবারের পরিবার-পরিজন-সহ তিনশ' রাজকর্মচারীকে বলিদান দেওয়া হল। পরিশেষে খলিফার রক্ত যাতে মাটিতে না পড়ে তার জন্য খলিফাকে একটি কার্পেট জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় হত্যা করে আব্বাসীয় খেলাফতের সর্বশেষ দীপটিকে নিভিয়ে দেওয়া হয়। অনেকে বলেন, হালাকুর খ্রীস্টান পত্নী ডকুজ এবং শিয়া বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী মহম্মদ-বিন-কামি এবং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত উপদেষ্টা নাসির-উদ-দীন-তুসির পরামর্শানুযায়ী খ্রীস্টান এবং শিয়া সম্প্রদায়ের লোককে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষকে মাত্র ৬ সপ্তাহে হত্যা করে বর্বর হালাকু মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতার ও বর্বরতার অধ্যায়ে চির কুখ্যাতি অর্জন করে অমর ও অভিশপ্ত হয়েছেন। অবোধ শিশু, অসহায় বৃদ্ধ ও নারী-সহ লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্বর হালাকুর রক্তলোলুপতার শিকার হলে তিনদিন অবধি নগরীর রাজপথগুলিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় এবং ইউফ্রেটিসের স্রোত রক্তমাখা রূপ ধারণ করলে নদীটি রক্তনদীতে পরিণত হয়। এই ধ্বংসলীলার হাত হতে মনুষ্যজগৎ, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, স্থাপত্যজগৎ কেউই নিষ্কৃতি পায়নি। বর্বর হালাকুর আক্রমণে আব্বাসীয় খেলাফত ধূলিসাৎ হল এবং পৃথিবীর সুরম্য নগরী ও শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র স্বপ্নপুরী বাগদাদ শ্মশান পুরীতে পরিণত হল। বহু ঐতিহাসিকের মতে, দুই বিশ্বাস-ঘাতকের হীনতম ষড়যন্ত্রের শিকার হল ১৬ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী, যাদের মধ্যে ছিল—কত শিশু, কত মহিলা, কত মা, কত বৃদ্ধ, কত বৃদ্ধা, কত জ্ঞানতাপস, কত জ্ঞানী ও গুণী; কত পশু, কত প্রাণী, কত প্রাণ; যুগ যুগান্তের সাধনা-লব্ধ কত শিল্প, কত সৌধ, কত শিল্পায়তন, কত শিক্ষায়তন, কত শিক্ষাগার; যেন এক নিমেষে নিভিয়ে গেল বহু শতাব্দীর জ্ঞান-সঞ্চিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐ দীপালোকটি। সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুরম্য নগরী, জ্ঞানসাধনার স্বপ্নপুরী, বর্বর হালাকু খানের শ্মশানপুরী বাগদাদে আর কোনদিনই ঐ দীপটি ঐভাবে জ্বলে উঠল না। দীপাধার বাগদাদ আজও সেদিনের ধ্বংসলীলার সকরুণ সাক্ষী।

ফলাফল: আব্বাসীয় খেলাফতের পতনে সুন্নী-ইসলামের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তা পুনরুদ্ধার করা আর কোনদিনই সম্ভব হয়নি। সুন্নী ধর্মীয় আধিপত্য ব্যতীতও যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুসলমানদের হস্তচ্যুত হল, তাও আর কোনদিনই হস্তগত হয়নি। এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা এই বিরাট তিনটি মহাদেশ জুড়ে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকটা ব্যেপে ইসলামধর্মকে কেন্দ্র করে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন ধর্মকেই কেন্দ্র করে এরূপটি হয়নি, সেই অতুলনীয়, অভাবনীয় ও আজও যা অচিন্ত্যনীয় সেই সুবিশাল সাম্রাজ্য চিরতরে বিলুপ্ত হল।

গিলমান বলেন—"এইরূপে শত সহস্র নিহতদের করুণ গগনভেদী আর্তনাদে এবং বর্বর বিজয়োন্মত্তা মঙ্গলের প্রকট উম্মাদনায় যে বাগদাদ পাঁচশ' বছর ধরে শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল তা চিরতরে বিলুপ্ত হল।" ঐতিহাসিক আব্দুল লতিফ বলেন—"মঙ্গলদের প্রলয়ংকরী ও রক্তপিপাসু অভিযান এরূপ দুর্যোগ যা সারা পৃথিবীর অপরাপর দুর্যোগকে ম্লান করে দিয়েছে।" ইবনে আসীর বলেন—"তাতারদের আক্রমণ সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের ওপর, এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের ওপর অপতিত ভয়াবহ দৈব দুর্বিপাকগুলির অন্যতম।" বার্নার্ড লুইস বলেন—"কয়েকটি দিক হতে এটিকে যতটুকু আঘাত বলে মনে করা হয় ঠিক ততটা ছিল না। খলিফাগণ বহুদিন পূর্বেই প্রকৃত ক্ষমতা হারান। সুলতানগণ রাজধানীতে ও প্রদেশসমূহে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সুলতানগণ খলিফাদের রাজকীয় ও সুযোগ-সুবিধাগুলিও অন্যায় ভাবে ভোগ করতে থাকেন—মুদ্রায় নামাংকন, খোতবায় নাম পাঠ প্রভৃতি। মঙ্গলগণ এইরূপ একটি মৃত প্রতিষ্ঠানের (খেলাফতের) ভূতকে (প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে) ধ্বংস করে।" যাই হোক প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ আর যাই করুন, কোন ধ্বংসলীলার বধযজ্ঞের সূচনাও করেননি। ক্ষমতার লড়াই এবং কোন জিনিসের সামগ্রিক ধ্বংস মোটেই এক কথা নয়। তাই বার্নার্ড লুইসের কথা আংশিক সত্য মাত্র। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আমীর আলি বলেন—"জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ, শিক্ষার আসর, সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, সভ্যতার ক্ষেত্র এবং স্যারাসিন জগতের চক্ষু ও কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরী চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।"

কেউ কেউ বলেন, শিয়া সম্প্রদায়ের অনুরোধে এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ হতে দুটি জিনিস রক্ষা পায়—নিজামিয়া ও মুসতানসারিয়া মাদ্রাসা। ১৩৪৩ খ্রীস্টাব্দে তৈমুর লঙের বাগদাদ আক্রমণের দু'বছর পর এই দুটো মাদ্রাসা একত্রিত হয়ে যায়। বাগদাদ আক্রমণের শেষ ফলস্বরূপ মুসলিম জগতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, জুম্মার খোতবায় নাম উচ্চারণের নিমিত্ত কোন খলিফাই আর রইল না। সেখানে এবার শিয়া ও সুন্নী মুসলমানের পরিবর্তে তাতারের ইলখানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। বহুদিনের রাজশক্তির অধিকারী মুসলমানগণ, সভ্য সুশিক্ষিত মুসলমানগণ নিশ্চয়ই নিজেদের চারিত্রিক অধঃপতনের জন্য বর্বর তাতারদের পদানত হল। কোরআন বলে—"আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা চরিত্র নিজ পরিবর্তন করে।"

চতুর্থ পর্ব

আব্বাসীয়া খেলাফতের শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থা

প্রথম অধ্যায়

শাসনব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্যঃ আব্বাসীয় খলিফাগণ যে শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তা পরবর্তীকালের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে আদর্শ হিসাবে গৃহিত হয়। এই ঐতিহাসিক শাসনব্যবস্থার বিবর্তনে যে কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল তা ইসলামের অনুশাসনর্জনিত কোথাও পবিত্র কোরআন, কোথাও পবিত্র হাদিস, বিভিন্ন খলিফার ব্যক্তিগত চরিত্র, বুৎপত্তি ও মেধা ; শাসনকার্যে নিযুক্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের পরামর্শ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত আব্বাসীয় যুগে অন-আরব মুসলমানদের মধ্য হতে বহু রাজনৈতিক প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে, যাদের রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্তির ফলে বহু অন-আরব প্রথাও আব্বাসীয় শাসন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়। এক কথায় সবকিছুর সুসমন্বয়ে একদিন যে শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা আব্বাসীয় খেলাফতের পতন হলেও বহুকালব্যাপী বিভিন্ন দেশে মুসলিম এমনকি অমুসলিম শাসনকেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে।

এক কথায়, উমাইয়া খেলাফতকে ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত আরব অধ্যায় বলে অভিহিত করা হয়, যেখানে আব্বাসীয়কে অন-আরব যুগ বলা হয়। হিট্টি বলেন—"উমাইয়া আমলে ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত আরব অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। আব্বাসীয় সরকার দোউলা নামে একটি নতুন যুগের সূচনা করে।" উমাইয়া খেলাফতের পতনে যেমন আরবীবাদের পতন ঘটে, আব্বাসীয় খেলাফতের উত্থানে তেমনি ইসলাম সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করে। উমাইয়া যুগে যেমন আরবদের রাজ্য সম্প্রসারণ আশ্চর্যজনকভাবে অতি দ্রুততার সহিত অগ্রসর হয়েছিল, আব্বাসীয় যুগে তেমনি ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশও আশ্চর্যজনকভাবেই অতি দ্রুততার সহিত অগ্রসর হয়েছিল। আমীর আলি বলেন—"আব্বাসীয় আমলে আরবদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অতি আশ্চর্যজনকভাবেই দ্রুততার সহিত ধাবমান হয়েছিল।"

উমাইয়াদের পতনে আরব প্রশাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আব্বাসীয় উত্থানে নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। উমাইয়া খেলাফতে সকল খলিফাই যে সাধু ব্যক্তি বা সাধু চরিত্রের ছিলেন এমন নয়, তবে দরবারে কোন অনৈসলামিক বাজে কারবার চলত না। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় আব্বাসীয় খেলাফতে দরবারেই আরম্ভ হল ইরানী মদ্য, পত্নী, উপপত্নী, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি। এমনকি রাজধানীও স্থানান্তরিত হল সিরিয়া ভূখণ্ড হতে মেসোপটেমিয়া-পারস্য অঞ্চলে।

ফলে রাজকীয় প্রভাবের ধারা পশ্চিমের স্থলে পূর্বদিক হতে প্রবাহিত হতে থাকে। যাই হোক উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের সর্বময় প্রধান বৈশিষ্ট্য বলতে—উমাইয়া খেলাফত বা যুগ ইসলামের রাজ্য-সম্প্রসারণের যুগ, এবং আব্বাসীয় খেলাফত ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের যুগ বা সভ্যতা ও সংস্কৃতির যুগ।

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ঃ

খলিফার কর্তৃত্ব ঃ আব্বাসীয় খেলাফতে সর্বময় কর্তাব্যক্তি ছিলেন খলিফা স্বয়ং নিজে। তাঁরা শুধু সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তাব্যক্তি ছিলেন না, মুসলমান সমাজের ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। যদিও অধিকাংশ খলিফাই ধর্মের আচার-আচরণ বিধিনিষেধ ঠিকমতো মেনে চলতেন না। তবুও সৎ-খলিফা যুগের (৬৩২-৬৬১ খ্রীঃ) ধারাকে গতানুগতিক ধারাতে পরিণত করেছিলেন মাত্র। এতদ্ব্যতীত খলিফা রাষ্ট্রের তিনজন প্রধান ব্যক্তিকে নিয়োগ করে তাঁদের নিজ প্রতিনিধিত্ব দান করতেন, যেমন বে-সমারিক, সামরিক ও বিচার বিভাগ। বে-সমারিক বিভাগের প্রধান ছিলেন উজির, সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন সেনাধ্যক্ষ এবং বিচার বিভাগের ছিলেন কাজী-উল-কুজ্জাত প্রধান বিচারপতি। এছাড়াও খলিফার দুজন ব্যক্তিগত প্রধান কর্মচারী ছিলেন, একজনের নাম 'হাজিব' ও অপরজনের নাম জল্লাদ।

আব্বাসীয় খেলাফতের শাসনব্যবস্থার মূল নীতি ছিল—সাম্য ও যোগ্যতা। খলিফা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। যদিও অতীতের সৎ-খলিফাগণের ন্যায় তাঁদের কোন 'শূরা' বা পরামর্শ পরিষদ ছিল না, যদিও তাঁরা হজরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় ঘোষণা করতে পারেননি—"পরামর্শ ব্যতীত কোন খেলাফত গঠন হতে পারে না।" যদিও তাঁরা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার মনোনয়ন করে গেছেন। তবুও একথা বলা যেতে পারে তাঁরা রাজ্য পরিচালনায় স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। পরামর্শ করতেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে, সেনাধ্যক্ষের সাথে, কিন্তু কোনদিনই প্রধান বিচারপতিকে প্রভাবান্বিত করতেন না। কোন অযোগ্যকেও অন্যায় করাবার অভিপ্রায়ে পদোন্নতি ঘটিয়ে প্রধান বিচারপতির আসনও অলংকৃত করতেন না। এমনকি অনেক খলিফা ধর্মীয় প্রভাবকে প্রাধান্য দেওয়া ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজ নামের শেষে আল্লাহ্ পদবী ব্যবহার করতে ও দ্বিধা করতেন না। এই সমস্ত নানা কারণে আব্বাসীয় খেলাফত স্বেচ্ছাচার বা স্বৈরতন্ত্রের ঊর্ধ্বে ছিল। যার ফলে আব্বাসীয়গণ অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে পাঁচ শ' বছর বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে সক্ষম হন, যার বিস্তৃত সীমানা এশিয়া হতে আফ্রিকা এবং আফ্রিকা হতে ইউরোপ পর্যন্ত ছিল।

মন্ত্রণা পরিষদ ঃ হজরত ওমরের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলে বস্তু ছিল 'মজলিস-উস-শূরা'—উপদেষ্টা পরিষদ। এর দুটো ভাগ ছিল—একটি খাস ও অপরটি আম। খাসটি মন্ত্রী-পরিষদ গোছের মতো ছিল, আমটি সংসদ বা বিধান

সভা গোছের ছিল। উমাইয়া খলিফাগণের মধ্যে একমাত্র দ্বিতীয় ওমর এই প্রথার অনুসারী হতে চেষ্টা করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন খলিফাই গণতন্ত্রের ধারে-কাছে যাননি। আব্বাসীয় খলিফাগণ পুরোপুরি হজরত ওমর (রাঃ)-এর অনুসারী হতে না পারলেও একটা মন্ত্রণা-পরিষদ গঠন করেন। এই প্রথা আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম পাঁচজন খলিফা অর্থাৎ আবুল আব্বাস সাফফাহ (৭৫০-৭৫৪ খ্রীঃ) হতে খলিফা হারুণ-আর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এই মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হত বিভাগীয় মন্ত্রী, রাজ-পরিবারের বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি ও বাগদাদের অভিজাত শ্রেণীর মানুষ দ্বারা। যে কোন বড় ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে খলিফা এই মন্ত্রণা পরিষদের পরামর্শ ব্যতীত কোন মতামত পাস করতেন না। খলিফা মামুনের সময় এই মন্ত্রণা পরিষদ আরো ব্যাপক আকাব লাভ কবে আপামর জনসাধারণেব প্রশংসাভাজন হয়। খলিফা জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিকে এই মন্ত্রণা-পরিষদের সদস্য করায পরিষদের গুরুত্ব আরো অনেক গুণে বেড়ে যায এবং জনগণও বহুলাংশে উপকৃত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা পরবর্তীকালেব খলিফাগণ সকলের মধ্যে ভারসাম্য বক্ষা করতে না পারায় কেউ বা পারস্যের প্রতি, কেউ বা তুর্কীদের প্রতি ঢলে পড়েন, এতে সাম্রাজ্যের অসাধারণ ক্ষতিসাধন হয়, এমনকি পতনেরও বীজ অজ্ঞাতে রোপিত হয়। ধর্মীয় জগতেও তাঁরা একই দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে কেউ হলেন অতিবিক্ত শিয়াপন্থী, কেউ বা হলেন মাত্রাতিরিক্ত সুন্নীপন্থী, ফলে শেষের দিকে আব্বাসীয় খেলাফতে মন্ত্রণা-পরিষদ বলে আর কিছুই থাকল না।

হাজিব, জল্লাদ ও জ্যোতিষী ঃ খলিফার দেহরক্ষীদের প্রধানকে 'হাজিব' বলা হত। তিনি খলিফার নিত্য সহচর ছিলেন এবং এক সাথে রাজপরিবার গৃহাধ্যক্ষও ছিলেন। হাজিবের প্রধান কর্তব্য ছিল বিদেশী দূতগণকে খলিফার দরবারে আনা ও পরিচয় করিয়ে দেওয়া। হাজিব ব্যতীত অপর দুই ব্যক্তিকেও দরবারে বিশেষ ভূমিকায় দেখা যায়—একজন জল্লাদ, অন্যজন রাজ-জ্যোতিষী। জল্লাদের কাজ ছিল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজপ্রাসাদের গুপ্তকক্ষে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। জ্যোতিষী সৌরজগৎ ও নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে খলিফাকে পরামর্শ দিতেন। উমাইযা খেলাফতে আমরা রাজদরবারে কোন জল্লাদ ও জ্যোতিষীর স্থান দেখতে পাইনি। আব্বাসীয় খেলাফতে পারস্যনীতির অনুকরণে প্রথম জল্লাদ ও জ্যোতিষী নিযুক্ত হন রাজ-দরবারের বিশেষ ভূমিকায়। এইভাবে একের পর এক আব্বাসীয় খেলাফতে নানা সংস্কৃতির সমন্বয় হতে থাকে।

উজির ঃ আব্বাসীয় খেলাফতে খলিফার পরই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন উজির বা প্রধানমন্ত্রী। উমাইয়া রাজত্বে উজিরেব কোন পদ ছিল না। আব্বাসীয় খেলাফতে পারস্যনীতির অনুকরণে সর্বপ্রথম খলিফা হারুণ-আর-রশিদের সময় পারস্যের বার্মেকি বংশের ইয়াহিয়াকে সর্বপ্রথম

উজির বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ব্যাপারে খলিফাকে সাহায্য করতেন। আল-মাওয়ারদির মতে, দরবারে দু' শ্রেণীর উজির ছিলেন—যাঁরা অসীম বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাঁদের 'উজির-তাফবীজ' এবং যাঁরা সসীম বা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাঁদের 'উজির-তানফিদ' বলা হত।

অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজির খলিফার পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকেই কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারতেন। তবে খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের তিনি বরখাস্ত করতে পারতেন না। এই প্রথানুযায়ী আব্বাসীয় খেলাফতের শেষের দিকে খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজিরদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়, যেমন পারস্যের বার্মেকি উজির পরিবার। কিন্তু উজিরদের এই দুই শ্রেণীবিভাগ বাস্তবধর্মী ছিল না। কেননা খলিফা এবং উজিরের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকবে, শক্তির প্রয়োগ উজির কতখানি করবেন, তা কোন নিযুক্ত পত্রে নির্ধারিত করে বলে দেওয়া সম্ভবও ছিল না। সেক্ষেত্রে খলিফা শক্তিধর হলে উজিরের শক্তি বা ক্ষমতা সীমিত থাকতে বাধ্য ছিল। আবাব খলিফা দুর্বল বা অমনোযোগী হলে উজিরগণ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হতেন। এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত খলিফা এবং উজিরের আপন আপন ব্যক্তিত্বের ওপর। সসীম ক্ষমতাসম্পন্ন উজির কেবলমাত্র খলিফার নির্দেশগুলি জারি করতেন, তাঁর নিজস্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। উজিরের প্রধান কাজ ছিল বিভাগীয় প্রধানদের কাজের ওপর নজর রাখা, কোথাও উপদেশ দেওয়া, কখনও নির্দেশ দেওয়া, কখনও মঞ্জুর করা বা বাতিল করা। খলিফার সাথে পরামর্শ করে প্রধান-মন্ত্রী বিভাগীয় প্রধানদেরও নিযুক্ত করতেন, অনেক সময় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিভাগীয় প্রধানকেও উজির বলা হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা উজির ছিলেন না। এই বিভ্রান্তি ঘটনার মূলে ছিল সীমিত শক্তির উজিরগণ। সীমিত ক্ষমতার উজির ও বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে মূলত খুব একটা পার্থক্য ছিল না। কেননা সীমিত উজিরগণ স্বয়ং খলিফার নির্দেশে এবং বিভাগীয় প্রধানগণ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কার্য পরিচালনা করতেন। ষষ্ঠদশ খলিফা মুতাজিদের (৮৯২-৯০২ খ্রীঃ) সময় প্রধানমন্ত্রীর বেতন ছিল ১০০০ দিনার।

আব্বাসীয় অষ্টাদশ খলিফা আল-মুকতাদির (৯০৮-৯৩২ খ্রীঃ) খেলাফতে উজিরের পদ লোপ পেয়ে 'আমীর-উল-উমারা' উজিরের স্থলাভিষিক্ত হন। আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশের অভ্যুদয় হওয়ার ফলে রাজদরবারে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়। বুয়াইহিদের আবির্ভাবের পর 'আমীর-উল-উমারা' নিযুক্ত হতে থাকেন। বুয়াইহিদ ও সেলজুক প্রভৃতি আমলে দুর্বল খলিফা আমীর-উল-উমারাগণের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে কখনও ইচ্ছায়,

কখনও অনিচ্ছায় আমীরগণকে, কখনও 'সুলতান', কখনও 'শাহানশাহ', কখনও বা 'মালিক' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করতে বাধ্য হন।

প্রশাসনে সরকারী বিভাগঃ আব্বাসীয় শাসন বিভাগকে দেওয়ান বলা হত। এবং শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য বিভিন্ন দেওয়ান বা দফতর বা বিভাগের সৃষ্টি করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দেওয়ান আল-আজিজ বা মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রীবর্গের অধীনে এক একটি দেওয়ান থাকত, যেমন—(১) দিওযান-আল-খারাজ—রাজস্ব বিভাগ, (২) দিওয়ান-আল-জুনদ—সৈন্য বিভাগ, (৩) দিওয়ান-আল-রাসায়েল, (৪) দিওয়ান-আল-বারিদ—ডাক বিভাগ, (৫) দিওয়ান-আল-খাতাম—সিলমোহর বিভাগ, (৬) দিওয়ান-আল-শুরতা—পুলিশ বিভাগ, (৭) দিওযান-আল-নজর-ফিল মাজালেম—নালিশ বিভাগ, (৮) দিওয়ান-আল-আজিমাহ—হিসাব পরীক্ষা বিভাগ, (৯) দিওয়ান-আল-কাজি—বিচার বিভাগ, (১০) দিওয়ান আল-সাওয়াফি, (১২) দিওয়ান আল-নাফাফাত, (১৩) দিওয়ান আল-আতা, (১৪) দিওয়ান-আল-সির, (১৫) দিওয়ান আল-আকরিহা।

দিওয়ান আল-খারাজঃ

রাজস্ব বিভাগঃ উমাইয়া যুগের মতো আব্বাসীয় যুগেও রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগের প্রধানকে দিওয়ানুল খারাজ বা সাহিবুল খারাজ বলা হত। উজিরের পরই তিনি রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এই বিভাগকে অর্থ বিভাগের সঙ্গে একত্রিত করা হয়। এই বিভাগের প্রধান কর্তব্য ছিল—রাজস্ব আদায় ও হিসাবরক্ষা করা। রাজস্ব আদায়ের প্রধান উৎস ছিল—জাকাত, জিজিয়া, খারাজ, উফাজ, আলফে, আমদানী কর, বিজিত অঞ্চলের প্রদত্ত অর্থ, গোচারণ কর ইত্যাদি। জাকাত মুসলমানদের জন্য অবশ্যই দেয়—(যাঁরা ধনী ব্যক্তি)। এই কর আবাদ জমি, গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পণ্য দ্রব্যের ওপর ধার্য হত। আবার এই উপায়ে সংগৃহীত অর্থ মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র, ইয়াতিম, নিরাশ্রয় ও ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী স্বেচ্ছা-সেবকদের জন্য ব্যয় করা হত। মুসলমান দাস-দাসী ও ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারী স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ব্যয়িত হত। অমুসলমানাদের নিকট হতে জিজিয়া ও ভূমি রাজস্ব আদায় করা হত। এটি ব্যতীত যুদ্ধ-বিরতির শর্ত হিসাবেও এককালীন অর্থ আদায় করা হত। তবে ভূমি-রাজস্বই ছিল আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।

ভূমি রাজস্ব প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে সংগৃহীত হত—যেমন মুকাতামা, মিসাহা ও মুকাসামা। জমিদার বা তৎ-সমতুল্য জোতদারগণের নিকট হতে সংগৃহীত রাজস্বের নাম ছিল—মুকাতামা। চাষকৃত জমির ওপর রাজস্বের নাম ছিল—মিসাহা এবং চাষকৃত জমির ফসলের যে অংশ বিশেষকে ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$) কর

হিসাবে ধার্য করা হত, তার নাম মুকাসামা। এটি—ফসল তোলার সময় ফসলের অংশবিশেষ হতে কিংবা ফসলের মূল্য দ্বারা পরিশোধ্য ছিল।

এতদ্ব্যতীত আব্বাসীয় যুগের প্রথমদিকে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে রাজস্ব আদায়ের ওপর কতকগুলি নতুন কর ধার্য হয়। এই করগুলি প্রথম দিকে ধার্মের অনুমোদন পায়নি বলে এদেরকে ধর্মীয় ভাষায় মুকুস বা বেআইনী কর বলা হত। যাই হোক এই সকল করকে বেআইনী ঘোষণা করলেও রাষ্ট্রীয় করের তালিকায় এগুলি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। এমনকি ভূমি রাজস্বের পর যত কর আদায় হত তাদের মধ্যে এইটাই ছিল রাজকোষে অর্থ সমাগমের সর্বাপেক্ষা বড় উপায়। এই করগুলির মধ্যে যে দুটো প্রধান ছিল, তা —অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ওপর ধার্য কর। যে করের নাম ছিল—মায়াসির, মায়াসির শব্দের অর্থ শিকল বা রজ্জু। জলপথে বা নদীতে যাতে কোন জলযান কর ফাঁকি দিয়ে পালাতে না পারে, সেজন্য ওগুলিকে স্থানে স্থানে যে সকল শিকল বা রজ্জু দ্বারা আটকিয়ে রাখা হত তাদের নাম—মাসার। এই মাসার শব্দটি হতে পরবর্তীকালে এই করের নামটিও হয় মায়াসির। এতদ্ব্যতীত যাঁরা ন্যায্য উপায়ে জল-কর দিতেন, সেটার নাম ছিল—শুধু জল-কর। নদীকে যে কোন প্রকারে ব্যবহারের জন্য এই কর দিতে হত। আব্বাসীয় খেলাফতে আরো কয়েকটি কর আমরা লক্ষ্য করি, যেমন—মুস্তাগল্লাত, আবগারী, খনি-কর ইত্যাদি। দোকানপাট বা বড় ঘরবাড়ির ওপর যে কর ধার্য হত তার নাম মুস্তাগাল্লাত, বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের ওপর আবগারী কর দিতে হত। খনির ওপর খনি-কর প্রচলিত ছিল। যাঁরা বন-জঙ্গল ব্যবহার করতেন তাঁদেরও কর দিতে হত।

এতদ্ব্যতীত আব্বাসীয় খেলাফতের রাজকোষে অর্থ সমাগমের আরো কয়েকটি পথ ছিল। মৃত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে ঐ পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তিকে সরকারী সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হত। কোন উজির বা ঐ শ্রেণীর কোন উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারীকে কোন অন্যায় কাজের শাস্তিস্বরূপ পদচ্যুত করা হলে তাঁর বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হত। বিশেষ বিশেষ ধনী ব্যক্তিদের ধনেরও বিশেষ কর দিতে হত। যাকে এ যুগে ধন-কর বা Wealth Tax বলা হয়ে থাকে। শান্তিভঙ্গের জন্য কোন বিশেষ এলাকায় পাইকারী জরিমানা ধার্য হলে তাও সরকারী কোষাগারে আসত। আব্বাসীয় খেলাফতের বিভিন্ন সময়ের সমগ্র সাম্রাজ্যের সর্বমোট আদায়কৃত রাজস্বের একটা চিত্রও আমরা হাতে পাই।

খলিফা	সময়	রাজস্ব	ঐতিহাসিক
হারুণ রশিদ—	(৭৮৬—৮০৯)—	৫৩০,৩১২,০০০ দিরহাম	ক্রেমার।
মামুন—	(৮১৩—৮৩৩)—	৩৩১,৯২৯,০০৮ দিরহাম	ইবন খালদুন।
মুতাসিম—	(৮৩৩—৮৪২)—	৩৮৮,২৯১,৩৫০ দিরহাম	মুদাসা।

মুকতাদির— (৯০৮—৯৩২)—১৪,৫০১,৯০৪ দীনার ক্রেমার
কাহির, রাজী, মুত্তাকী (৯৩২—৯৪৪)—২৯০,০৩৮,০৮০ দিরহাম
মুস্তাকফী, মুতী (৯৪৫—৯৭৪)—২৯৯,২৬৫,৩৪০ দিরহাম ইবন খুরদাজবিহ
আজুদদ্দৌলাহ (বুয়াইয়া) (৯৬৭—৯৮৩) ৩৬০,০০০,০০০ দিরহাম
ইবন-জওজী

এতদ্ব্যতীত খেলাফায়ে রাশেদীন-এর যুগ হতে উমাইয়া যুগ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের ধারাগুলির কিছু কিছু অবিকল অবস্থায় আবার কিছু কিছু সামান্য পরিবর্তিত অবস্থায় প্রচলিত ছিল।

রাষ্ট্রের এই বিরাট আয় বিভিন্ন খাতে খরচ হত। বিশেষ বিশেষ রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠান, রাজকীয়-বিবাহ-শাদী প্রভৃতি কাজে আয়ের একটি অংশ ব্যয় হত। সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণে ও যুদ্ধবিগ্রহে বিরাট একটি অংশও ব্যয় হত। রাষ্ট্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি খাতে ব্যয়ের একটি অন্যদিকও ছিল। কৃষি নির্ভরশীল অঞ্চলগুলিতে কৃষিকাজের উন্নতির জন্য বিরাট অঙ্ক খরচ করাও হত। অনাথ-এতিম, নিরাশ্রয় পঙ্গু, অন্ধ, বিধবা, উপায়হীন অসহায় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা প্রভৃতি মানুষের জন্যও সরকারী খাতে প্রচুর খরচ হত। পথিকদের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, পথিপার্শ্বে পান্থশালা, সরাইখানা, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি কাজগুলিও আব্বাসীয় যুগে প্রাধান্য লাভ করে। আব্বাসীয় খেলাফত মানব সভ্যতার ও সংস্কৃতির যে দীপটি জ্বালিয়ে ধরেছিল, যে অনির্বাণ শিক্ষা তখন সারা বিশ্বকে জ্ঞানের আলো দান করেছিল, আব্বাসীয় খলিফাগণ সেই দীপটিকে সমুজ্জ্বল রাখার জন্য সর্বদাই অকৃপণভাবে অকাতরে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন। মানব সভ্যতার এই পিলসুজটিকে খেলাফতের মাথায় জ্বালিয়ে রাখতে আব্বাসীয় খলিফাগণের অর্থ যথাযথভাবেই ব্যয় হয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও প্রাথমিক যুগের খলিফাগণের জীবনাবসানের সময় রাজকোষে প্রচুর অর্থ জমা থাকতে দেখা যায়—খলিফা মনসুরের মৃত্যুর সময়—রাজকোষে ৬০,০০,০০,০০০ দিরহাম, ও ১,৪০,০০,০০০ দীনার, হারুণ রশিদের তহবিলে—৯০,০০,০০,০০০, দিরহাম এবং মুকতাফির মৃত্যুর সময় তাঁর রাজকোষে ১০,০০,০০,০০০ দীনার জমা ছিল। তবে খেলাফতের শেষের দিকে সব দিকই দুর্বল হয়ে পড়ায় কোন কিছুরই শৃঙ্খলা ছিল না।

দিওয়ান আল-জুনদ—সামরিক বিভাগ ঃ

সৈন্যবিভাগ ঃ আরব খেলাফতে খলিফার দেহরক্ষী বাহিনী ব্যতীত কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থায়ী সৈনাবাহিনী ছিল না। আব্বাসীয় যুগে খলিফাদের দেহরক্ষী বাহিনী খুবই শক্তিশালী ছিল। এই বাহিনীতে প্রথম খোরাসানি, পরে তুর্কী এবং দায়লামি দল নিযুক্ত হয়। দেহরক্ষীর প্রধান খুবই শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তখন সেনাবাহিনী ছিল দু'-প্রকারের, যারা নিয়মিত চাকরি করত এবং সরকারি

তহবিল হতে নিয়মিত বেতন পেত, তাদের বলা হত 'মুরতাজিকা'। এবং যারা শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগদান করত এবং রেশন ও ভাতা পেত, তাদের বলা হত 'মুতাতাওইয়া' অর্থাৎ স্বেচ্ছাবাহিনী। রাজকীয় সেনাবাহিনী ও দেহরক্ষী দল ব্যতীত আরো একপ্রকার সেনাদলের কথা জানা যায়। এরা ছিল ভৃত্যের পর্যায়ভুক্ত। ক্রীতদাসগণের মধ্য হতে অল্প বয়স্ক বালকদের সুশিক্ষাদান করে প্রাসাদে রাখা হত। এদের 'সিবয়ানুদ্দার' বা 'গিলমানুদ্দার' বলা হত। উমাইয়া যুগে কেবলমাত্র আরবগণই সেনাবাহিনীতে যোগদান করত। কিন্তু আব্বাসীয় যুগে বিভিন্ন জাতির লোক সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে পারত। পরবর্তীকালে সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা, ইরাক, পারস্য এবং ট্রান্সক্সিনিয়ার বহু নব দীক্ষিত মুসলমান এবং অমুসলমানও আব্বাসীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। দেহরক্ষী বাহিনীর বেতন ও সাজসজ্জা প্রথম শ্রেণীর ছিল।

বেতন ঃ আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকের একজন পদাতিক সৈনিকের বেতন ছিল বাৎসরিক ৯৬০ দিরহাম। এছাড়াও তাঁরা রেশন ও অন্যানা ভাতা পেতেন। অশ্বারোহীগণ পদাতিকের দ্বিগুণ বেতন পেতেন। সৈনিকদের বেতন অন্যান্য কর্মচারীদের তুলনায় বেশিই ছিল। কেননা খলিফা আল-মনসুরের সময় একজন ভাল রাজমিস্ত্রির বেতন ছিল এক দিরহাম এবং একজন শ্রমিকের বেতন ছিল মাত্র ⅓ দিরহাম।

সৈন্যসংখ্যা ঃ উমাইয়া যুগের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের খেলাফতের অন্তিম মুহূর্তে জাব নদীর তীরে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংঘটিত হয়, যে যুদ্ধক্ষেত্রে উমাইয়া স্বাধীনতা-রবি চিরতরে অস্তমিত হয়, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উমাইয়া পক্ষের সৈনাসংখ্যা ছিল ১,২০,০০০ মতো। এই তুলনায় আব্বাসীয় খেলাফতের সৈন্যসংখ্যা ছিল অধিক। এই সৈন্যসংখ্যা খলিফা হারুণ আর-রাশিদের সময় ১,৫০,০০০ দেখা যায়। খলিফা মুকতাদিরের খেলাফতে বাইজান্টাইন দূতের সম্মানার্থে আয়োজিত এক কুচকাওয়াজে বাগদাদে ১,৬০,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক অংশগ্রহণ করেন। খলিফাগণ সৈনিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই তুলনায় মনোবল বৃদ্ধি করতে পারেননি মোটেই, যার ফলে একদিন অতি সামান্য সংখ্যক আরব সেনা যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তীকালে বহু সংখ্যক সেনাবাহিনীও তাকে রক্ষা করতে সমর্থ না হওয়া বিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি যতটা প্রয়োজন, তা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন সৈনিকদের মনোবল, উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস। শেষের দিকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় খলিফাগণই সৈনিকদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাসকে গড়তে একেবারেই বিফল ও ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাই বহু সংখ্যক সেনাবাহিনীও পরবর্তীকালে তাঁদের আর টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়নি। অক্ষমতা ও দৈন্যের জন্য মূলত দায়ী খলিফাগণই, কেননা তাঁরাই অক্ষম ও অসমর্থ

হয়েছিলেন সক্ষম ও সমর্থ সেনাবাহিনী গড়তে। সকল সময়েই সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা সুদক্ষ সেনার বেশি প্রয়োজন।

জাতীয় বাহিনী গঠন ঃ আব্বাসীয় খেলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আল-মনসুর জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করেন, এবং এটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) হিমারিয়, (২) মুদারিয়, (৩) খোরাসানিয়। পরবর্তীকালে খলিফা মুতাসিম এশিয়া মাইনরের মামলুকদের সমন্বয়ে একটি তুর্কী বাহিনীও গঠন করেন। কিন্তু গোষ্ঠীভিত্তিক সৈন্যদের এই শ্রেণীবিন্যাস পরে বহু জটিলতার সৃষ্টি করে, যা সমগ্র সেনাবাহিনীর মনোবলকেও দুর্বল করে।

সৈনিকদের শ্রেণীবিভাগ ঃ আব্বাসীয় খেলাফতে বেতনভুক নিয়মিত বাহিনী প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—যথা অশ্বারোহী (ফুরসান), পদাতিক (হারবিয়া) এবং তীরন্দাজ (রামিয়া)। এটি ব্যতীত অগ্নিশিখা নিক্ষেপকারী খাদক এবং শ্রমিক শ্রেণীও সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও কয়েকটি ভাগ ছিল, যারা সেই বিভাজন মতো বিভিন্ন শ্রেণীর সাথে নিযুক্ত থাকত।

অস্ত্রশস্ত্র ঃ অশ্বারোহী সৈনিকগণ বর্শা, তীর-ধনুক, লম্বা-চওড়া ও সোজা তরবারি, ঢাল, শিরস্ত্রাণ, উরস্ত্রান ও সমর-কুঠার প্রভৃতি ব্যবহার করত, পদাতিকগণ কেবলমাত্র বর্শা, তীর-ধনুক ও তরবারি এবং ঢাল ইত্যাদি, তীরন্দাজ বা অগ্নি-নিক্ষেপকারীগণ অগ্নিনির্বাপক ('নাফাতুন') নামক পোশাক পরত ও শত্রুপক্ষের দিকে 'নাফতা' অর্থাৎ অগ্নিশর অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করত। সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকত অবরোধ যন্ত্রের প্রকৌশলী। এই অবরোধ-সহ একদল ইঞ্জিনিয়ারও সেনা-বাহিনীর সাথে গমন করতেন। তাঁরা 'মানজানক' অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ যন্ত্রের সাহায্যে দুর্গের ফটকে পাথর দ্বারা আঘাত করত এবং কখনও বা এর দ্বারা অবরোধও সৃষ্টি করতেন। তদানীন্তন যুগে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার, যাঁর নাম ইবন-সারির আল-মানজানিকী। তিনি খলিফা আল-নাসিরের (১১৮০-১২২৬ খ্রীঃ) সময় জীবিত ছিলেন। বেতনভুক সেনাদলে কর্মজীবন আরম্ভ করে তিনি পরে আপন প্রতিভাবলে পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ার-দেরও প্রধান হয়েছিলেন। তিনি আরব যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কেও একটি প্রামাণ্য (যদিও অসমাপ্ত) গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। যুদ্ধ-কৌশল সম্পর্কিত গ্রন্থটির নাম 'উমদাতুল মাসালিক'। পুস্তকখানি তাঁকে আজিও অমর করেছে। এই পুস্তকটিতে যুদ্ধের শ্রেণী-বিন্যাস, দুর্গ দখল, দুর্গ-নির্মাণ, অশ্বারোহ কৌশল, কারিগরি-বিদ্যা, দুর্গ অবরোধ, অশ্বের কুচকাওয়াজ, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা, সামরিক কলকব্জা প্রস্তুত, সম্মুখ যুদ্ধ। বিভিন্ন অশ্ব ও অশ্বারোহীর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সৈনিক-দের প্রকৃতিগত গুণাবলী প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থটিতে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি সেদিনের যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য যেন একটি প্রামাণ্য ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধকোষ।

সেনাবাহিনীর স্তর বিন্যাস ঃ আব্বাসীয় যুগে সেনাবাহিনীর স্তর সব

সময় একই রকম ছিল না। ঐতিহাসিক মাসউদির মতে—প্রতি দশজন সেনার ওপর একজন 'আরিফ' থাকতেন, প্রতি পঞ্চাশ জনের ওপর 'খলিফা' থাকতেন, প্রতি একশ' জনের ওপর একজন 'নকীব', প্রতি এক হাজারের ওপর একজন 'কায়িদ', প্রতি দশ হাজারের ওপর একজন 'আমীর' থাকতেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি সৈন্যদল নিয়ে গঠিত হত একটি 'কোম্পানি' এবং কয়েকটি 'কোম্পানি' নিয়ে গঠিত হত একটি 'কোরদুস'। আমীরকে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে হত এবং কয়েকটি সেনাবাহিনীকে নিয়ে গঠিত হত সমগ্র বাহিনী। এবং কয়েকজন আমীরের ওপর থাকতেন একজন সেনাধ্যক্ষ, যাঁকে বলা হত রঈসুল-জায়শ বা সাহিবুল-জায়শ কিংবা ইস্পাহসালার বা সিপাহসালার বলা হত।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবিন্যাস: উমাইয়া খেলাফত হতে আব্বাসীয় খেলাফত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে বা অভিযানে সৈন্যবিন্যাস মোটামুটি পাঁচ প্রকার ছিল— অগ্র, পশ্চাৎ, কেন্দ্র, ডান ও বাম। আরব সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য দর্শককে যেমন বিস্ময়ে অভিভূত করত, শত্রুকে তেমনি ভয়ে বিমূঢ় করে তুলত। সম্মুখ ভাগে অশ্বারোহী দল দ্রুত গমন করত এবং দু' পার্শ্বে তীরন্দাজ দল তাদের রক্ষা করত। এই তীরন্দাজ দলও ঘোড়ার সাথে তাল রেখেই চলত। পশ্চাতে থাকত অপূর্ব নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে অগণিত পদাতিক বাহিনী। এদের মধ্যস্থলে থাকত খাদ্য, তাঁবু ও অস্ত্র-শস্ত্রবাহী উটের দল, খচ্চর, অশ্ব, অ্যাম্বুলেন্স, ক্ষেপণাস্ত্র, প্রস্তর নিক্ষেপ অস্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি ও মালমাত্তা। এই জাঁকজমক আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পেত যখন স্বয়ং খলিফা কিংবা কোন শাহজাদা অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন। এইরূপ ক্ষেত্রে দেহরক্ষীদের ইউনিফর্ম হত অত্যন্ত জাঁক-জমকপূর্ণ, রাজকীয় পতাকা হত স্বর্ণখচিত, সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের পোশাক পরিচ্ছদ হত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও নয়নাভিরাম।

অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অগ্রগামী সেনাদল নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো মাত্র পরিখা খননের কাজ আরম্ভ করত। অতঃপর মূল সৈন্য দল পৌঁছালে তাঁবুগুলিকে এমন সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত করে স্থাপন করা হত, যা রাস্তাঘাট, হাট-বাজার প্রভৃতি দিক থেকে একটি সুন্দর শহরকেও যেন হার মানিয়ে দিত। সমস্ত কাজ অত্যন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে সমাধার পর রসদ বিতরণ আরম্ভ করা হত, অতঃপর সৈন্য শিবিরে অগ্নি প্রজ্বলিত, রান্নার কাজ আরম্ভ, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মগরেবের নামাজ, অতঃপর সান্ধ্য নাস্তা এবং কিছু রাত্রি হওয়ার পর এশার নামাজ পাঠান্তে সৈন্যগণ চক্রাকারে সুসজ্জিত বেশে যুদ্ধ ও দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী শুনত। কোন কোন সময় বীণা ও বাঁশির সাহায্যে গান ও কবিতা পাঠ শ্রবণ করত।

সমরে সৈনিকগণ: পদাতিক সেনাবাহিনী শত্রুর মোকাবিলা করার সময় সর্বপ্রথম বর্গক্ষেত্র গঠন করত এবং তারা তাদের বর্শাফলককে সম্মুখে বাঁকিয়ে

মাটিতে প্রোথিত করত। অতঃপর হাঁটু গেড়ে মাটিতে ঢাল নামিয়ে শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকত। পদাতিকগণের পেছনে ধনুর্ধর ও তীরন্দাজগণ থাকত। আবার এদের উভয় পাশে থাকত প্রহরী স্বরূপ অশ্বারোহী। শত্রুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকগণ তারা আপন আপন স্বস্থানে থেকেই বর্শার ব্যবহার করত, সঙ্গে সঙ্গে তীরন্দাজগণও ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র ধারায় তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করত। তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহীরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ চালাত, শত্রুগণ পশ্চাদপসারণ করার সঙ্গে অতিরিক্ত সংরক্ষিত বাহিনী প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে শত্রু সৈন্যকে একেবারেই ছত্রভঙ্গ করে দিত। পরে শত্রুবাহিনীকে বহুদূর পর্যন্ত তাড়া করতে হলে অন্য সংরক্ষিত অশ্বারোহী ও তীরন্দাজগণ তাদের অনুসরণ করত।

উন্নতমানের পরিবহন ও যন্ত্র ঃ আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু যে কেবলমাত্র তাঁদের শক্তি ও সাহসের ওপর নির্ভর করত তা নয়। তাঁদের উন্নত কলা-কৌশল ছাড়াও উন্নতমানের পরিবহন বা যন্ত্রও তাঁদের কৃতকার্যতার জন্য অনেকখানি দায়ী। গ্রীকগণ খচ্চর, গাধা ও ঘোড়ার সাহায্যে মালপত্র টানত। কিন্তু আরবগণ এই উদ্দেশ্যে উটের ব্যবহার করতেন। যাতে তাঁরা অতি অল্প সময়েই এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করতে পারতেন। পার্বত্য যুদ্ধক্ষেত্রেও আরবগণ সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। পার্বত্য এলাকায় বাবাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিনী যে দক্ষতা ও নিপুণতার পরিচয় দেন, তা ইতিহাসে বিরল। দশম শতাব্দীতে স্যারাসিনগণ বাইজানটাইনদের চরম শত্রুতে পরিণত হওয়ার দুটো কারণ ছিল—(১) স্যারাসিনগণের অগণিত সংখ্যা। (২) তাঁদের অসাধারণ গতিশীলতা বা ক্ষিপ্রতা।

নৌ-বাহিনী ঃ প্রথম মুসলিম নৌবহরের কথা বলতে গেলে ইসলামের দ্বিতীয় সৎ-খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রীঃ) প্রতিকূল অবস্থার কথা চিন্তা করে ভূমধ্যসাগরে নৌ-অভিযানের অনুমতি দেননি। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রাঃ) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রীঃ) খলিফা হওয়ার পর সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়াকে সাইপ্রাস অভিযানে অনুমতি দিলে তিনিই প্রথম মুসলিম নৌ-বহরকে আব্দুল্লাহ বিন কায়েসের নেতৃত্বে সাইপ্রাস অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুসলিম নৌ-বহরের ইতিহাসের এইটাই হল আদি কথা।

উমাইয়া যুগের মতো আব্বাসীয় খেলাফতেও নৌ-বহর খুবই শক্তিশালী ছিল। কৃষ্ণসাগর, পারস্য সাগর, লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগরেও মুসলিম নৌ-বাহিনী মোগতায়েন থাকত। মুসলিম নৌ-বাহিনী চরম সাফল্যের পরিচয় দেয় ক্রীট, সিসিলি ও ভূমধ্যসাগরের কতিপয় দ্বীপাঞ্চল অধিকারে। পরবর্তীকালে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্বাধীন মুসলিম রাজ্যগুলির নৌ-বাহিনী একচেটিয়া হয়ে পড়ে। স্পেনের উমাইয়াগণ এবং মিশরের ফাতেমিগণ অতি উন্নতমানের নৌ-বহরের অধিকারী ছিলেন। এই সময়ের আমরা পাঁচটি বিভিন্ন

প্রকারের নৌ-বহর বা যুদ্ধ-জাহাজের নাম পাই, যথা—(১) আশশুউনা—বড় যুদ্ধ জাহাজ, এই জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র বহন করা হত, (২) হাররাকা—এই জাহাজে ন্যাপথা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করা হত, (৩) তাবরাদা—ক্ষিপ্রগতি ছোট নৌকা, (৪) ইশারিয়াৎ ও (৫) সালান্দাৎ—যুদ্ধ জাহাজ। নৌবহরের প্রধানকে আমীরুল বহর, সমুদ্রের প্রধান, এই আরবী আমীরুল শব্দটি থেকে ইংরাজী (Admiral) এ্যাডমিরাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

সেনাধ্যক্ষগণের জায়গীর: খলিফা মুকতাদিরের (৯০৮-৩২ খ্রীঃ) সময় হতে আব্বাসীয়গণের সামরিক শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। এই সময়ই খলিফা সৈনিকদের সরাসরি বেতন দিতে সমর্থ না হওয়ায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে সেনাবাহিনীর বেতন দিতে আদেশ বা অনুমতি দেন। যার ফলে সৈনিকগণ রাজকীয় কোষাগার হতে সরাসরি বেতন পেতেন না। এর প্রতিক্রিয়া হল সুদূর-প্রসারী, সৈনিকগণ খলিফার প্রতি আনুগত্য হারিয়ে ফেলল ধীরে ধীরে, তারা জানল—তাদের প্রভু বা মালিক খলিফা নন, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকেও তাঁদের আপন আপন ব্যয় নির্বাহের জন্য জায়গীর প্রদান করা হল। এই অবস্থা সৃষ্টির মূলে ছিল কেন্দ্রীয় শাসনে খলিফার দুর্বলতা, খলিফার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর পাঠান বন্ধ করে দেন, তখন নিরুপায় খলিফা বাধ্য হয়েই বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে এই শর্তে শাসনভার দান করলেন, তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্বে রাজস্ব আদায় করে আপন দায়িত্বে যাবতীয় ব্যয় বহন করে এবং সৈনিকদের বেতনও দান করে পরিশেষে একটি নির্দিষ্ট অংক বাগদাদে প্রেরণ করবেন। এই প্রথার নাম ছিল ইকতা বা জায়গীর প্রথা।

এই প্রথা প্রচলনের পর হতেই খলিফা দুটো জিনিস একেবারেই হারালেন—(১) প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের ওপর আপন কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব, (২) খলিফার প্রতি সেনাবাহিনীর অটুট আনুগত্য। ফলে দেখা দিল—শাসনে বিশৃঙ্খলা ও সমরে দুর্বলতা ; যে দুটো জিনিস একটি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য ছিল। একদিন যে খলিফাদের সামান্য ইঙ্গিতের ওপর নির্ভর করত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মান-সম্মান ও পদ, যাঁর অনুগ্রহ ও অনুদান ছিল শাসনকর্তাদের মান-সম্মানের মানদন্ড, আজ সেই খলিফাই হলেন ঐ সমস্ত শাসনকর্তাদের নিকট অনুগ্রহের পাত্র। এইভাবেই বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্য তার অপরিমিত সামরিক শক্তিকে হারাল।

উপসংহার: বুয়াইয়া আমীরগণ সৈনিকদের বেতন দেওয়ার পরিবর্তে জায়গীর দানের প্রথা ব্যাপকভাবে চালু করেন। এই প্রথা সেলজুকদের সময়েও নিয়মিত প্রথা হিসাবেই প্রবর্তিত হয়। এই সময় প্রাদেশিক গভর্নর সেনাপতিগণ শহর, অঞ্চল ও প্রদেশ পর্যন্ত জায়গীর হিসাবে পেয়ে থাকতেন। অতঃপর এঁরা

স্বাধীনভাবেই আপন আপন এলাকা শাসন করতে থাকেন। খলিফার প্রতি এঁদের দায়সারা গোছের দুটো মাত্র কর্তব্য ছিল—(১) বছরান্তে একটি বাৎসরিক কর পাঠান খলিফার দরবারে, (২) যুদ্ধকালীন সময় কিছু সৈনিক নিয়ে খলিফার পতাকার নিচে হাজির হয়ে যুদ্ধযাত্রা করা। এই সকল সৈনিকদের সাজ-সরঞ্জাম ও যাবতীয় ব্যয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরই বহন করতে হত। যার ফলে যে যত পারতেন কম সংখ্যায় সৈন্য আনার চেষ্টা করতেন। এ যেন নেহাৎ চাঁদা করা সৈন্য দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনা মাত্র। যার ফলে বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্য শাসনে হারাল—শৃঙ্খলা, এবং সমরে হারাল—শক্তি। অর্থাৎ পরিশেষে আব্বাসীয় কেন্দ্রীয় শাসন সামরিক বিভাগ বলতে যেন আর কিছুই ছিল না।

বিচার ও অন্যান্য বিভাগঃ মুসলিম সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার করা ও তার প্রতিষ্ঠা একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। কেননা ইসলামের প্রবর্তক মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) বলেন—"৬৫ বছরের (অর্থাৎ একটি মানুষের সমগ্র জীবনের) নফল এবাদাৎ (অতিরিক্ত আরাধনা) অপেক্ষা আল্লাহর নিকট একটি ন্যায়বিচার শ্রেষ্ঠ।" এই কারণেও খলিফাগণ ন্যায়বিচার সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। খলিফা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করতেন। এই বিভাগের প্রধানকে "কাজী-উল-কুজাত" বলা হত। প্রদেশের বিচারককে কাজী বলা হত। ইমাম আজম আবু হানিফার শিষ্য বিখ্যাত আইনজ্ঞ ইমাম আবু ইউসুফ সর্ব প্রথম কাজী-উল-কুজাত উপাধি লাভ করেন। তিনি মাহদি ও তাঁর দুই পুত্র মুসা ও হারুণের সময় উক্ত পদ অলংকৃত করেন।

এই পদ অলংকৃত করার জন্য যে কয়েকটি গুণের একান্ত প্রয়োজন হত, তা—কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, ইজমা অর্থাৎ জনসাধারণের মতামত সম্পর্কে অভিজ্ঞ, ইজতেহাদ ব্যক্তিগতভাবে ব্যাখ্যার যোগ্যতা, এতদ্ব্যতীত পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক, সবল শরীর, স্বাধীন, মুসলমান, চরিত্রবান, জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া প্রভৃতি গুণ থাকা আবশ্যক ছিল। অমুসলমানদের বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন তাঁদের আপন গোত্রের জ্ঞানী ব্যক্তি।

এই যুগে দু' শ্রেণীর কাজী লক্ষ্য করা যায়, যথা—বেতনভুক ও অবৈতনিক। প্রথম শ্রেণীর কাজীগণের কর্তব্য ছিল—বিরোধ নিষ্পত্তি, ধর্মীয় বিধিবিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি বিধান, দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান এবং আরো বহু কিছু ছিল। কাজীগণ তাঁদের কার্যনির্বাহের জন্য নায়েব (সহকারী), কাতিব (লেখক), হাজিব (প্রহরী) ও খাজিন (কোষাধ্যক্ষ) নিযুক্ত করতে পারতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজীগণ ছিলেন অবৈতনিক। এই যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে সরকারী কাজীর পদ গ্রহণে প্রায় অনীহা ও অনিচ্ছা দেখা যায়। যদিও বা কেউ গ্রহণ করতেন, কিন্তু বেতন নিতেন না। এমনকি বেতনের পরিবর্তে বা নামে বেনামে কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না। এই সকল কাজীদের ওপর খলিফা কোন

কিছু জোর করে চাপিয়ে দেবো মনে করলেও তা পারতেন না। এ'দের ব্যক্তিত্ব ছিল বড়ই প্রখর। এমনকি অনেককে কাজীর পদে আমন্ত্রণ দিয়েও স্বয়ং খলিফাও তাঁদেরকে পদে নিযুক্ত করতে পারেননি। যেমন খলিফা হারুণ-রশিদ ইমাম আবু হানিফাকে প্রধান বিচারপতির আসন অলংকৃত করতে অনুরোধ করলে তিনি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি। তখন স্বয়ং খলিফা ইমামকে দরবারে ডেকে বিচারপতির পদ গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইমাম উত্তরে বলেন—তিনি অনুপযুক্ত এই কাজে। তখন খলিফা বলেন—"আপনি উপযুক্ত ব্যক্তি।" উত্তরে ইমাম বলেন—আমার কথা সত্য হলে আমি অনুপযুক্ত, আর আপনার কথা সত্য হলে—আমি মিথ্যাবাদী। সুতরাং কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি বা কোন মিথ্যাবাদী প্রধান বিচারপতির আসন অলংকৃত করতে পারে না।" তখন খলিফা একেবারেই নিরুত্তর হয়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। ইমাম রাজদরবার হতে বিদায় নিলেন।

দিওয়ানুল-রাসায়েল—পত্র-বিনিময় বিভাগ ঃ

দিওয়ানুল-বারিদ—ডাক বিভাগ ঃ আব্বাসীয় যুগে রাজকীয় আদেশ, দণ্ডাদেশ, উপাধি পত্র প্রভৃতি কাজ সম্পাদন করত দিওয়ানুল রাসায়েল। উমাইয়া যুগে খলিফা মুয়াবিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন -দিওয়ানুল বারিদ বা ডাক বিভাগ। খলিফা হারুণ-আর-রশিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিভাগের বিশেষ উন্নতি ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বার্মেকি মন্ত্রী ইয়াহিয়া এই বিভাগকে নতুনভাবে গঠন করে এর আমূল পরিবর্তন করে। প্রতি প্রদেশে ডাক বিভাগ খোলা হয়, কেন্দ্রের সাথে এবং এক প্রদেশের সাথে অন্য প্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার জন্য ঘোড়ার সাহায্যে রিলে প্রথার প্রবর্তন করে চিঠিপত্রের দ্রুত আদান-প্রদান করা হত। এই কাজে অশ্ব ব্যতীত উট ও খচ্চরও ব্যবহৃত হত। সমগ্র সাম্রাজ্যে সাড়ে বিশ শত রিলে কেন্দ্র ছিল। পায়রার সাহায্যে চিঠিপত্র লেনদেন সম্পর্কে আমরা যে গল্প শুনে থাকি, তা শুধু গল্পই নয়। খলিফা মুতাসিমের (৮৩৩-৮৪২ খ্রীঃ) সময় পায়রাকে চিঠি বহনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এবং পায়রা-গুলিকে প্রশিক্ষণ সমাপ্তে খুবই বিশ্বাস করা হত, কেননা তাদের দ্বারা খুব গোপনীয় পত্র প্রেরণ করা হত। এবং পায়রাগুলিও সেই গোপনীয়তা রক্ষা করতে সক্ষম হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় রাষ্ট্রদ্রোহীদের গ্রেফতারের খবর পায়রার সাহায্যে খলিফার নিকট প্রেরিত হত। সেই দিনের পায়রাদের গুণাগুণকে স্বীকৃতি দিয়ে আজও বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়—"যাও পাখি বলো তারে সে যেন ভুলে না মোরে।" ডাক বিভাগের প্রধানকে সাহিবুল বারিদ বলা হত। এই বিভাগে গোয়েন্দা বিভাগেরও কাজ চলত। সে যুগেও বহু মহিলাও গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করতেন। খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রীঃ) সময় গোয়েন্দা বিভাগে ১৭০০ মহিলা কর্তব্য রত ছিলেন। এমনকি এই কাজে মহিলাগণই অনেকক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা বেশি কৃতকার্য হয়েছিলেন।

মামুনের খেলাফতকালে গোয়েন্দা বিভাগের কোন একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী কোন একটি গোপন ঘটনার সূত্র বের করতে না পারায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে কথা দেন আগামীকালই তিনি (স্ত্রী) এই ঘটনার সূত্র বের করে দেবেন, সুতরাং তিনি (স্বামী) যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান। কার্যত তাই হল। এই কথা খলিফার কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি ঐ মহিলাকে রাজদরবারে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানান এবং ঐ বিভাগের একটি উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। এইভাবে আজ হতে হাজার বছরেরও পূর্বে খলিফা মামুনের রাজদরবারে হাজার হাজার মহিলা কাজ করে সে যুগের মহিলা-চেতনার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ইসলামের পর্দা প্রথা তাঁদের নিকট যেমন অবরোধ প্রথা রূপেও দেখা দেয়নি, তেমন আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃংখলতাতেও পরিণত হয়নি। বরং সেখানে ইসলামের পর্দা প্রথা দেখা দিয়েছিল—শালীনতার সাথে জীবনকে সমুন্নতির পথে পরিচালনা করতে। ইসলামের পর্দা যেমন শালীনতার নামে অবরোধও নয়, তেমনি স্ত্রী-স্বাধীনতা উচ্ছৃংখলতাও নয়। বরং শালীনতা ও স্বাধীনতার সংমিশ্রণই ইসলামের পর্দা প্রথা, যা শিক্ষার পথে, সত্য ও সুন্দরের পথে, সমুন্নতির পথে যে কোন জীবনের জন্য কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

দিওয়ানুল খাতাম—সিলমোহর বিভাগঃ খলিফাদের সিলমোহরকৃত আদেশাবলী অথবা ফরমান সংরক্ষিত থাকত এই বিভাগে। রাজকীয় ফরমান যাতে জাল না হতে পারে, সেজন্য যা কিছু করণীয় ছিল তা এই বিভাগই করত; এবং খলিফার ফরমানগুলিকে এই বিভাগ যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থাও করত।

দিওয়ানুল সুরতা—পুলিশ বিভাগঃ তখন পুলিশ বিভাগ দিওয়ানুল সুরতা নামে পরিচিত ছিল। এই বিভাগের প্রধানকে 'সাহিবুল-সুরতা' বলা হত। এই বিভাগের অন্তর্গত ছিল দুটো প্রধান বিভাগ—একটি খলিফার দেহরক্ষী বাহিনী ও অন্যটি সাধারণ পুলিশ। খলিফার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান কাজ ছিল—সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা। এবং সাধারণ পুলিশ মুহতাসিব নামে পরিচিত ছিল। এদের কাজ ছিল—হাট-বাজার পর্যবেক্ষণ করা, ওজন ও খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা এবং সমাজে অসামাজিক অনৈসলামিক কাজ-গুলিকে কঠোর হস্তে দমন করা ইত্যাদি। এই প্রথা সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন খলিফা আল-মাহদি (৭৭৫-৮৫ খ্রীঃ)।

দিওয়ানুল-নজর বিল মাজালিম—জুলুম নিবারিত বিভাগঃ

এই বিভাগের প্রধান কাজ ছিল অসহায়, দুর্বল, দুঃস্থ-পীড়িত, নিপীড়িত, অনাথ-এতিম প্রভৃতিদেরকে রক্ষা করা। এমনকি অনেক সময় অন্যায় ও পক্ষপাতিত্ব-মূলক রায়ের বিরুদ্ধে আপীলও এই বিভাগে করা হত। খলিফা আল-মাহদি সর্বপ্রথম এই বিভাগ প্রবর্তন করেন। খলিফা হারুণের (৭৮৬-৮০৯ খ্রীঃ) সময় জাফর এই বিভাগের প্রধান ছিলেন। মামুন (৮১৩-৩৩ খ্রীঃ) এই বিভাগকে

অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মর্যাদা দান করে স্বয়ং নিজে প্রতি রবিবার মজলুমদের অর্থাৎ নিপীড়িতদের অভিযোগ শ্রবণ করে অত্যাচারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি-দানের বিধান দিতেন। রোমান রাজা দ্বিতীয় রজার (১১৩০-৫৪ খ্রীঃ) এই প্রথার গুণাগুণে মুগ্ধ হয়ে আপন রাজ্য সিসিলিতে সর্বপ্রথম এর প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কালে এর সুফলে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই সমগ্র ইউরোপে এই প্রথার সম্প্রসারণ করেন। খলিফা মামুন এই ব্যাপারে কোরআনের একটি কথা প্রায়ই উচ্চারণ করতেন—"তোমরা অত্যাচার কর না এবং অত্যাচারিত হয়ো না।" ২ঃ২৭৯

অন্যান্য বিভাগঃ

দিওয়ানুল-জিমাম ঃ এই বিভাগ কেন্দ্র ও প্রদেশ সমূহের-আয়-ব্যয়, হিসাব-পত্র পরিচালনা করত। হিসাব পরীক্ষা বা অডিট করাও এই বিভাগের দায়িত্ব ছিল। খলিফা আল-মাহদি এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। দিওয়ানুল নাফফাত এই বিভাগ রাজপ্রাসাদের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, রেশন, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, আস্তাবলের ঘোড়া ও অন্যান্য প্রাণীদের হিসাব ও রক্ষণের দায়িত্বে ছিল। দিওয়ানুল আতা দান-খয়রাত বিষয়ক বিভাগ—এই বিভাগ খলিফাদের দান খয়রাতের হিসাব রক্ষা করত। দিওয়ানুল-সির—এই বিভাগ গোয়েন্দা দপ্তরের কাজ করত। দিওয়ানুল-আকরিহা কৃষি বিভাগ—এখানে কৃষি কাজের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। দিওয়ানুল সাওয়াফি এই বিভাগ--খলিফাদের রাজ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করত। দিওয়ানুল-দিয়া—খলিফাদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল এই বিভাগ।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ঃ বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইসতাখারি, হাওকাল এবং ইবন-আল-ফকিরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, উমাইয়া খেলাফতের সময় প্রাদেশিক বিভাগগুলি যেমন ছিল আব্বাসীয় খেলাফতে তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। আব্বাসীয়গণের সময় প্রদেশের সীমানার মাঝে মাঝে কিছু রদবদল হত, যার ফলে ভৌগোলিকগণের বর্ণিত নামের সাথে রাজনৈতিক এলাকা-গুলির সবসময় হুবহু মিল পাওয়া যেত না। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তাঁরা বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। কম বেশি মতান্তরে ২৪ হতে ৩৫টা প্রদেশ ছিল—(১) পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ও সিসিলি, (২) মিশর, (৩) সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন, (৪) আল-হেজাম ও ইয়ামামা, (৫) আল-ইয়েমেন অথবা দক্ষিণ আরবভূমি, (৬) আল-বাহরাইন ও ওমান, (৭) আল-সাওয়াদ বা ইরাক, (৮) আল-জাজিরা রাজধানী মসুল, (৯) আজার-বাইজান, (১০) আল-জিবাল অথবা পারস্য-ইরাক, (১১) খুজিস্তান, (১২) ফারস-শিরাজ, (১৩) কিরমান, (১৪) মাকরান, (১৫) সিজিস্তান বা সিস্তন, (১৬) কুহিস্তান, (১৭) কুমিস, (১৮) তাবারিস্তান, (১৯) জরজাম বা গুরগান, (২০) আরমেনিয়া, (২১) খোরাসান-উত্তর পশ্চিম

আফগানিস্তান-সহ, (২২) খাওয়ারিজম, (২৩) আল-সুগদ-বুখারা ও সমরকন্দ শহর সহ (২৪) ফারগানা।

এই প্রদেশগুলির নিচে ছিল জেলা স্তর, জেলা স্তরের নিচে ছিল মহকুমা, থানা, অঞ্চল গ্রাম। শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ইসলামের দ্বিতীয় সৎ খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) সমগ্র রাজত্বটাকে এইভাবে ওপর হতে নিচু পর্যন্ত ছবির মতো সাজিয়ে যান। শুধু ইসলামের রাজত্বেই নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে শাসন পদ্ধতি রচনায় ও পরিচালনায় হজরত ওমরের স্থান অতি উচ্চে। ইসলামের পরবর্তী খলিফাগণ প্রকারান্তে শাসনে-প্রশাসনে তাঁকেই অনুসরণ করেন।

প্রদেশের শাসনকর্তাকে আল-ওয়ালী বা আমীর বলা হত, জেলার শাসনকর্তাকে আমীর বা আমিন বলা হত। উজিরের সাথে পরামর্শ করে স্বয়ং খলিফা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে নিযুক্ত করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের নিযুক্ত করতেন, কিন্তু জেলাশাসককে নিযুক্ত করার পর খলিফার নিকট তাঁর নাম পাঠাতেন অনুমোদনের জন্য। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে কয়েকটি দায়িত্ব পালন করতে হত—(১) শাসন বিভাগ পরিচালন করা, (২) সামরিক বিভাগের তদারকি করা, (৩) ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা শুক্রবারে জুম্মার নামাজে খোতবা পাঠ করা, (৪) রাজস্ব আদায় (৫, পুলিশবাহিনী গঠন, (৬) প্রদেশের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা, (৭) ডাক বিভাগ প্রভৃতির দায়িত্ব পরিচালনা করা। বিচার বিভাগের দায়িত্ব ছিল সম্পূর্ণ খলিফার হাতে। খলিফা নিজে বিচারক নিযুক্ত করতেন, এবং বিচারক এক খলিফা ব্যতীত অন্য কোন রাজকর্মচারীর নিকট দায়ী থাকতেন না আপন কাজের জন্য। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই হজরত ওমর রাঃ) বিচার বিভাগকে প্রশাসন হতে পৃথক করে দিয়েছিলেন এবং নির্ভীক ও নিষ্ঠার সাথে বিচারকার্য সুসম্পন্ন করার জন্য বিচারকে কোন রাজকর্মচারীর অধীনস্থ করেননি। হজরত ওমর (রাঃ)-এর প্রবর্তিত এই নীতিকে উভয় যুগের কোন খলিফাই লঙ্ঘন করতে সাহস পাননি, বরং প্রচুর সম্মান প্রদর্শনই করেছিলেন। উমাইয়া যুগের খলিফা দ্বিতীয় ওমর (যাঁর সাধুতার জন্য তাঁকে পঞ্চম সৎ খলিফা বলা হত, হজরত ওমরের যাবতীয় নীতিকেই পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রের ন্যায় প্রদেশেও কয়েকটি বিভাগ ছিল, যেগুলিকে সাধারণত সচিবালয় বলা হত—কাতিব প্রধান উপদেষ্টা, কাতিব-উদ-দিওয়ান, প্রধান সামরিক উপদেষ্টা, সাহিবুল-আহদাত-পুলিশ উপদেষ্টা, সাহিবুল-বাইতুলমাল-কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি।

আব্বাসীয় খেলাফতের শেষের দিকে অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা ও প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। খেলাফতের শেষের দিকে এই অবাঞ্ছিত জিনিসটাই বা স্তরে রূপ নিয়েছিল যখন খলিফা ছিলেন আমীরদের ক্রীড়নক মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্বাসীয় যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

সামাজিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য : আব্বাসীয় যুগে আরবের প্রাচীন গোত্র-ভিত্তিক রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার কৌলিন্য ও আভিজাত্য বহুলাংশে পরিবর্তিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই সামাজিক ব্যবস্থার বিবর্তনের মূলে ছিল রাজনৈতিক কারণ। একথা সর্বজনবিদিত যে আব্বাসীয়গণ পারসিক ও অনারব মুসলমানদের সাহায্যে রাজশক্তি ও রাজ তখত লাভ করেন। পরবর্তীকালে কৃতজ্ঞতায় হোক আর ভালবাসায় হোক খলিফাগণ অন-আবর মুসলমানদের প্রাধান্য দিতে ভালবাসতে আরম্ভ করেন। রাজদরবারে অন-আরব মুসলমানগণ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকলেন। কালক্রমে তারাই যেন রাজদরবারকে অলংকৃত করলেন। এইভাবেই খলিফাদের রাজমহলও একদিন অধিকৃত হল অন-আরব মুসলিম-রমণীগণ দ্বারা। অন-আরব মুসলিম আমীর উমারাদের সাথে খলিফাগণের মেশামিশি যতই ঘনিষ্ঠ হতে থাকল খলিফাগণও ততই অন-আরব মুসলিম বিদুষীবালাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকলেন। ফলে একদিন অধিকাংশ খলিফাই অন-আরব মুসলিম রমণীদের পানিগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। এই সমস্ত রমণীগণের অনেকেই ছিলেন পারসিক, তুর্কী ও আর্মেনীয় মহিলা। সুতরাং খলিফাগণের রাজদরবারে ছিল—অন-আরব পারসিক ও তুর্কী দেহরক্ষী. পারশিক উজির ও কর্মচারিবৃন্দ এবং ভেতর মহলে ছিল অন-আরব রাজমাতা, রাজরানী, প্রমুখ মহিলাগণ। ফলে ভেঙে পড়ল উমাইয়া যুগের পুরাতন আরব অভিজাত শ্রেণী, বিনষ্ট হল আরব কৌলিন্য, নির্মূল হল আরব জাতীয়তাবাদী আভিজাত্য।

আধুনিক আরবে মিশ্র জাতির সৃষ্টি : আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ, আল-মাহাদ এবং আল-আমীন ব্যতীত অন্য কোন আব্বাসীয় খলিফা খাঁটি আরব রক্তের কৌলিন্যের দাবি করতে পারেননি। কেননা অপরাপর খলিফাগণ ছিলেন অন-আরব মাতৃগর্ভজাত সন্তান। খলিফা আল-মামুনের মাতা ছিলেন পারস্য-দুহিতা। আল-ওয়াসিক ও আল-মুহতাদির মাতা ছিলেন গ্রীকবালা। কেবলমাত্র খলিফাগণই নহেন আরব মুসলিমগণও সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্বাধীন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে আপন স্বাতন্ত্র্য ও বংশ কৌলিন্য হারান। যার ফলে মিশ্র জাতির সৃষ্টি হল।

ইসলামের দ্বিতীয় সৎ-খলিফা আমীরুল মুমেনিন হজরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশাসনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'আরব জাতীয়তাবাদ'। তিনি এই জাতীয়তাবাদকে সকল মালিন্য হতে দূরে রেখেছিলেন। পৃথিবীর অনন্যসাধারণ প্রশাসক

ও দূরদর্শী খলিফা বুঝতে পেরেছিলেন আরব জাতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য জাতিগত বিশুদ্ধতা, সামরিক কলাকৌশল, বীরত্ব, একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা, সত্য বলার দুর্বার দুঃসাহসিকতা, দুর্জয়কে জয় করার সহজাত প্রবণতা ইত্যাদিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাদেরকে অবশ্যই পৃথক রাখতে হবে। তাই তিনি আজ হতে ১৪০০ বছর পূর্বেই সমগ্র মুসলিম-অধ্যুষিত আরব ভূমিকে একটি দুর্গে পরিণত করে সমগ্র জাতিকেই করেন একটি শ্রেষ্ঠ সমরবাহিনী। যে সমরবাহিনী দ্বারা একদিন তাঁদের হয়েছিল বিরাট অভূতপূর্ব সামরিক। যে জয়ের ব্যাপকতা ছিল বিশ্বজোড়া। পরবর্তী অধ্যায়ে আব্বাসীয় যুগের এই মিশ্র জাতির সৃষ্টি আনল বিশ্বজুড়ে সংস্কৃতির জয়, কিন্তু এই সংস্কৃতির জয় ঐ সামরিক বিজয়কে টিকিয়ে রাখতে পারল না। এটাই ছিল মিশ্র জাতির করুণ পরিণতি।

প্রাচীন আরবে মিশ্র জাতিঃ তবে কয়েক হাজার বছর পূর্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—বর্তমান আরবে প্রবাহিত তিনটি পৃথক রক্তধারার ত্রিবেণী। যেমন—ইরান, মিশর ও আরব। এই তিনটির মিলিত ধারা বর্তমানের অভিজাত আরব। কেননা বর্তমান ইরানের মেসোপটেমিয়ার অমর সন্তান আল্লাহর দূত হজরত ইব্রাহিম (আঃ), তাঁর স্ত্রী ছিলেন হাজেরা বিবি মিশর-তনয়া। এই দাম্পত্যজীবনের সুসন্তান ছিলেন হজরত ইসমাইল (আঃ), যিনি পরিণত বয়সে বিবাহ করেন খাঁটি আরব গোত্রের কন্যা সাইদাকে। বর্তমান আরবের কোরাইশ বংশের অর্থাৎ হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর পূর্বপুরুষ ঐ যুগল দম্পতি হজরত ইসমাইল ও বিবি সাইদা। সুতরাং বর্তমান আরব ধমণীতে তিনটি রক্তের মিশ্রধারা ফল্গুর মতো প্রবাহিত হচ্ছে।

আরবের আদিবাসী আরব বাইদাগণ। তাঁদের ধ্বংস বা জয় করে প্রতিষ্ঠিত হন বহিরাগত আরব আরিবাগণ, এঁদের সাথে যোগ দেন আরব মুসতারিবা। আরব আরিবাগণ পরে 'কুহতান' সম্প্রদায় নামে পরিচিত, এই সম্প্রদায় হতে আবিভূ'ত হন হজরত মহম্মদ (দঃ)। আরব মুসতারিবা হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ধারা। (এই বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে লেখকের ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।)

সমাজে নারীর মর্যাদাঃ আব্বাসীয় যুগে সাধারণ-অসাধারণ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা নির্বিশেষে সকল মহিলাই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। দাস প্রথা প্রচলিত থাকলেও তাদের প্রতি সদয় উদার মনোভাব পোষণ করা হত। দাসীদের মধ্য হতেও যাঁরা জ্ঞানী-গুণী ও সুন্দরী ছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রকৃত মর্যাদা পেতেন। খলিফা মামুনের মাতা ছিলেন পারস্য তনয়া সুন্দরী ক্রীতদাসী মারজিলা। খলিফা হারুণ-আর-রশিদ ইসলামি বিধিমতে ক্রীতদাসী মারজিলাকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিয়েও স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাকে জীবন সঙ্গিনীর মর্যাদা দান করে সমগ্র স্ত্রী-জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে-

ছিলেন। এতদ্ব্যতীত খলিফাগণ তাঁদের বেগমদের গুণানুযায়ী রাজকার্যেও পরামর্শ গ্রহণ করে তাঁদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। খলিফা মাহদির মহিষী খাইজুরান মাহদির কন্যা বিদুষী উলাইয়া, হারুণ-রশিদের স্ত্রী জুবাইদা, মামুনের বিদুষী মহিলা বুরান বহু সংকটে স্বামীদের ও পিতাকে সুযোগ্য পরামর্শ দিয়ে আপন আপন প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। বিশ্ব-সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্রে আব্বাসীয় দরবার সঙ্গীত ও কবিতাকে বিশেষ স্থান দান করায় বহু মহিলা এক্ষেত্রে নিজেদের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আল-মুতাসিমের খেলাফতে বিদুষী উবাইদা আল-তুনবুরিয়া সৌন্দর্য ও সঙ্গীত চর্চার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তবলাবিশারদ উবাইদা নিপুণ তবলাবাদিকা হিসাবে খলিফার নিকট হতে তাম্বরিয়া বা তানবুরিয়া উপাধি লাভ করেন। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সময়ে ফজিলা নাম্নী এক মহিলা কবি তার অসাধারণ কবি প্রতিভার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে শায়খা শুহদা নাম্নী এক মহিলা বাগদাদে ইতিহাস ও সাহিত্যের জন্য অপূর্ব বক্তৃতা দান করে জনগণকে বিমোহিত করে তুলতেন। অনুরূপভাবে জয়নব উম্মুল মুয়াইয়িদ আইনবিশারদ রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। গরীয়সী মহিলা তাকিয়াহ হাদিস শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

বিবাহ ঃ সর্ব যুগের সর্ব দেশের মুসলমান সমাজে নর-নারীর বিবাহ একটি ধর্মীয় কর্তব্য ও পারিবারিক জীবনাদর্শ বলে বিবেচিত। কেননা ইসলামধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) বলেন—"বিবাহ আমার জীবনধারা, যে তাকে পরিত্যাগ করল, সে আমার নয়।" এই ঘোষণাটি হতেই মুসলিম সমাজ অতীব সচেতন বিবাহ সম্পর্কে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, সন্তানদের লালন-পালন ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং যথাসময়ে বিবাহ দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অতি বড় পুণ্যের কাজ। তাই ইসলাম নিছক একটি ধর্মমাত্রই নয়, ইহা জীবনব্যবস্থা, সত্য ও সুন্দরের পথে সমন্বিত জীবনযাপন। আব্বাসীয় যুগে এই বিবাহ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। সে যুগে আধুনিক যুগের মতো কোন পণ প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় না। অথচ ইসলাম মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে তাদের ভাবী স্বামীকে পছন্দ করার জন্য। যুবক-যুবতীর দাম্পত্যজীবনে এটা ইসলামের নীতিগত বিধান। বিবাহের পর গৃহকর্ম এবং স্বামী ও সন্তানদের পরিচর্যা করা স্ত্রী-জাতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল। সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মাতার ওপরই ন্যস্ত থাকত। অনেক সময় অনেক মেয়ে সুতা কেটে বা তাঁত বুনে অবসর সময় বিনোদন করত।

ভদ্রসমাজ ঃ উমাইয়া যুগকে যেমন সাধারণত রাজ্যবিস্তারের যুগ বলা হয়ে থাকে, আব্বাসীয় যুগকে তেমনি সংস্কৃতি ও সভ্যতার যুগ বলা হয়ে থাকে। এই সাংস্কৃতিক ও সভ্য যুগের মানুষ কেমন আচরণের জন্য কিরূপ ভাবে সভ্য বলে

বিবেচিত হতেন, তার একটা নমুনা পাওয়া যায় আব্বাসীয় যুগে। আরব ঐতিহাসিকদের মতে, যাঁদের শরীফ বা ভদ্র বলা হত তাঁর ব্যবহার হত অতি নম্র। তিনি হতেন নির্ভীক ও সাহসী, তাঁর আচরণ হত মার্জিত, তিনি সাধারণত ঠাট্টা-পরিহাস থেকে বিরত থাকতেন, সৎ-জনের সঙ্গ ভালবাসতেন। তিনি সত্যবাদী ও স্পষ্ট বক্তা হতেন, প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় ও গোপন কথা রক্ষায় থাকতেন যত্নবান। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক যেমন পছন্দ করতেন, তেমনি জীর্ণ ময়লা কাপড়, পরিহার করতেন। তিনি খাওয়ার টেবিলে অল্প অল্প আহার মুখে তোলেন, অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হলেও গোগ্রাসে গেলেন না, অল্প কথা বলেন, অল্প হাসেন, খাবার ধীরে ধীরে চিবান, রসুন বা পেঁয়াজ পরিহার করেন, সর্বসাধারণ্যে দন্তকীলক ব্যবহার পরিহার করেন। এই সমস্ত গুণাবলী যাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যেত আব্বাসীয় আমলে তাঁকে ভদ্রলোক বলা হত।

আসবাবপত্র: আব্বাসীয় যুগে প্রথম দিওয়ান বা সোফার প্রচলন দেখা যায়। এই সোফা ঘরের তিনদিকে স্থাপিত থাকত। উমাইয়া যুগে বসার জন্য চেয়ারের প্রচলন ছিল। কিন্তু চতুষ্কোণ গদি মেঝের ওপর রেখে তার ওপর বসাটাই বেশি জনপ্রিয় ছিল। ঘরের মেঝে কার্পেটে ঢাকা থাকত। দিওয়ান বা গদির সম্মুখে ছোট টেবিল রেখে তার ওপর পিতলের তৈরি বড় বড় গোল ট্রেতে খাবার দেওয়া হত। ধনীর গৃহে কোথাও কোথাও রুপার ট্রে তৈরি থাকত, টেবিলগুলি সাধারণত আবলুস কাঠে তৈরি হত। এবং ঝিনুক বা কচ্ছপের খোল খচিত করে ঐগুলিকে সুসজ্জিত করা হত।

পোশাক: আব্বাসীয় যুগে পুরুষদের পোশাক ছিল পাজামা, আলখাল্লা ধরনের বহিরাবরণ, জামা, ফতুয়া, জ্যাকেট, কালো টুপি প্রভৃতি। খলিফা হারুণ রশিদের আমলে বিচারপতি আবু ইউসুফের নির্দেশক্রমে ধর্মবেত্তাগণকে কালো রঙের পাগড়ি ও ঢিলা জামা পরতে হত। আজও মুসলিম সমাজের আলেমগণ সাধারণত ঢিলা লম্বা জামা পরে থাকেন। রাজপরিবার ব্যতীতও সাধারণ মানুষও জাঁকজমক পোশাক ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। নগরবাসীরা ঢিলা পাজামা, লাল জুতা, বিরাট পাগড়ি ইত্যাদি পরতেন। বেদুইনগণ ঢিলা লম্বা জামা ও মাথায় রুমাল বাঁধতে ভালবাসত। অভিজাত শ্রেণী রেশমী আচ্ছাদন পরিধান করে তরবারি ও বর্শা নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে যাতায়াত করত। পর্দানসীন মহিলাগণ সাধারণত রাস্তায় বের হতেন না। তাঁরা ঢিলা পাজামা, কামিজ ও ওড়না ব্যবহার করতেন। আল-নয়াইরী বলেন—"খলিফা আল-মাহদির কন্যা আল-উলাইয়া মহিলাদের জন্য একটি রত্নখচিত মুখাবরণ ও শিরাবরণের প্রচলন করেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে নারী সমাজে তা খুবই সমাদৃত হয়।

ভোগ-বিলাস: খেলাফায়ে রাশেদীনের সময় খলিফাগণ মহানবীর ও ইসলামের কঠোর অনুসারী ছিলেন। কিন্তু উমাইয়া খেলাফতে অনৈসলামিক কার্যকলাপের

সূচনা হয়ে প্রথম ইয়েজিদের সময় তা চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে। উমাইয়া খেলাফতের দ্বিতীয় খলিফা মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়েজিদ এত বেশি মদ্যপান করতেন যে তাঁকে আল-খুম্মার উপাধি দেওয়া হয়। উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় যুগেরই কতিপয় খলিফা ব্যতীত সকলেই কমবেশি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। তা উচ্চ স্তরের সমাজেও প্রচলিত ছিল। খলিফা, উজির, নাজির, উচ্চপদস্থ কর্মচারী সকলেই মদ্যপান করতেন। সঙ্গীতের জলসায়, নাচ-গানের আসরে মদ্যপান বহুল প্রচলিত ছিল। এই সকল জলসায় খলিফাগণের বিশেষ সহচর থাকত. যাদের নাদিম বলা হত। কবিরা এই আমলে মদ্যপান সম্পর্কিত খামরীয়াৎ রচনা করতেন। অধিকাংশ খলিফাই ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করার জন্য অধিক সময় অতিবাহিত করতেন। এই ভোগ-বিলাসকে চরিতার্থ করার জন্য তাঁরা গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় নিমগ্ন থাকতেন। আবার শিকার, ঘোড়-দৌড়, পাশা প্রভৃতি খেলাতেও মগ্ন থাকতেন।

রুচিসম্মত ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ, বিলাসব্যসনেও আব্বাসীয়গণ প্রসিদ্ধি অর্জন.করেন। ঐতিহাসিক তাবারী হতে জানা যায় খলিফা মামুনের সহিত মন্ত্রী তনয়া বুরানের বিবাহ উৎসব একটা অনন্যসাধারণ অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছিল। আরব্য-উপন্যাস খ্যাত বাগদাদ নগরী তৎকালীন বিশ্বে ছিল অতুলনীয়া। খলিফা হারুণ রশিদের বেগম জুবাইদা স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত তৈজস-পত্র এবং রত্নখচিত জুতা ব্যবহার করতেন। খলিফা আমিন ইব্রাহিমের সঙ্গীতে মোহিত হয়ে তাঁকে এককালীন ৩,০০,০০০ দিনার উপহার দেন। তিনি সমুদ্র ভ্রমণের জন্য কতিপয় বজরাও তৈরি করেন, প্রতিটির নির্মাণ খরচ পড়ে—৩,০০০,০০০ দিরহাম।

দুর্ভাগ্যের বিষয় উমাইয়া খেলাফতের পতনে খেলাফতের পট পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু খলিফাদের চরিত্রের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। যে কারণে উমাইয়া খেলাফত লোপ পেয়েছিল, ঠিক সেই একই কারণে আব্বাসীয় খেলাফতও বিলুপ্ত হল। আব্বাসীয় খেলাফতে উমাইয়া যুগের মদ্যপান অব্যাহত ছিল। খলিফাগণ দরবারে বা হেরেমে যে মদ্যপান করতেন, তা খামীর অর্থাৎ খেজুরের রস হতে প্রস্তুত হত। ইবন খালদুন বলেন—"খলিফা হারুণ ও মামুন আঙুর হতে প্রস্তুত নাবিদ পান করতেন। মদ্য পরিবেশন করত মহিলা পরিচারিকাবৃন্দ, তৎসঙ্গে মদের সহচর নৃত্য পরিবেশন করত নর্তকীগণ। কিতাবুল আগানি হতে জানা যায় যে, খলিফা আল-আমিনের দরবারে সমস্ত রাত্রিব্যাপী একটি ব্যালে নৃত্য পরিবেশিত হত। খলিফা স্বয়ং এই নৃত্য পরিচালনা করতেন। উমাইয়া খেলাফতের প্রথম দ্বিতীয় ইয়েজিদের মতো আব্বাসীয় খলিফা আল-আমিন সর্বদা মহিলা গায়িকা ও পরিচারিকাবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। আল-মামুনের দরবারেও গ্রীক নতর্কীগণ নৃত্য পরিবেশন করত। আব্বাসীয়দের দরবারেও গ্রীক, বার্বার,

আর্মেনীয়, নিগ্রো ও তুর্কী দাস নিয়োজিত থাকত। এরা সকলেই ছিল নপুংসক, এদের গিলমান বলা হত। দরবারে দাসী বলতে থাকত—নর্তকী, গায়িকা, অথবা উপপত্নী। হারুণের দরবারে তাউয়াদুদ নামে একজন বিদুষী দাসী ছিলেন। তাঁকে ১০০,০০০ দিনারে ক্রয় করা হয়েছিল। তিনি আইনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শন, সঙ্গীত, অঙ্ক, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করে একজন মহীয়সী মহিলার পরিচয় দিয়ে যান। কিন্তু অতীব দুর্ভাগ্যবশত আব্বাসীয় দরবারে দাস-দাসী ও উপপত্নীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। খলিফা আল-মুকতাদিরের (৯০৮-৩২ খ্রীঃ) দরবারে ১১,০০০ গ্রীক ও সুদানী দাস ছিল। তেমনি আল-মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৬১ খ্রীঃ) দরবারে ৪০০০ দাসী বা উপপত্নীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই উপপত্নী প্রথা আব্বাসীয় খলিফাদের নৈতিক চরিত্রকে শুধু কলুষিতই করল না, বরং তাঁদের নৈতিকশক্তিকে একেবারেই শেষ করে দিল, যে নৈতিক বলে বলিয়ান হয়ে একদিন নিঃস্ব আরব বিশ্বকে জয় করেছিল। এই বিলাসব্যসনই আব্বাসীয়দের পতনের ছিল অন্যতম প্রধান কারণ।

হাম্মামখানা বা স্নানাগারঃ ইসলামের প্রবর্তক মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে অত্যধিক পছন্দ করতেন। তাই মানবদেহের এই পরিচ্ছন্নতাকে ইসলামধর্মের অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মধ্য ইউরোপে স্নানকে যখন ঘৃণার চোখে দেখা হত, তখন ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করায় মুসলিম সমাজে হাম্মামের প্রচলন খুব বেশি দেখা দিল। সমগ্র আরব দেশে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য স্নানাগারও বহু দেখা দিল। কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যই নয়, মহিলাদের জন্যও পৃথক পৃথক স্নানাগারের ব্যবস্থা ছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক খতীবের মতে, খলিফা আল-মুকতাদিরের খেলাফতে (৯০৮-৩২ খ্রীঃ) বাগদাদে ২৭০০ সাধারণের ব্যবহারোপযোগী স্নানাগার ছিল, ঐ একই ঐতিহাসিক অন্য সময়ের সংখ্যা বলেন—৬০,০০০ পর্যন্ত। এই সংখ্যা হতে সে যুগের হাম্মামের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বেশ একটা ধারণা পোষণ করা যায়। এই সমস্ত হাম্মামখানাগুলির মেঝে মোজাইক করা এবং অভ্যন্তরীণ দেওয়াল মার্বেল পাথরে মোড়া ছিল। অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠটি সাধারণত গম্বুজে ঢাকা থাকত এবং ঐ গম্বুজের রঙিন কাঁচ বা পাথরের মধ্য দিয়ে ঘরে আলো প্রবেশ করতে পারত। শীতকালে ঐ ঘরটিকে উত্তপ্ত পানির বাষ্পের সাহায্যে গরম করাও যেত। কোন কোন হাম্মামখানায় গরম ও ঠাণ্ডা উভয় রকম পানিরই ব্যবস্থা থাকত।

শিকার ও খেলাধুলাঃ শিকার ও খেলাধুলা উমাইয়া যুগে যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, আব্বাসীয় যুগেও তেমনি ছিল। খলিফা ও শাহজাদাগণের নিকট মৃগয়া অত্যন্ত প্রিয় ছিল। খলিফা আমীন সিংহ শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। খলিফা মুতাসিমের নিকট চিতার সাহায্যে শিকার করা প্রিয়

ছিল। পারস্যের প্রাচীন প্রথা ছিল বাজপাখি বা অন্য কোন পোষা পাখির সাহায্যে শিকার করা। এই পুরাতন পারসিক প্রথা আব্বাসীয়দের মধ্যেও বহুল প্রচলিত হয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত বাজপাখির সাহায্যে হরিণ, খরগোস, বুনোহাঁস প্রভৃতি শিকার করা হত। বড় শিকারের জন্য বাজপাখির সাহায্যে ও পোষা কুকুরের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। শিকারযাত্রীরা সময় সময় কোন বিশেষ স্থানে বৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করে শিকার করত। একে 'হালকা' বলা হত। খলিফা মুতাসিম দজলা নদীর তীরে ঘোড়ার নালের আকারে দেওয়াল তৈরি করে শিকার ধরার জন্য ফাঁদ রচনা করতেন। অন্যান্য ক্রীড়ার মধ্যে ছিল—তীর-ধনু, পোলো, বর্শা ও ঘোড়দৌড় ইত্যাদি। এই বহির-দ্বার ক্রীড়া ব্যতীতও কিছু গৃহাভ্যন্তরীণ খেলাও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, যেমন—দাবা ও পাশা খেলা। খলিফা হারুণ সর্বপ্রথম দাবা খেলার প্রবর্তন করেন। দাবা (শতরঞ্জ) মূলত একটা ভারতীয় খেলা। অভিজাত মহলে পাশার পরিবর্তে দাবা খেলা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। খলিফা হারুণ রোম সম্রাট শার্লেমেনের নিকট যে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তন্মধ্যে একটি দাবার বোর্ডও ছিল।

আব্বাসীয় যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

সূচনা ঃ ইসলামধর্ম মূলত সমাজভিত্তিক, আবার উন্নত সামাজিক জীবন-যাপনের জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানভিত্তিক। কেননা ইসলাম নিছক একটা ধর্মই শুধু নয়, তা জীবনব্যবস্থা। সত্য ও সুন্দরের পথে সমুন্নত জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে গিয়ে ইসলামধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক স্বয়ং মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ) শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যতীত ধর্মকে বিশেষ কোন মর্যাদাই দেননি। তাই তিনি তাঁর উম্মতদের (শিষ্য) মধ্যে ঘোষণা করেছিলেন—"অশিক্ষিত ব্যক্তির এবাদত বা উপাসনা অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তির নিদ্রা উত্তম।" জ্ঞানার্জনের পথে এইভাবে তিনি শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে অপরিমিত ভাবেই ভালবাসতেন। তিনি আরো বলেন—"শহীদের রক্ত অপেক্ষা জ্ঞানীর কলমের কালির মূল্য অনেক বেশি।" মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং শিক্ষালয় আমার ঘর। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তার অনুগামী মুসলমানদের জন্য ঘোষণা করেছিলেন—"প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য শিক্ষা ফরজ", অর্থাৎ জ্ঞানার্জন অতি অবশ্যই কর্তব্য। শিক্ষা সম্পর্কে এখানে আমরা পেলাম ইসলামের দূতের বাণী ও অভিমত।

অতঃপর আমরা লক্ষ্য করতে পারি ইসলামের আল্লাহ্ শিক্ষা সম্পর্কে কি বলেন বা মানবমণ্ডলীকে কি বোঝাতে চান। আল্লাহর বাণী পবিত্র কোরআন বলে—"আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আলো।" ২৪ঃ৩৫। মহানবীর বাণী হাদিস বলে—"জ্ঞানই আলো।" সুতরাং মহানবীর দৃষ্টিতে যে 'জ্ঞান' লাভ করেছে, সে 'আলো' লাভ করেছে। এবং যে ব্যক্তি আলো লাভ করেছে, সে যেন

আল্লাহকে লাভ করেছে। অতএব সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামধর্ম শিক্ষা ও জ্ঞান-ভিত্তিক।

পবিত্র কোরআন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে বিশ্ব-প্রতিপালকের নিকট জ্ঞান-লাভের জন্য শিক্ষা দিচ্ছে—

"হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।"
মাগিছি কাতর প্রাণে করুণা তোমার
বৃদ্ধি কর বিদ্যাবল হে প্রভু আমার। ২০ : ১১৪

মহানবী (দঃ) নিজেই আকুলভাবে প্রার্থনা করতেন জ্ঞানের জন্য :

তোমার কামনা যেটি বলেছে কোরআন—
ধন নয়, জন নয় দাও মোরে জ্ঞান।
বুকেতে বাসনা আর ধমনীতে ধ্যান—
"হে বিশ্বপালক মম বৃদ্ধি কর জ্ঞান।"
করেছ ধৈর্যের সাথে অন্তহীন ধ্যান
পেয়েছো নিখিল জুড়ি আদি-অন্ত জ্ঞান।

ইসলামধর্মের মূল লক্ষ্য : মহানবীর ইসলামধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে প্রধানত আমরা দুটো প্রধান জিনিস লক্ষ্য করি—একটি মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ ও অন্যটি ঐ মানুষের মানবতার সাবলীল চূড়ান্ত প্রকাশ। এবং এই দুটোতেই শিক্ষার প্রয়োজন অতীব। তাই শিক্ষাকে অতীব গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁকে অতীব নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছিলেন তাঁর পরবর্তী যুগের খোলাফায়ে রাশেদীন—সৎপথে পরিচালিত খলিফাগণ। শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ একই পথ অনুসরণ করেছিলেন উমাইয়া যুগের খলিফাগণ এবং আব্বাসীয় যুগের খলিফাগণও শিক্ষাকে অতীব উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন।

শিক্ষার বৈশিষ্ট্য : উমাইয়া খেলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। মরুবাসী আরবগণ বিজিত অঞ্চলসমূহে গমন করে গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শ লাভ করে। ফলে আরবীয় খেলাফতের সময় পারসিয়ান, সিরিয়ান, মিশরীয়, আরবীয়, খ্রীস্টান, ইহুদি ও মুসলিম পণ্ডিতগণ জ্ঞানচর্চায় অপরিমিত উন্নতি সাধন করেন। স্বয়ং মহানবী হতে আব্বাসীয় খেলাফত পর্যন্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—মূলত জ্ঞানার্জন ও জীবিকার্জন। এই জ্ঞানার্জন ও জীবিকার্জনের দুটো প্রধান শাখায় ফুটে উঠেছিল অজস্র ফুল—সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা, অকৃত্রিমতা, কর্তব্যবোধ, উদারতা, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, অতিথিপরায়ণতা, পৌরুষ, সাহস, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও ধার্মিকতা ইত্যাদি।

শিক্ষকের মান ও শিক্ষার স্থান : প্রাথমিক শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের বলা হত 'মুয়াল্লিম'। নির্ধারিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী পরীক্ষা হত এবং

পরীক্ষার্থীদের সনদ বা সার্টিফিকেট দেওয়া হত। সে যুগে শিক্ষকদের মান ও মর্যাদা অত্যন্ত বেশি ছিল। সমাজে শিক্ষকগণ ছিলেন অতীব সম্মানের পাত্র। এমনকি রাজা-বাদশারাও শিক্ষককে যথাযথ মর্যাদা দিতে ভুল করতেন না। পিতা মাতার ঊর্ধ্বেও জ্ঞানের স্থান নিনীত হয়েছিল। এইভাবে শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষায়তনকে আব্বাসীয় যুগ মানবসমাজে অতি উচ্চাসন দান করেছিল। এটা ছিল ইসলামেরই শিক্ষা কেন ও কিভাবে দিতে হবে—ভাবী মানবসমাজের নির্মাতা—শিক্ষকের মন ও শিক্ষার স্থান। এই অপূর্ব মানসিকতার জন্যই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন হয়েছিল আব্বাসীয় যুগে, যার ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও অপূর্ব শিলান্যাস এবং অনন্যসাধারণ উৎকর্ষতা লাভ দেখা দিল এই যুগে।

প্রাথমিক শিক্ষা: কোরআনের বাণী পাঠ করা ও শিক্ষা করা মুসলমানদের ধর্মীয় কাজ। এই ধর্মীয় কর্তব্যকে পালন করতে গিয়েই মুসলমানদের প্রথম শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাই ইসলামধর্ম মুসলমানদের প্রথম শিক্ষার আলো দান করেছে। এই প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি ছিল মসজিদ। প্রাথমিক শিক্ষা ছিল মূলত ধর্মীয় শিক্ষা। কিন্তু লেখাপড়া আরম্ভ হত কোরআনের বাণী দ্বারা নয়, সরস কবিতা দ্বারা। তবে কবিতাগুলি ছিল ধর্মীয় ও নৈতিক। আজ হতে প্রায় শত বছর পূর্বে পারস্যের সিরাজ নগরে জন্ম নিয়েছিলেন মহাকবি সেখ সাদী। দূর অতীতের সেইদিন হতে পৃথিবীর এমন কোন মুসলিম অধ্যুষিত দেশ নেই। যার মক্তব ও মাদ্রাসাতে আজও মহাকবি সাদীর গোলেস্তা ও বোস্তা হতে কিছু পাঠ না করে দৈনন্দিন পাঠ্যসূচী আরম্ভ হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি কবির কাব্যচর্চা জগৎ কবির ইতিহাসে বড়ই দুর্লভ। প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য ছিল—আরবী ব্যাকরণ, মহানবীর জীবনী, অংক ও ধর্মীয় কবিতা এবং কোরআন পাঠ শিক্ষা ইত্যাদি।

উচ্চশিক্ষা বায়তুল-হিকমা:

নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়: আব্বাসীয় খলিফা হারুণ রশিদ শিক্ষার খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র খলিফা মামুন জ্ঞান-বিস্তারে ও জ্ঞানার্জনের জন্য বাগদাদে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ পাদপীঠ বায়তুল হিকমা ৮৩০ খ্রীঃ জ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাকে অসামান্য মর্যাদা দান করেন। খলিফা নিজেই ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ও প্রতিভাধর ব্যক্তি। ইসলামী আমলে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় রূপে দেখতে পাই বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে। ১০৬৫ খ্রীস্টাব্দে সেলজুকদের শাসনামলে মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী অসাধারণ জ্ঞানপিপাসু নিজামুল-মূলক এই বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করেন। এইদিক থেকে ইসলামী জগতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের গৌরব নিজাম-উল-মুলকেরই প্রাপ্য। এই বিরাট শিক্ষায়তনটিতে 'সাফী' ও 'আশয়ারী' মতবাদ সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হত। পাঠ্য তালিকার প্রধান বিষয় ছিল—কোরআন ও

প্রাচীন কবিতাচর্চা। কোরআনকে কেন্দ্র করে বহুমুখী পাঠ্যক্রম তৈরি হত। ছাত্র ও শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসবাস করার সুযোগ পেতেন। মেধাবী ছাত্রগণ আপন আপন মেধানুযায়ী বৃত্তি পেত। নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক ও একজন ছাত্র চির অমরত্ব লাভ করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ওমর খৈয়াম ও ইমাম আল-গাজ্জালি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছর অধ্যাপনা করেন, মহাকবি সাদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যশ খ্যাতি এত দূর ছড়িয়ে পড়ে যে পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়কে অনুসরণ করে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক ও জননীর স্থান লাভ করেছে।

মুস্তানসারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ঃ আব্বাসীয় যুগের অপর এক খলিফা আল-মুস্তানসির (১২২৬-১২৪২) ১২৩৪ খ্রীস্টাব্দে তার নামানুসারে বাগদাদে মুস্তানসারিয়া নামক অন্য একটি দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। সে যুগে সমগ্র একটি দেশেও দুটো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কি না গভীর সন্দেহের কথা, অথচ সেই সময়ে একটি শহরেই দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে আব্বাসীয় যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার অনুরাগ সম্পর্কে একটি স্থির ও সুনির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে। যা যে কোন প্রকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার দাবিদার। এই সুপ্রাচীন বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে যা জানা যায়, সে যুগেও এই বিশ্ব-বিদ্যালয়টিতে আধুনিক যুগের উপকরণগুলির উপস্থিতি দেখা যায়, যেমন পাঠাগার, আবাসগৃহ, স্নানাগার, পাক-ঘর, এমনকি হাসপাতাল পর্যন্তও। এর প্রবেশপথে একটি বিশালাকার ঘড়ি ছিল। সুবিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩২৭ খ্রীস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। বাগদাদে ধ্বংসাবশেষ আজও সে যুগের শিক্ষানুরাগীদের দূর স্মৃতি দর্শকের মনকে শ্রদ্ধাভরে আলোড়িত করে আন্দোলিত করে।

মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তনঃ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। প্রতিটি খলিফা মাদ্রাসা স্থাপন সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। বিশেষ করে নিজাম-উল-মুলক শিক্ষাব্যবস্থার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন। তিনি খোরাসান, সিরিয়া ও ইরাকে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে জুবাইর তাঁর গ্রন্থে বাগদাদে ৩০টি, দামেস্কে ২০টি, মসুলে ৬টি এবং হিমসে ১টি বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে ধনী-দরিদ্র, বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলেই পড়াশুনা করার সুযোগ পেত। ইসলামে নারী-শিক্ষার জন্য যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, সেকালে ইসলামের খলিফাগণ তার মর্যাদা রক্ষা করেন। শিক্ষকগণ অত্যন্ত স্বাধীনভাবে শিক্ষাকে পরিচালনা করতে পারতেন, সেখানে রাজা-বাদশাদের কোন রূপ হস্তক্ষেপ ছিল না।

মুক্ত বিদ্যালয়ঃ তদানীন্তনকালে কিছু মুক্ত বিদ্যালয়ও ছিল, যেখানে ছাত্র-ছাত্রী ব্যতীত ও বহিরাগতরাও শিক্ষকের বক্তৃতা শোনার জন্য অবাধে যোগদান করতে পারতেন। শিক্ষকদের অমূল্য বক্তৃতাগুলি যাতে ভবিষ্যতেও কাজে লাগে তার জন্য নিশাপুর মাদ্রাসায় ৫০০টি দোয়াতদানির ব্যবস্থাও ছিল। এই সমস্ত অগণিত শিক্ষালয়গুলি জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত। একাদশ শতাব্দীতে 'নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হওয়ার পর হতে শিক্ষাব্যবস্থা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হতে থাকে। এতদসত্ত্বেও জনসাধারণ মসজিদ সংলগ্ন মক্তবগুলিকে পরিচালনা করতেই থাকেন, বিগত শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রথা ভারতে পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থাগারঃ প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথেই গ্রন্থাগারের সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। প্রায় সকল মাদ্রাসাতেই বেশ কিছু গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকত। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই ছোট বড় গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হত। দশম শতাব্দীতে বুয়াইয়া সুলতান অজুদ-উদ-দৌলাহ সিরাজ নগরীতে যে বিরাট গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে সমস্ত গ্রন্থের একটি সুসংবদ্ধ তালিকার ইতিহাস পাওয়া যায়। বসরায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে বহু বৃত্তিধারী বা বেতনভুক কর্মচারী গবেষণার কাজ পরিচলনা করতেন। প্রখ্যাত ভৌগলিক ইয়াকুব মার্ভ ও খাওয়ারিজমের গ্রন্থাগার হতে তাঁর গ্রন্থের বহু উপাদান সংগ্রহ করেন। ভৌগলিক ইয়াকুব বলেন, বাগদাদের রাস্তার উভয় পার্শ্বে পুস্তকের দোকান ছিল। ঐ সময় মুসলমান সম্প্রদায় চর্ম নির্মিত কাগজ ও প্যাপিরাসের পরিবর্তে চীন দেশ থেকে কাগজ প্রচলন করেন। বার্মেকিদের সময় বাগদাদে কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পুস্তক ও গ্রন্থাগারের বহুল প্রচার আরম্ভ হয়।

সুতরাং আব্বাসীয় যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল যত সুসংহত তত সার্বজনীন। শিক্ষার এই ব্যাপকতা, উদারতা প্রসারতা ও সহনশীলতা সে যুগের উন্নতিকে করেছিল সমুন্নত। সে যুগের শিক্ষকগণ তাঁদের শিক্ষকতাকে, অধ্যাপকগণ তাঁদের অধ্যাপনাকে শুধু বৃত্তি হিসাবে বরণ করেননি, ব্রত হিসাবে পালন করেছিলেন। এইভাবে শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষকদের সততা, নিষ্ঠা, সাধনা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতা সকল কিছু একযোগে এক সাথে সৃষ্টি করল—'ইসলামের স্বর্ণ যুগ', যার মূলে ছিল আব্বাসীয় আমলের সুদূরপ্রসারী সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য

বাগদাদঃ যে কোন একটি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক পর্যালোচনা করতে গেলে যে কয়েকটি জিনিস প্রথম পর্যায়ে আসে তাদের মধ্যে ঐ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যতম। আব্বাসীয় খেলাফতে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সন্তোষজনক। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে মূলত সেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্যের ওপর। আব্বাসীয় খেলাফতে দেশেব এই তিনটি দিকই ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ, তাই দেশও সমৃদ্ধ এবং উৎকর্ষের চরম শিখরে উপনীত হয়। এই সময় মুসলিম সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে সুদূর সিন্ধু এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সন্তোষজনক অর্থনৈতিক অবস্থার স্বরূপটি যেন বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিল অনিন্দ্য সুন্দর শহর ও রাজধানী বাগদাদ নগরী। খলিফা আল-মনসুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ নগরী মদিনা-আল-সালাম অর্থাৎ শান্তি নগর নামে পরিচিত ছিল। তাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত প্রাচ্যের এই সুরম্য নগরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কুববাত আল-খাদরা অর্থাৎ সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি অতুলনীয় কারুকার্যখচিত প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ নগরী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যেন সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়, এবং তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শহরের মর্যাদা লাভ করে এবং তার খ্যাতি বিশ্বেব দরবারে ছড়িয়ে পড়ে। খলিফা মনসুরের বাগদাদ হারুণের সময় আরব্য উপন্যাসেব প্রসিদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। হিট্টি বলেন—"হারুণ-আর-রশিদের খেলাফতে বাগদাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করার জন্য ইতিহাস ও রূপ কথার সমন্বয় ঘটে।"

ব্যবসা-বাণিজ্য পাক ভারতঃ কয়েকটি জিনিস আব্বাসীয় যুগের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের পথকে প্রশস্ত করেছিল, যেমন— সাম্রাজ্যের প্রসারতা, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীব প্রয়োজনীয়তা, সে যুগের শান্তি পরিবেশ, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিপুল উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য, দূর-দূরান্তের রাজ্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সুসম্পর্ক ইত্যাদি। সে যুগে জল ও স্থলপথের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল—বাগদাদ, বসরা, সীরাক, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি। সুলাইমান আত্তাজিরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ হতে জানা যায়—পাক ভারত উপমহাদেশ ও চীন দেশের সঙ্গে আব্বাসীয় বণিকগণের সমুদ্রযাত্রা। পারস্যোপসাগরের সামুদ্রিক বন্দর সীরাক, বসরা ও

উবুল্লা হতে এবং আন্দান ও লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দরসমূহ হতে মুসলমান সওদাগরগণ সমুদ্রপথে পাক ভারত উপমহাদেশ সিংহল, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনদেশে যাতায়াত করত।

চীন : স্থলপথে সমরকন্দ ও চীনা তুর্কিস্তান হয়ে যে বাণিজ্যপথটি ছিল, তাকে 'বৃহৎ রেশম পথ' বলা হত। চীন দেশের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে রেশম ছিল প্রধান। এই জন্যই এই বাণিজ্যপথের নাম হয়েছিল 'রেশমপথ'। এই দীর্ঘ পথ একটি কাফেলা একটানা অতিক্রম করতে পারত না তাই কাফেলার অদল-বদল হত। চীন দেশ হতে আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির মধ্যে—রেশম, রেশমী বস্ত্র, তৈজসপত্র, কাগজ, কালি, স্বর্ণ রৌপ্যর পাত্র এবং দারুচিনি ছিল প্রধান। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে চীনদেশের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মুসলমান সওদাগরগণ খেজুর, চিনি, সুতী ও পশমী বস্ত্র, ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ও কাঁচের জিনিস তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাক ভারত উপমহাদেশ হতে চন্দন কাঠ, আবলুস কাঠ, নারিকেল, চিতা বাঘ ও বাঘের চামড়া, এমনকি হাতি ও চিতাবাঘও আমদানি হত।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া : সপ্তম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দীর তারিখ অঙ্কিত হাজার হাজার মুসলিম মুদ্রা পাওয়া গেছে স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলে বিশেষ করে সুইডেনে। এই মুদ্রাগুলি হতে মুসলিম বাণিজ্য বিস্তারের পরিধি পরিমাপ করা যায়। ভলগা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত মুদ্রা প্রাপ্তির কথা সে যুগের সাহিত্যে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, তা হতে একটি কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে মুসলিম সাম্রাজ্যের সাথে বাল্টিক অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য কত প্রসার লাভ করেছিল। এই সকল অঞ্চল হতে আরবগণ চামড়া, পশম এবং আম্বার (সুগন্ধি) প্রভৃতি আমদানি করত। বার্নার্ড লুইসের মতে—আরবগণ খুব সম্ভব স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চল পর্যন্ত যেত না, বরং এই সকল উত্তরাঞ্চলের লোকেরা রাশিয়ায় আরবদের সাথে মিলিত হত, এই কাজে আরবদের ও উত্তরাঞ্চলের স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থতা করত ভল্গা অঞ্চলের খাজার ও বুলগারগণ। আরবের এই বাণিজ্যসম্ভার ঐ অঞ্চলে বেশ কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল, যেমন সুইডেনের সর্বপ্রাচীন মুদ্রা আরবী দিরহামের ওজনে তৈরি হত এবং প্রাচীন আইসল্যান্ডের সাহিত্যেও বহু আরবী শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় ঐ সমস্ত বণিকগুলি শুধু মালবাহী জাহাজ স্বরূপ ছিলেন না, মুক্ত প্রাণে সংস্কৃতিরও লেনদেন করতেন। তাই উভয় দেশের লেনদেন ছিল সংস্কৃতিপ্রবণও।

ইউরোপ-আফ্রিকা : আফ্রিকার সাথেও আরবগণ স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত, এই অঞ্চল হতে তারা স্বর্ণ ও ক্রীতদাস-দাসী আমদানি করত। পশ্চিম ইউরোপের সহিতও আরবগণের অবাধ বাণিজ্য চলত। এই ব্যবসায়ে ভল্গা অঞ্চলের খাজার ও বুলগারগণের মতো ইহুদিগণ মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করত। এই সকল

ইহুদিগণ ভাষা সাহিত্যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়ও দিয়েছিল। তাদেরকে ভাষাবিদ বললেও ভুল হবে না। কেননা তারা প্রত্যেকেই আরবী, ফারসী, গ্রীক, ফ্রাংক, স্পেনীয় ও স্লাভ ভাষা জানত। এরা জল ও স্থলপথে পূর্ব হতে পশ্চিমে এবং পশ্চিম হতে পূর্বে যাতায়াত করত। পাশ্চাত্য হতে তারা খোজা ক্রীতদাস-দাসী, ব্রাকেড, পশম, তরবারি প্রভৃতি আমদানি করত। তারা পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে জাহাজে মিশরের ফারামা নামক স্থানে অবতরণ করে উষ্ট্রযোগে লোহিত সাগর পর্যন্ত যেত, আবার সেখান হতে আরব জাহাজযোগে সিন্ধু, দক্ষিণ ভারত ও চীনদেশে যাতায়াত করত। অন্য দল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এশিয়াকে অবতরণ করে স্থলপথে জাবিয়া নামক স্থানে গমন করে সেখান হতে বাগদাদ, উবুল্লা হয়ে ওমান, সিন্ধু, দক্ষিণ ভারত ও চীনদেশে চলে যেত।

ব্যাঙ্কব্যবসা : ব্যবসা-বাণিজ্যের চরম উন্নতির ফলে নবম শতাব্দীতে আরবদের মধ্যে ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রৌপ্যমুদ্রা দিরহাম এবং স্বর্ণমুদ্রা দিনারের মধ্যে আনুপাতিক মূল্যের তারতম্য হওয়ায় এক শ্রেণীর মুদ্রা বিনিময়কারীর উদ্ভব হয়, যাদেরকে সাররাফ বলা হত। নবম শতাব্দীতে এরাই ব্যাপকভাবে ব্যাংকের ভূমিকা পালন করতে থাকে। বড় বড় ব্যবসায়ীগণ তাদের মূলধন এখানে জমা রাখত। এই সময়ে বাগদাদে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় অফিস ও অন্যান্য শহরে শাখা অফিস গড়ে ওঠে। এই সকল ব্যাংক হতে চেক ও ক্রেডিটপত্র দেওয়া হত। সে যুগের এই ব্যাংকব্যবস্থা এত সুচারুরূপে গড়ে উঠেছিল যে, ব্যবসায়ীগণ বাগদাদের চেক সুদূর মরক্কোতে ভাঙাতে পারতেন। বসরাতেও ব্যাংকব্যবস্থা অত্যন্ত প্রসার লাভ করে, যার ফলে সওদাগরগণ প্রত্যেকেই ব্যাংকে হিসাব খুলতেন এবং বাজারে চেকের সাহায্যে লেনদেন করতেন। কখনও নগদ টাকার সাহায্যে লেনদেন করতেন না। দশম শতাব্দীতে আমরা বাগদাদে সরকারী ব্যাংকের কথা জানতে পারি। মুসলমানদের মধ্যে সুদ দেওয়া-নেওয়া হারাম বা অবৈধ বিবেচিত হওয়ায় এই সকল ব্যাংকের পরিচালকগণ প্রায় সকলেই ছিলেন ইহুদি ও খ্রীস্টান।

সওদাগরগণ : সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই যে সমাজে যা কিছু ঘটতে থাকে তার কিছু কিছু সাহিত্যে স্থান পেতে থাকে। এইদিক থেকে আব্বাসীয় আমলের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে প্রবল গতিধারা সমাজে বইতে থাকল, তার কিছু কিছু তৎকালীন সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হল। তাই এই যুগের সাহিত্য হতেও আমরা সে যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু খবরাখবর পেতে পারি। ধার্মিক-বণিক-ব্যবসিক শ্রেণীর মানুষদের আব্বাসীয় আমলের জনগণ ইরানী ভাষায় 'সওদাগর' বলত। সমাজে সওদাগরগণের স্থান ছিল বহু উচ্চে। আমরা উমাইয়া যুগে আরব-অভিজাত শ্রেণীর মানুষ লক্ষ্য করেছি। আব্বাসীয় যুগে তার পরিবর্তনও লক্ষ্য করলাম। উমাইয়া যুগের আরব-অভিজাত শ্রেণীকে আব্বাসীয় যুগে আমরা সওদাগর (বণিক) ও শিক্ষিত—এই দুই শ্রেণীতে পেলাম।

উমাইয়া যুগের সাথে আব্বাসীয় যুগের মানুষের এই শ্রেণীগত পার্থক্যের মূলেও আছে বিধিসঙ্গত কারণ। উমাইয়া যুগ ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ও প্রবর্তনের যুগ এবং আব্বাসীয়া যুগ ছিল প্রধানত পরিকল্পনার ও প্রযোজনার যুগ। তাই ব্যবসা ছিল তাদের পরিকল্পনা ও প্রযোজনার ফসল। এই পরিকল্পনা ও প্রযোজনার যুগে আব্বাসীয়গণ মহানবীর বাণী হতে ব্যবসা সম্পর্কে কম অনুপ্রেরণা পাননি। মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) বলেন—"তোমরা ব্যবসা কর, কেননা পৃথিবীর সমগ্র লভ্যাংশের অর্থাগমের দশ অংশের নয় অংশ ব্যবসায়ে নিহিত আছে।" মহানবীর এই বাণী ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামের সুফী সম্প্রদায়কেও কম প্রভাবান্বিত করেনি। সুফীদের মধ্যেও দুটি শ্রেণী দেখা দিল—(১) ফকির সুফী অর্থাৎ গৃহ বা সংসারত্যাগী সুফী, (২) এবং দরবেশ সুফী অর্থাৎ সংসারী সুফী। এই দরবেশ সুফীগণই তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন এবং তাঁরাই ইসলাম প্রচারে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ও কৃতকার্য হয়েছিলেন।

দরবেশগণঃ এই সমস্ত দরবেশগণকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সওদাগর' বলা হত। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও উন্নত চরিত্রের মানুষ। তাঁরা আপন আপন ব্যবসায়ে ছিলেন সৎ, আবার মানুষের সেবায় ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। মানুষকে আপন করতে তাঁদের আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতা মানুষ মাত্রকেই মুগ্ধ করেছিল। তাই ইসলাম প্রচারে তাঁদের উন্নত চরিত্রই ছিল প্রথম উত্তম মাধ্যমিক যন্ত্র। তাঁরা ছিলেন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষেরই অতীব শ্রদ্ধার পাত্র। পৃথিবীজুড়ে মানুষ দলে দলে প্রথম ইসলামে আকৃষ্ট হয়নি, প্রথম অনুরক্ত হয়েছিল দুর্গত মানুষের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের ঐ দরবেশগণের অতি উন্নত চরিত্রের প্রতি ও তাঁদের সংবেদনশীল সামাজিক কার্যকলাপের প্রতি এবং পরে আকৃষ্ট হল ইসলামের প্রতি এবং দীক্ষিত হল ইসলামে। এই সমস্ত কিছুর মূলে ছিল দরবেশগণের উন্নত চরিত্র, মানবতা ও মহানুভবতা।

ব্যবসা-বাণিজ্য সে যুগের বণিকগণকে কতখানি ধনশালী করেছিল, দু-একটি দৃষ্টান্ত হতে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাগদাদে খলিফা আল-মুকতাদিরের (৯০৮-৩২ খ্রীঃ) আমলে ইবনুল জাসসাস নামক এক জহুরীর ১৬,০০০,০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরও তাঁর বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। বসরার বিখ্যাত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কয়েকজনের বাৎসরিক আয়কর ছিল—১০,০০,০০০ দিরহাম। সে যুগের কোন এক মিল মালিক দৈনিক গরিবদের জন্য একশ' দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করতেন। ওখানকার একটি সম্ভ্রান্ত অঞ্চলের নাম ছিল সিরাফ। এই সিরাফ অঞ্চলে সওদাগরগণ বাড়ি তৈরি করতেন। এই বাড়ি তৈরি করতে কারো ১০,০০০, কারো ৩০,০০০, কারো বা ৪০,০০,০০০ দিনার খরচ হয়েছিল। সিরাফের এই সমস্ত বণিকগণ সারা জীবন সমুদ্রপথেই

কাটাতেন। এদের বাড়ি তৈরির ব্যয় হতে অনুমান করা যায় তাঁদের ব্যবসা কত উন্নত ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান উৎস :

আব্বাসীয় যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের এত ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নতি কোনদিনই সম্ভব হত না যদি না তাদের উৎসগুলির প্রাচুর্য না থাকত। ব্যবসা-বাণিজ্যের দুটো প্রধান উৎস ছিল—শিল্প ও কৃষি।

শিল্প : শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে—কাপড় বা ঐ জাতীয় এবং কাচ, কাগজ ও ধাতব দ্রব্য প্রধান ছিল।

কাপড় : অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বয়নশিল্পে সর্বাপেক্ষা বেশি মানুষ কাজ করত এবং এর উৎপাদনও সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। কাপড়ের মধ্যে কাটা কাপড়, জামা কাপড়, বুটিদার কাপড়, গৃহসজ্জার সামগ্রী, কুশন ও কার্পেট ইত্যাদি প্রধান ছিল। সুতী, সিল্ক ও পশমী সকল প্রকারের কাপড়ই প্রস্তুত হত। সুতা প্রথম পাক ভারত উপমহাদেশ হতে আমদানি হত। পরে পূর্ব পারস্য হতে আরম্ভ করে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম রাজ্যে তুলার চাষ-আবাদ হত।

সমগ্র দেশজুড়ে কাপড় তৈরি হত। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কয়েকটি স্থানে বিশেষ ধরনের কয়েকটি কাপড় প্রস্তুত হত। যেমন—মিশরের লিনেন কাপড় ছিল বিখ্যাত, বাইজান্টাইন ও সাসানীয় আমলে পারস্যের সিল্কের কাপড় বিখ্যাত ছিল। পরে পারস্যের সিল্কের কাপড় ইউরোপে 'টাফেটা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গুর্গাও ও সিস্তানেও সিল্কের কাপড়ই বেশি তৈরি হত। অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন স্থানের তৈরি বিশেষ বিশেষ কাপড় ঐসব স্থানের নামানুসারে পরিচিত হত। যেমন বাগদাদে তৈরি এক প্রকার জরিদার কাপড় বাগদাদের ঐ এলাকার নামানুসারে 'আত্তাবী' নামে অভিহিত হত। ঠিক অনুরূপ কাপড় স্পেনে তৈরি হয়ে সমগ্র ইউরোপে 'তাবী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কুফায় প্রস্তুত সিল্কের রুমাল এখনও 'কুফীয়া' নামে সমধিক পরিচিত। এই রুমাল মাথায় বাঁধা হয়। খুজিস্তানে এক প্রকার বুটিদার কাপড় প্রস্তুত হত, যা 'দামাস্ক' নামে পরিচিত ছিল। এই বুটিদার কাপড় প্রথম দামেস্কে প্রস্তুত হত, যার জন্য এর নামকরণ হয় দামাস্ক। মুসলিম-জাহানে বয়নশিল্পের মধ্যে জায়নামাজের বা মুসাল্লার (অর্থাৎ নামাজ বা প্রার্থনা করার আসন) খুবই সম্মান ছিল বা আছে। বুখারা জায়নামাজের জন্য বিখ্যাত ছিল।

কার্পেট : কার্পেট সর্বত্র তৈরি হত। কিন্তু তাবারিস্তান ও আর্মেনিয়ার কার্পেট সর্বোৎকৃষ্ট ছিল। ফারসের বিভিন্ন শহরে কয়েকটি বিখ্যাত কারখানায় কার্পেট, এমব্রয়ডারি ও দীবাজ (ব্রাকেড) প্রস্তুত হত। রাজা-বাদশাদের সম্মানিত পোশাক 'খিলাত'ও এই সকল কারখানাগুলিতে তৈরি হত, এই সমস্ত কাপড়গুলিকে সাধারণত তীরাজ বলা হত। তীরাজ কাপড়ে সুলতান বা খলিফাদের

নামও লিখিত থাকত। অনেক সময় বিশেষ ধরনের তীরাজ প্রস্তুতের জন্য সরকারী কারখানাও গড়ে উঠত। এই শ্রেণীর কাপড় একমাত্র শাসকগণই ব্যবহার করতেন, আবার বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে পদস্থ অফিসার ও সেনাপতিগণকেও উপহারও দেওয়া হত।

কাচ ঃ কাচশিল্প মুসলিম-জাহানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সিরিয়ার সিডন, টায়ার ও অন্যান্য শহরে প্রাচীন কাচশিল্প মুসলমানদের আমলে সূক্ষ্মতায় ও স্বচ্ছতায় বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ক্রুসেডের সময় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগাযোগের ফলে সিরিয়ার রঙিন কাচ ইউরোপে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। এই রঙিন কাচগুলি একদিন গির্জা সমূহের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে গির্জাগুলি অসামান্য শোভা বর্ধন করে। মুসলিম সমাজে কাচের প্রভাব এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে বাদশার দরবার হতে ফকিরের সমাধিক্ষেত্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। আবার ধনীর সৌধ হতে গরিবের মসজিদ পর্যন্তও অধিকার করেছিল। এক কথায় বলতে গেলে এমন কোন রাজপ্রাসাদ ও রাজদরবার ছিল না, এমন কোন ধনীর অট্টালিকা ছিল না, এমন কোন মসজিদ বা গির্জা ছিল না, যেখানে রঙিন কাচ ও কাচের ঝাড় শোভাবর্ধন করত না। পারস্যের কাশান অঞ্চলে কাচের রঙিন টালি নির্মিত হত বলে এই শিল্পকে 'কাশানী' নামেও অভিহিত করা হত। বহুকাল যাবৎ দামেস্ক শহর এই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিল। তাই কাচশিল্পে মুসলিম জাহানে সিরিয়ার স্থান ছিল সবার উচ্চে।

কাগজ ঃ মুসলিম সভ্যতার অন্যতম প্রধান অবদান কাগজের প্রচলন এবং এর ব্যাপক উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আব্বাসীয় আমলে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনদেশ হতে সমরকন্দে কাগজ আমদানি হয়। ৭৯৪-৯৫ খ্রীঃ বাগদাদে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। এবং সরকারী দলিল-দস্তাবেজে কাগজের প্রচলন দেখা যায়। অতঃপর মুসলিম-জাহানের সর্বত্র কাগজের কল স্থাপিত হয়। ৯০০ খ্রীঃ মিশরে, ১১০০ খ্রীঃ মরক্কোতে, ১১৫০ খ্রীঃ স্পেনে কাগজের কল স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইরাক, ইরানেও কাগজের কল প্রচলিত হয়। এই সমস্ত কাগজের কলগুলি হতে উন্নতমানের কাগজ এমনকি নানা প্রকারের রঙিন কাগজও প্রস্তুত হতে থাকে। সর্ব প্রাচীন কাগজের নিদর্শন হিসাবে পাওয়া যায় হল্যান্ডের বিখ্যাত লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ৮৬৬ খ্রীঃ হস্তলিখিত পুস্তক 'গরিবুল-হাদিস'। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আর একটি প্রাচীন পুস্তক একজন খ্রীস্টান লেখকের দ্বারা ৮৭৭ খ্রীঃ লিখিত হয়েছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাগজশিল্প মুসলিম-অধ্যুষিত স্পেন ও ইতালি হতে সমগ্র ইউরোপে প্রসার লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে কাগজ সর্বসাধারণের জ্ঞানার্জনের পথকে প্রশস্ত করে, মুসলিম-জগতে বিখ্যাত

কাগজ উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল—সমরকন্দ, বাগদাদ, দামেস্ক, ত্রিপোলি, কায়রো, ফেজ ও ভেলোসিয়া।

ধাতবশিল্প: মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাতুর খনি থাকায় ধাতব শিল্পও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। পূর্বাঞ্চলের প্রদেশ সমূহে বিশেষত হিন্দুকুশ অঞ্চলে রূপা পাওয়া যেত। নুবিয়া ও সুদান অঞ্চলে স্বর্ণখনি ছিল এবং ইস্পাহানের নিকট তামার খনি ছিল। এই তাম্রখনি হতে ৫০০০ দিরহাম সরকারী রাজস্ব পাওয়া যেত। পারস্য, মধ্য এশিয়া ও সিসিলিতে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ পাওয়া যেত। পারস্যোপসাগরের মুক্তা ছিল প্রসিদ্ধ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতেও বহু মূল্যবান প্রস্তর সংগৃহীত হত। হীরা, মুক্তা, মনি, জহর, চুনি, পান্না, নীলা রাজা-বাদশাদের বড়ই প্রিয় ছিল। যার ফলে জহুরির কদরও যেমন বাড়ে, এই শিল্পও তেমনি বিশেষ নৈপুণ্যতা অর্জন করে। এই সমস্ত মূল্যবান পাথরগুলি রাজা-বাদশাদের মাথার মুকুটে শোভাবর্ধন করত। ভারতের মুসলিম রাজা-বাদশাগণের ময়ূর সিংহাসন 'কোহিনূর' আজও সারা বিশ্বের বিস্ময়। খলিফা হারুণ রশিদ একটি চুনি ৪০,০০০ দিনার ব্যয়ে খরিদ করেন। খলিফা মুকতাফি এই সমস্ত মূল্যবান পাথরের এতই ভক্ত ছিলেন যে তাঁর ২০,০০০,০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) মূল্যের অলংকারাদি ছিল। সিরিয়ার ফুলদানি আজও জগদ্বিখ্যাত।

কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য, নহর বা খাল ব্যবস্থা: উমাইয়া যুগ হতে আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। ইরাকের ভূখণ্ড ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং এই উর্বর পলিমাটি যুক্ত অঞ্চলটিকে 'আল-সাওয়াদ' নামে অভিহিত করা হত। আব্বাসীয় রাজধানী বাগদাদ এই অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় অবস্থিত উর্বর মেসোপটেমিয়া অঞ্চল কৃষিকার্যের জন্য ছিল খুবই উপযোগী। প্রথমদিকে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি রাষ্ট্রের নিয়মিত আবেশ পথকে যথেষ্ট সুগম করেছিল। আব্বাসীয় খলিফাগণ দজলা-ফুরাত উপত্যকার নিম্ন অঞ্চলে কৃষির জন্য খুবই যত্নবান ছিলেন। খলিফাগণ এই এলাকার পুরাতন খালগুলির সংস্কার সাধন করে অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন খাল খনন করেন। খলিফা মনসুরের সময় সংশোধিত 'নহর-ই-ঈসা' নামে একটি খাল ফুরাত ও দজলা নদীকে আনবার ও বাগদাদের নিকট যুক্ত করেছে। অন্যান্য প্রধান খালগুলির মধ্যে—নহরে সরসর, নহরে মালিক, নহরে কুসা, নহরে সারা, নহরে দুজাইল ও নহরে সিলাহের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল নহর দজলা ও ফুরাত উপত্যকার নিম্ন অঞ্চল ভূমিকে স্বর্ণ-প্রসবিনী শস্য-শ্যামলা খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত করে।

কৃষিজাত দ্রব্য: ইরাকের প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল বার্লি, গম, ধান, খেজুর, তুলা ইত্যাদি। সাওয়াদের উর্বর এলাকায় নানা রকমের ফল ও শাক-সবজি উৎপন্ন হত। খোরাসানও কৃষির জন্য বিখ্যাত ছিল। বুখারা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল

উদ্যানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সমরকন্দ ও বুখারার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সুগদ উপত্যকার উদ্যানে—খেজুর, আপেল, পীচ, খুবানী, লেবু, কমলালেবু, ডুমুর, আঙুর, জলপাই, বাদাম, আনারস প্রভৃতি ফল এবং মুলো, শশা, বেগুন প্রভৃতি তরকারি এবং গোলাপ, রায়হান প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলও জন্মাত। খাওয়ার-রিজমে বড় বড় তরমুজ উৎপন্ন হত। ফার এবং আওরাজে আখের চাষ হত, পরবর্তীকালে সিরিয়াতেও আখ চাষের প্রচলন দেখা যায়। অতঃপর ক্রুসেড যুদ্ধে যোগদানকারীদের দ্বারা আখের চাষ ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। এই সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্যের দ্বারা দেশের মানুষ যেমন উপকৃত হয়েছিল, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমনিভাবে প্রসারতা লাভ করেছিল। এগুলি যেন একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক ছিল। একটির উন্নতি অন্যটির শ্রীবৃদ্ধির কারণ স্বরূপ ছিল।

ফুল ও ফুলের বাগান ঃ আব্বাসীয় আমলে ফুল ও ফুলের বাগান শুধু শৌখিন ধনী ব্যক্তিদের অঙ্গনই শোভিত করেনি, বরং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বড় বড় উদ্যানে বহু ফুলের চাষও করা হত। এই সকল ফুল হতে নানা সুগন্ধি ও নির্যাস তৈরি করা হত। এবং তা দেশ-বিদেশে রপ্তানিও করা হত। দামেস্ক, শিরাজ, জুর ও অন্যান্য কয়েকটি শহরে গোলাপ, পদ্ম ও অন্যান্য কিছু ফুল হতে বিশেষ নির্যাস ও সুগন্ধি তৈরি হত। ফারিসের জুর অঞ্চল লাল গোলাপি আতরের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই এলাকার গোলাপ পানি পূর্বে চীনদেশ এবং পশ্চিমে মাগরিব পর্যন্ত রপ্তানি হত। ফারসের ৩০,০০০ বোতল গোলাপের নির্যাস প্রতি বছর রাজস্বের সহিত খলিফার দরবারে প্রেরিত হত। সাবুরে বিশ্ববিখ্যাত দশ প্রকারের সুগন্ধি তেল প্রস্তুত হত।

এই যুগে কৃষির উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ বিভিন্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে বহুমূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়। ইবনে নাদিমের 'ফিহরিস্ত' তাদের অন্যতম।

আব্বাসীয় যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক ফিশার বলেন—"মধ্য প্রাচ্যের পণ্যদ্রব্যের মান ছিল অত্যন্ত উন্নত এবং তা এত মূল্যবান ছিল যে, ইউরোপের দেশসমূহও তাদের বিনিময়ে তেমন পণ্যদ্রব্য দিতে সক্ষম ছিল না।"

চতুর্থ অধ্যায়

আব্বাসীয় যুগের সাংস্কৃতিক গবেষণা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিল্পকলার উৎকর্ষতা

পটভূমিকা ঃ বিশ্ববিখ্যাত বহু বিদগ্ধজনের মতে, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের অবদান অপরিসীম ও চিরস্মরণীয়। ঐতিহাসিক গীবন তাঁর "Decline and fall of the Roman Empire" গ্রন্থে বলেন—"লণ্ডনের রাস্তা যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন কর্ডোভার রাজপথ আলোয় উদ্ভাসিত ছিল। ৭৩২ খ্রীস্টাব্দে টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় না হলে সম্ভবত সমগ্র ইউরোপে আরবী ভাষার চর্চা হত।" ড্রেপার, গিজো, ডেভেনপোর্ট, লেনপুল, মার্টিন, হিট্টি প্রমুখ পশ্চিম দেশীয় ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে মুসলিম অবদানের কথা উচ্ছ্বসিতভাবে স্বীকার করেন। মুসলিম জ্ঞানসাধনার সর্বাপেক্ষা বড় কথা এটি শুধু মহা এশিয়ার পূর্বসূরিদের জ্ঞানসাধনাকে ধ্বংসের হাত হতে সংরক্ষিতই করেনি, বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে বহু সৃজনশীল অসামান্য অবদান রেখে গেছে। এই কথারই সমর্থনে অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"আরব ভাষাভাষী লোকেরা অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সভ্যতার আলোকবর্তিকা হস্তে ধারণ করেছিলেন।" ভারত মনীষা এম. এন. রায় বলেন—"ইউরোপ ও আধুনিক জগতে রেনেসাঁর যে সন্তান জন্মলাভ করল, তার জন্মদাতা নিঃসন্দেহে মুসলমান।" সুতরাং অনুবাদের মাধ্যমে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার সংরক্ষণে ও মৌলিক গবেষণা এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা কৃতিত্বের অসামান্য ছাপ রেখে গেছেন। তাঁদের জ্ঞানসাধনা ব্যতীত পূর্বসূরি অ্যারিস্টটল, গ্যালন, প্ল্যাটো, ও টলেমির চিন্তাধারা হতে পৃথিবী বঞ্চিত হত, অপরদিকে সমগ্র ইউরোপ কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত। "জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণে মানব জাতির প্রধান কাজগুলি মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল-ফারাবি একজন মুসলমান ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবু কামিল এবং ইব্রাহিম ইবনে সিনাম মুসলমান ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ও বিশ্বকোষ প্রণেতা আল-মাসুদি একজন মুসলমান ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আত-তাবারিও একজন মুসলমান ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আর-রাজি, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ওমর খৈয়াম, সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ হাইয়ান, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণিতত্ত্ববিদ জাহিদ প্রমুখ সকলেই এক একজন মুসলমান ছিলেন।"—জর্জ মার্টিন। অতএব বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের তথা মুসলমানদের অবদান অসামান্য ও অনস্বীকার্য।

সূচনা ও স্বর্ণযুগ : উমাইয়া যুগকে যেমন রাজ্যের সম্প্রসারণের যুগ বলা হয়, সমুন্নতির আব্বাসীয় যুগকে তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির যুগ বলা হয়। আব্বাসীয় যুগে মুসলমানদের জ্ঞান-গরিমা, জ্ঞানানুশীলন, কৃষ্টি ও সভ্যতা বিশ্বসভ্যতার উন্নত শিখরে উপনীত হয়েছিল। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আব্বাসীয় খলিফাদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারতা এবং উৎকর্ষতা মানব সভ্যতার শীর্ষদেশে উন্নীত হয়েছিল। এই কারণেই এই যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়। আব্বাসীয়গণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সম্প্রসারণ নীতির স্থানে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্ঞানারোহণের নীতি অনুসরণ করে তাঁদের যুগকে জ্ঞানের যুগে পরিণত করেন।

অতীতের প্রতি বা বিগতদিনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের কোন রূপ বিকার বা বীতশ্রদ্ধা ছিল না। উদার ও অনুভূতিশীল মন নিয়ে অতি আন্তরিকতার সাথে রক্ষা করেছিলেন প্রাচীন সভ্যতার বিলুপ্তপ্রায় উপকরণগুলিকে। ইরাক, ইরান, মিশর ও গ্রীসেব প্রাচীন সভ্যতা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে কেবল তাঁরা রক্ষাই করেননি, বরং এদের পুনর্জাগরণে ছিলেন সজাগ, রেখেছিলেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-ভূগোল-চিকিৎসাশাস্ত্র শিল্প-স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে মুসলমান মনীষীগণ পরিচালনা করেন অপূর্ব গবেষণা ও রেখে যান বিশ্বসভ্যতায় জ্ঞান-গরিমার এক অনবদ্য অবদান।

জ্ঞান-জগতের দিগন্ত উন্মোচন : আব্বাসীয় যুগের এই জ্ঞানসাধনা নবীন পরিবেশে নতুন ভাবধারায় সঞ্চিত হয়ে অসংখ্য শাখাপল্লবে প্রসারিত হয়ে বিশ্বসভ্যতায় এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করে। আরবগণের জ্ঞান-পিপাসা, অনুসন্ধিৎসা ও অন্তরের উদারতা তাদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রকে করেছিল প্রস্তুত ও প্রশস্ত। যার ফলে প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান পাক ভারত উপমহাদেশ, ইরান, গ্রীস এবং হেলেনীয় সভ্যতা অধ্যুষিত সিরিয়া ও মিশর এই যুগের মুসলমানদের ভাবধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করায় বিশ্ব জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হল।

জ্ঞানসাধনার প্রথম শতাব্দী : প্রাথমিক পর্যায়ে আরবগণ প্রথম এক শতাব্দীকাল (৭৫০-৮৫০ খ্রীঃ) প্রাচীন সভ্যতার অমূল্য সম্পদ বিদেশী ভাষা হতে আপন আরবী ভাষায় অনুবাদ করে আরবী শিক্ষিত সমাজের নিকট তুলে ধরেন। পারসিক, সংস্কৃত, সিরীয় ও গ্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ এই সময় আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। আরবীতে রূপান্তর ঘটার পর এই বিজাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারটি আরবগণ লাভ করেন। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত,' ভারতীয় গণনা পদ্ধতি, ভারতীয় অংকশাস্ত্র, অ্যারিস্টটলের দর্শন, নিও প্লেটোনীয় ভাষ্যকারগণের রচনা, গ্যালেনের চিকিৎসাবিজ্ঞান, পারস্যের সুকুমার সাহিত্যের আরবী রূপ,

যেমন কালীলা ওয়া দিনাই ইত্যাদি প্রাথমিক যুগে আরব জ্ঞানচর্চার ও আরব মনীষীদের বহুমুখী প্রতিভার গোড়াপত্তন ও ভাবধারার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল।

আরবীয়গণ তাঁদের এক শতাব্দীর সাধনার ফল ক্রমাগত তিন শতাব্দীকাল (৮৫০-১১৫০ খ্রীঃ) পর্যন্ত অবলীলায় ভোগ করলেন। যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মুসলমানগণ কালজয়ী মৌলিক অবদান রেখে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু এখানে একটি কথা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, তর্জমা বা অনুবাদের যুগ শেষ হল না। বরং এই যুগ মৌলিক যুগের সাথে মিশে গেল। কেননা মুসলমানদের মৌলিক সৃষ্টির যুগে বহু অনুবাদক তাঁদের অনুবাদ দ্বারাই অক্ষয় কৃতিত্ব রেখে গেছেন। অনুবাদকদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা অনুবাদের মাধ্যমেই চরম সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে অনুবাদ তার আড়ষ্টতা ও নির্জীবতাকে অতিক্রম করে হয়েছে রসময়, প্রাঞ্জল এবং সৃজনশীলতায় ভরপুর।

অমর অনুবাদকগণ: আব্বাসীয় যুগে স্বয়ং খলিফাদের অনুপ্রেরণায় অগণিত অনুবাদক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই অনুবাদকগণের মধ্যে ছিলেন অনেক অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি, ক্ষণজন্মা পুরুষ। প্রথম যুগের অনুবাদকারীদের মধ্যে আবু ইয়াহিয়া ইবনুল বাত্রিক খলিফা মনসুরের জন্য গ্যালেন ও হিপোক্রিটীসের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেন। খলিফা হারুণ রশিদের পৃষ্ঠপোষকতায় সিরীয় খ্রীস্টান পণ্ডিত ইউহান্না বহু মূল্যবান ডাক্তারি বই তর্জমা করেন। গুণগ্রাহী খলিফা মামুনের সময় স্বনামধন্য নেস্টরীয় খ্রীস্টান হুনায়ন ইবন ইসহাক কনস্ট্যান্টিনোপল ও সিসিলি হতে সংগৃহীত বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আরবীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদকে সার্থক ও সফল করার জন্য খলিফা মামুন 'বাইতুল হিকমা' বা House of Wisdon নামে একটি অদ্বিতীয় জ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। খলিফা মুতাদিদের (৮৯২-৯০২ খ্রীঃ) সময় বিখ্যাত তারকা পূজারী (সাবীয়ান) সাবিত ইবন কুররা বহু গ্রীক গণিত ও জ্যোতিষ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এই সাবিতের অন্যান্য খ্যাতনামা বংশধরগণ যেমন সাবিতের পুত্র সিনান, পৌত্র সাবিত এবং ইব্রাহিম ও প্রপৌত্র আবুল ফারাজ একাধারে সার্থক অনুবাদক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইবন মাতার নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি ইউক্লিডের এলিমেণ্টস এবং টলেমির আল-মাজেস্ট অনুবাদ করে আজও অমর।

গ্রীক দর্শনের সংরক্ষণকারী: এই অনুবাদ যুগের সাফল্যের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ও জীবন্ত উপমা পাই যখন আমরা লক্ষ্য করি যে এই অনুবাদ যুগ শেষ হওয়ার পূর্বেই অ্যারিস্টটলের সমগ্র গ্রন্থাবলী অনুবাদের মাধ্যমে আরবদের নাগালের মধ্যে এসে পড়ে। আজও আরব লেখকগণ কমপক্ষে অ্যারিস্টটলের

একশ'টি গ্রন্থের উল্লেখ করে থাকেন। সব বইগুলি সমান কদরের না হলেও একটি কথা অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই যে, আরবগণই এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রীক দার্শনিকের লেখনীর ও চিন্তাধারার একমাত্রই সংরক্ষণকারী ছিলেন। সুতরাং একথা সর্বজনবিদিত যে কালগর্ভে লুপ্তপ্রায় গ্রীক দর্শনের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব একমাত্র আরব মুসলমানদেরই।

ইউরোপ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে : সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত, জ্ঞানের দীপ যখন নির্বাপিত, ঠিক সেই সময় জ্ঞানানুসন্ধানী এবং জ্ঞানের অনুশীলনে ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত আরবগণ জগতের সুপ্রাচীন ও অতি প্রবীণ গভীর জ্ঞানসমুদ্রে মন্থনরত, ঘন ঘোর অন্ধকারে আজকের আধুনিক ইউরোপ যখন ঘুমন্ত-শিশুবৎ, তখন আরব মনীষীগণ পৃথিবীর জ্ঞান-সমুদ্র হতে কতই না অমূল্য মণি-মুক্তা আহরণ করে বিশ্বসভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে রেখে যান অপরিমিত জ্ঞানভাণ্ডার ও অসামান্য অবদান। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হিট্টি একটি সুন্দর কথা বলেছেন—"যখন খলিফা হারুণ রশিদ ও মামুন গ্রীক ও পারসিক দর্শনের গভীর দেশে প্রবেশ লাভ করছিলেন, তখন পাশ্চাত্যে তাঁদের সমসাময়িক সম্রাট শার্লেমান ও তাঁর সভাসদগণ দস্তখত করবার কায়দা আয়ত্ত করছিলেন মাত্র।" গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে ইউরোপ তখন শুধু অজ্ঞই ছিল না, চিন্তাও করেনি। তাই ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত, আরব তখন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত।

ভাবধারার বাহন আরবী : এই দীর্ঘ সুফলপ্রসূ অনুবাদের পরবর্তী যুগটা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবদের মৌলিক অবদানের যুগ। দশম শতাব্দীর মধ্যেই বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দার্শনিক ভাবধারা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা বলে বিবেচিত হয় কোরআনের ভাষা আরবী। তখন আরবী আর শুধু আরবদের ভাষাই থাকল না। মুসলিম-জাহানের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রিয় ও পবিত্র ভাষাতে পরিণত হল—আরবী ভাষা। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টান, ইহুদি, পারসিক, তুর্কী, আফ্রিকান, বর্বর প্রভৃতি জাতির মানুষও সমভাবে সমান উৎসাহে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে ভরপুর ও সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু সকলেরই ভাবধারার বহিঃপ্রকাশের বাহন ও মাধ্যম ছিল আরবী। এইভাবে সেদিনের অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় জ্ঞানচর্চা বিশ্বসভাতে ও সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অসামান্য মৌলিক অবদান রেখে যায়, যেমন—দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য, ধর্মীয় বিদ্যা, শিল্পকলা ইত্যাদি।

দর্শন : যুক্তির মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়ার পথ ও পন্থাকেই বলা হয় দর্শন। আব্বাসীয় যুগে এই দর্শনচর্চা একটি নবদিগন্তের সূচনা করে। আরব বা ইসলামি দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলতে—মানব-মনীষীর প্রয়োগে

জড়জগতের সৃষ্টির প্রকৃত কারণ নির্ণয়। সে যুগে যাঁরা কেবলমাত্র দর্শনের চর্চা করতেন তাঁদের বলা হত ফাইলসুফ বা দার্শনিক। কিন্তু যাঁরা দর্শনকে ধর্মের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন তাঁদের বলা হত মুতাকাল্লীমীন বা তার্কিক।

ইসলামি দর্শন ঃ আরবী দর্শন মূলত কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক হলেও পরবর্তী অধ্যায়ে গ্রীক ও পারস্য দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। মুসলমানদের মতে, কোরআন এবং হাদিস সমস্ত ধর্মীয় আইনের সমষ্টি। যার জন্য তাঁরা এই দুটো হতে মৌলিক চিন্তার খোরাক পান। এবং ঐশ্বরিক ধর্মের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা তাঁদের মৌলিক চিন্তাকে প্রসারিত করেন। এই কারণে পরবর্তী অধ্যায়ে মুসলিম দার্শনিকগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম গোষ্ঠীতে আছেন—হজরত আলি (কঃ), আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, জাফর আস-সাদেক ইমাম আল-রাজি এবং ইমাম গাজ্জালি প্রমুখ। দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে আছেন—আরববাসী আল কিন্দি, তুর্কীবাসী আল-ফারাবি এবং পারস্যবাসী ইবনে সিনা ও ইবন রুশদ প্রমুখ।

দার্শনিক আল-কিন্দি ঃ আবু ইউসুফ ইবা ইসহাক আল-কিন্দি নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি জাতিতে আরব ছিলেন বলে তাঁকে আরবদের দার্শনিক নামে অভিহিত করা হত। তিনি অ্যারিস্টটল এবং প্লেটোর দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন এবং পিথাগোরাসের অংকশাস্ত্রকে সকল বিজ্ঞানের উৎস বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি কেবল দার্শনিকই ছিলেন না, সে যুগের অপরাপর মনীষাদের মত তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, রসায়নাবিদ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও বিরাট সঙ্গীত বিশারদ। তিনি বিশ্বের ৭০টি ভাষা জানতেন ও জীবনে ২৬৫টি গ্রন্থ রচনা করেন, যার অধিকাংশ আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

দর্শন সম্বন্ধে তাঁর রচনা ল্যাটিন অনুবাদে পাওয়া যায় থিওলোজিয়া নামক অ্যারিস্টটলের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় বলে বিবেচিত একটি নিও-প্লেটোনীয় ভাষ্যের অনুবাদের জন্য তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই পুস্তক পরবর্তী যুগের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই পুস্তকে তিনি আত্মা (রুহ) আল্লাহ্ এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। তাঁর মতে, আত্মা অতীন্দ্রিয় ও অবিনশ্বর। নশ্বর দেহ নষ্ট হয়ে গেলে আত্মা দেহ ত্যাগ করে আদিকরণে ফিরে যায়। আল্লাহ্ সর্ব বস্তুর আদিকরণ বা আদি রূপ। তাঁর গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালে রজার বেকনকেও প্রভাবান্বিত করে। তাঁর বহু গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলে কিছু কিছু এখনও সংরক্ষিত আছে। তিনি সঙ্গীতের ওপর ১২টি গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলমানগণ সঙ্গীতে ছন্দের ব্যবহার প্রচলন করেন পাশ্চাত্যে এটি প্রচলিত হওয়ার পূর্বেই।

এই অমর দার্শনিক সম্পর্কে অধ্যাপক হিট্টি বলেন—"ইসলামের সহিত গ্রীক

দর্শনের সমন্বয় সাধনের সূচনা হয় আরববাসী দার্শনিক আল-কিন্দি দ্বারা, যা সম্প্রসারিত হয় তুর্কীবাসী দার্শনিক আল-ফারাবি দ্বারা এবং যা সমাপ্তি লাভ করে পারস্য দার্শনিক ইবনে সিনা দ্বারা।"

দার্শনিক আল-ফারাবি : আল-ফারাবি তুরস্কের ট্রান্সক্সিয়ানায় জন্মগ্রহণ করে বাগদাদে শিক্ষালাভ করেন। পরে আলেপ্পোর সাইফুদ্দৌলাহর দরবারে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৯৫০ খ্রীঃ দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর বহু গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলামের সূফীবাদের সাথে অ্যারিস্টটল প্লেটোর ভাবধারা সামঞ্জস্য বিধানেরও চেষ্টা করেন। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য 'আদিকরণ'-এর মতবাদকে আপন যুক্তিতর্ক সহকারে প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মা, আত্মার গুণাবলী এবং বুদ্ধি (আকল) সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি যে শুধু গ্রীক দার্শনিকদের ভাষ্য রচনাই করেছিলেন তা নয়, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি ও আদিবিদ্যা সম্পর্কেও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আরবগণ অ্যারিস্টটলকে 'মুয়াল্লিম-উল-আওয়াল' প্রথম শিক্ষক বলে জানতেন এবং ফারাবিকে 'মুয়াল্লিম-উস-সানি' দ্বিতীয় শিক্ষক বলে অভিহিত করতেন।

রাজনৈতিক চিন্তাধারাতেও ফারাবির অবদান অসমান্য। তিনি 'আল-মাদিনাতুল ফাজিলা' ও 'আস-সিয়াসাতুল মাদানিয়া' নামক গ্রন্থদ্বয়ে আদর্শ শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ফর্মুলা নিয়ম প্রণয়ন করেন। তিনি বলেন, বুদ্ধিদীপ্ত ও আদর্শ চরিত্রবান রাষ্ট্রপ্রধান হবেন এই রাষ্ট্রের অন্তর। উজিরগণ হবেন এই রাষ্ট্রের চক্ষু ও কান, অন্যান্য বড় বড় কর্মকর্তাগণ হবেন হাত ও পা এবং জনসাধারণ হবেন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি। অন্তর-চোখ-কান এবং হাত-পা এদের প্রধান কর্তব্য হবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ও সমগ্র শরীরটা যাতে ভাল থাকে, সে দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখা। ইবনে খাল্লিকান বলেন—"দর্শনশাস্ত্রে আল-ফাবারির মতো অপর কোন মুসলিম সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হতে পারেননি।" পরবর্তী পর্যায়ে জগদ্বিখ্যাত ইবনে সিনা ও আল-ফারাবির দর্শন ও চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হন।

আল-ফারাবি চিকিৎসাবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র এবং সঙ্গীতবিদ্যাতে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন। সঙ্গীতের ওপর তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'কিতাব-উল-মুসিকি আল-কবির'। আল-ফারাবি সঙ্গীতে এমনি পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন যে বীণা বাজিয়ে শ্রোতাদের তিনি অট্টহাসিতে হাসাতে পারতেন, আবার অজস্র ধারায় কাঁদাতে পারতেন এবং গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করতেও পারতেন।

দার্শনিক ইবনে সিনা : দার্শনিক ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রীঃ) তাঁর দার্শনিক মতবাদের জন্য দার্শনিক ফারাবির নিকট ঋণী ছিলেন। পাশ্চাত্যে তিনি আবিসীনা (Aviceina) নামে পরিচিত। তাঁর জন্মভূমি বুখারা এবং

তিনি তাঁর সমগ্র জীবন মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলেই অতিবাহিত করেন। আরবগণ তাঁর অসামান্য প্রতিভার জন্য তাঁকে 'আশ-শাইখ-উর রাইস' (জ্ঞানীগণের নেতা) নামে অভিহিত করেন। তিনি সামানি সুলতান দুরারোগ্য রোগী নূহ ইবনে মনসুরকে আরোগ্য করে অশেষ খ্যাতি লাভ করেন এবং সুলতানের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হন। অতঃপর মুগ্ধ সুলতান ইবনে সিনাকে তাঁর জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য রাজকীয় গ্রন্থাগারের সমস্ত সুযোগ দান করেন। জ্ঞানজগতের প্রবাদপুরুষ ইবনে সিনা দর্শন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে ৯৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় মানবদেহে (অজানা অতি উচ্চমার্গ হতে) মানবাত্মার অবতরণ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দান করেছেন। আল-ফারাবির কঠিন ভাবধারাকে তিনি অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করেও কম খ্যাতি অর্জন করেননি। তাঁর চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ও তাঁর প্রকাশের সাবলীলতা তাঁকে পাশ্চাত্য জগতে খুবই জনপ্রিয় করে তোলে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুশ-শিফাকে একটি দার্শনিক বিশ্বকোষ বলা হয়ে থাকে। এই মহা গ্রন্থে গ্রীক ভাবধারা ও মুসলিম ধর্মতত্ত্বের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তাই তাঁকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকারীও বলা হয়। তিনি মহাজগতের ঐক্য, মানবাত্মার সাথে পরমাত্মার সম্পর্ক এবং মানুষের (আকলুল-কায়াল) সক্রিয় বুদ্ধি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি আত্মার অমরত্ব সম্পর্কেও অতি উচ্চস্তরের গবেষণা করে গেছেন। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার দূত বা নবুয়তের প্রয়োজনীয়তার ওপরও তাঁর অমূল্য মন্তব্য রেখে গেছেন। এক কথায় বলতে গেলে ইবনে সিনা ছিলেন জ্ঞান-জগতের একজন মহাসাধক ও সিদ্ধপুরুষ।

ইখওয়ান উস-সাফা: হিজরীর চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইখওয়ান-উস-সাফা নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, এঁরা কিছুটা পিথাগোরাসের মতবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এই দলটি গঠিত হয়েছিল শিয়া মতবাদের ছায়াতলে, তাঁদের মূলত কার্য ছিল মুক্ত মনে ও চিন্তার মুক্তিসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন করা। অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁদের 'রাসাইল' নামে একটি বিখ্যাত সংকলনও আছে। প্রথম জীবনে বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজ্জালিও পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞান:

চিকিৎসা জগতের পথিকৃত: আব্বাসীয় যুগে অন্যান্য উন্নতির সাথে চিকিৎসাশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। একদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের বহু মৌলিক রচনা ও অন্যদিকে গ্রীক গ্রন্থ হতে বহু অনুবাদের ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র

নবদিগন্তের সূচনা করে। অনুবাদকদের মধ্যেও অনেকেই বহু মূল্যবান মৌলিক রচনাও করেন। এই সমস্ত পণ্ডিতদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জুহান্না-বিন-মাসাওয়াহ, হুনায়েন বিন-ইসহাক। সে যুগের চিকিৎসকগণ শব-ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হওয়ায় বানরের দেহ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। অবশ্য চক্ষুরোগের ওপর গবেষণা অব্যাহত থাকে। ইবনে মাসাওয়াহ ও তাঁর শিষ্য হুনায়েন-বিন-ইসহাক চক্ষুশাস্ত্রের ওপর বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করে আধুনিক যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে যান। তাঁদের সফল সাধনা বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রের পূর্বতন বীজ রূপে না রয়ে গেলে আধুনিক যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রের এই অভূতপূর্ব সাফল্য এত সত্বর ধরা দিত কিনা, তা কে জানে। তাঁদের ওষুধপত্রের বিধান (Pharmacopia) আজও সর্বত্র সমধিক পরিচিত। মুসলমানগণ কোরআন ও হাদিস হতেও চিকিৎসাশাস্ত্রের অফুরন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করে অসামান্য কৃতকার্যতার সাথে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে যান অনাগতকালের চিকিৎসকদের অনুপ্রেরণা ও পাথেয় রূপে। জাবির বিন হাইয়ান, ইবনে সিনান, আত-তাবারি, আর-রাজি, আব্বাস, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, আল-বিন-ঈসা ও আল-মাজুসি প্রমুখ অমর চিকিৎসকগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে যে বীজ রোপণ করে যান, তা আজ চিকিৎসা জগতের মহীরুহ।

মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অনেকেই ছিলেন চিকিৎসা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অধিকাংশই ছিলেন পারস্যবাসী, এতদ্ব্যতীত ইহুদি ও খ্রীস্টানগণও চিকিৎসক হিসাবে কম সুখ্যাতি অর্জন করেননি। এই যুগের চিকিৎসকগণ অধিকাংশ একাধারে ছিলেন—ডাক্তার, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ভৌগোলিক, জ্যোতিষী প্রভৃতি। এক কথায় এঁরা ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাগ্রত মনীষা। তাই সমাজে ছিল তাঁদের প্রভূত সম্মান ও সমাদর। জনসাধারণ তাঁদের 'হাকিম' নামে অভিহিত করত। চিকিৎসকগণ প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছিলেন। খলিফা হারুণ-আর-রশিদ, মামুন ও বার্মেকিদের চিকিৎসক নেস্টোরিয়ান খ্রীস্টান জিব্রিল ইবন বখতীষু প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁরা পারিবারিক চিকিৎসা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই চিকিৎসক তাঁর জীবনে ৮,৮৮,০০,০০০ দিরহাম সঞ্চয় করেছিলেন। এই বখতীষু পরিবার সাত পুরুষ পর্যন্ত বহু প্রখ্যাত চিকিৎসকের জন্ম দেয়।

চিকিৎসা জগতের প্রবাদ পুরুষগণ ঃ

জাবির বিন হাইয়ান ঃ বিশ্ববিখ্যাত জাবির বিন হাইয়ান ছিলেন আরবী রসায়নশাস্ত্রের জনক। তিনি এই শাস্ত্রের ওপর অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বহু পূর্ব হতেই মুসলমানগণ ওষুধ প্রস্তুত করার পদ্ধতি জানত, পরে এই বিষয়ে

তাঁরা বহু পুস্তক প্রণয়ন করে ওষুধ প্রস্তুত প্রণালীকে একটি বিশেষ শাস্ত্রে পরিণত করেন। জাবির বিন হাইয়ান এই প্রস্তুতকারীদের পথিকৃত।

সিনান-বিন-সাবিত : ৯৩১ খ্রীস্টাব্দে খলিফা আল-মুকতাদির সময় কিছু কিছু হাতুড়ে ডাক্তারের দ্বারা জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলে খলিফা সিনান বিন সাবিত বিন কুররাহকে সমস্ত চিকিৎসকদের পেশাগত যোগ্যতা পরীক্ষার নির্দেশ দেন এবং এই পরীক্ষায় ৮৬০ জন মানুষ উত্তীর্ণ হন। সিনান সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যের গরিব পীড়িত মানুষদের চিকিৎসার জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল গঠন করেন। এমনকি প্রতিটি জেলখানাতেও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করেন। উমাইয়া যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিজ্ঞানভিত্তিক তেমন কোন উন্নত পরিকল্পনা না থাকলে আব্বাসীয় যুগের চিকিৎসা ছিল বৈজ্ঞানিকভিত্তিক। খলিফা হারুণ-আর-রশিদ বাগদাদে সাধারণ মানুষের জন্য বিমারিস্তান বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ইবনে তুলুন কায়রোতে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা হারুণ শুধু মাত্র হাসপাতাল নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি নানা শ্রেণীর রোগের উৎস নির্ণয়ে গবেষণার জন্য একটি বিশাল গ্রন্থাগারও স্থাপন করেন, যেখানে নির্ণীত হত রোগের যথাযথ কারণ ও তার সঠিক বিধিসম্মত ওষুধ। প্রতিটি হাসপাতালে স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

আত-তাবারি : আব্বাসীয় যুগের যে সমস্ত চিকিৎসকগণ উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আলি-ইবনুল-আব্বাস, আল-মাসুদি, আত-তাবারি, আর-রাজি এবং ইবনে সিনা। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৬১) সময় প্রখ্যাত চিকিৎসক আত-তাবারি ইসলামে দীক্ষা লাভ করেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ফিরদৌস-উল-হিকমা নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি গ্রীক ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়।

আর-রাজি : পারস্যবাসী রাজি (৮৬৫-৯২৫ খ্রীঃ) মুসলমান চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম মানবদেহে সুতার ব্যবহার প্রচলন করেন। সিহরিসতার অনুযায়ী বর্ণনা আর-রাজি চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ১১৩টি বড় গ্রন্থ ও ২৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রসায়নশাস্ত্রের ওপর লিখিত কিতাব-উল-আসরার গ্রন্থটি ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দে জিরার্ড ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন, চতুর্দশ শতাব্দীতে জাবিরের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রের এটিই একমাত্র প্রামান্য গ্রন্থ ছিল। আর-রাজি দশ খণ্ডে কেতাব আল-মনসুরি রচনা করেন, যার একটিতে সর্বপ্রথম বসন্ত ও হামের ওপর বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ১২৭৯ খ্রীঃ প্রথম চার্লসের সময় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-হাওয়া বা 'আল-হাবী' সিসিলির ইহুদি চিকিৎসাবিদ ফারাজ বিন সেলিম কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। ২০ খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটির বর্তমানে ১০ খণ্ড বিদ্যমান। ১৫৪২ খ্রীঃ ভেনিসে

এর পঞ্চম সংস্করণ পাওয়া গিয়েছিল। আর-রাজির গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে সারা বিশ্বে বহুল প্রচার লাভ করে।

আলি ইবনে আব্বাস আল-মাজুসি: বুয়াইয়া আমীর আদুদুদ্দৌলার দরবারে চিকিৎসক আল-মাজুসি কিতাবুল মালিকী নামে একটি মূল্যবান চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটায় চিকিৎসাশাস্ত্রে এটা একটি বিশ্বকোষের মর্যাদা লাভ করে। চিকিৎসক আল-মাজুসি পাশ্চাত্য জগতে হালি আব্বাস নামেও পরিচিত ছিলেন।

ইবনে সিনা: চিকিৎসাবিজ্ঞানে আর-রাজির পর ইবনে সিনার নাম সুবিখ্যাত। ইবনে সিনা একদিকে দার্শনিক আবার অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানী। সারা পৃথিবীতেই এরূপ অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি খুবই কম জন্মগ্রহণ করেছেন। ইবনে সিনা দার্শনিক হলেও ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর প্রভাব সর্বাধিক। তাঁর রচিত আল-কানুন-ফিত্তিব, গ্রন্থে গ্রীক ও আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিরাট বিশ্বকোষ স্বরূপ যাতে মানবদেহের মাথা হতে পা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাধির বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রতিটি রোগের যথাযথ কারণ বিশ্লেষণ-সহ তার প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিশাল গ্রন্থে সর্বমোট ৭৬০টি ওষুধের বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর এই সুবিখ্যাত গ্রন্থটি ক্রেমানার জিরার্ড (Gerard of Cremana) কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পূর্বে ইউরোপের স্কুল সমূহে চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ্য পুস্তক হিসাবে গৃহীত ছিল আর-রাজি ও মাজুসির গ্রন্থ সমূহ। কিন্তু ইবনে সিনার আল-কানুন ফিত্তিব। প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র ইউরোপে দ্বাদশ হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পাঁচশ' বছর এই গ্রন্থটি পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বন ছিল। ডক্টর অসলার বলেন—"এই পুস্তকটি অন্য যে কোন পুস্তক অপেক্ষা সর্বাধিক কাল ইউরোপে চিকিৎসা জগতের বাইবেল নামে অভিহিত ছিল।"

আলি ইবনে ঈসা: ইবনে ঈসা একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। চক্ষু চিকিৎসক হিসাবে তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চক্ষু চিকিৎসার ওপর ৩২টি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাজকিরা তুল কা-হেহা লীন। এই গ্রন্থে ১৩০টি চক্ষুরোগের বর্ণনা-সহ তাদের প্রতিকারের ব্যবস্থাও বর্ণনা করেন। গ্রন্থটির পরে হিব্রু ও ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।

ইয়াকুব ইবনে আখি: ইবনে আখি হিজাম বিখ্যাত পশু চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর হস্তলিখিত প্রতিলিপি আজও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা: এই যুগের আরবগণ রোগ নিরাময়ের জন্য নানা ওষুধ আবিষ্কার করেন সঙ্গে সঙ্গে তার উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা ও করেন।

ওষুধ বিষয়ক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে নিত্যনতুন ওষুধ আবিষ্কারের পথকে প্রশস্ত করেন, সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাগারের গবেষণাজাত ফলকে কার্যে প্রয়োগ করার জন্য বড় বড় ওষুধ কারখানাও প্রস্তুত করেন। এই প্রস্তুত ওষুধগুলি যাতে জনসাধারণ সহজে পায়, তার জন্য বহু ওষুধের দোকানও খোলা হয়। ওষুধের গবেষকগণ যেমন বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি ওষুধ কারখানার কর্মচারী-বৃন্দকেও নিয়মিত পরীক্ষায় পাস করতে হত। অনুরূপভাবে ডাক্তারগণকেও-পরীক্ষায় পাস করতে হত। এমনকি দোকানে ওষুধ প্রস্তুতকারী ও হাসপাতালে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দকেও নির্ধারিত পরীক্ষায় (কমপাউন্ডারি) পাস করতে হত। খলিফা আল-মুকতাদিরের সময় শুধু বাগদাদ শহরে সিনান ইবনে সাবিত ৮৬০ জন ব্যক্তিকে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দান করেন। ফলে বাগদাদ শহর হাতুড়ে ডাক্তার থেকে মুক্ত হয়। খলিফা মুকতাদিরের উজির আলি ইবনে ঈসা একদল সরকারী ডাক্তারের সাহয্যে গরিব জনসাধারণের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ওষুধ বিতরণ করতেন। জেলখানাগুলিতেও নিয়মিতভাবে ডাক্তার যেতেন, যাতে রোগীদের কোন অসুবিধা না হয়। বাগদাদের হাসপাতালের অনুকরণে দেশের নানা স্থানে বহু হাসপাতাল গড়ে ওঠে, এমনকি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালও পরিচালিত হয়েছিল। সকল হাসপাতালেই মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকত। বহু হাসপাতালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্থও থাকত, যেখানে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদান করা হত। এক কথায় জনস্বাস্থ্যে এরূপ রাষ্ট্রীয় চেতনা ও বিধিব্যবস্থা তৎকালীন বিশ্বে অন্য কোথাও দেখা যায় না।

জ্যোতিষ বিদ্যা ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রে মুসলমান বিজ্ঞানীগণ প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও পারসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে মুসলমান বিজ্ঞানীগণ প্রথম তাঁদের জ্ঞানসাধনা আরম্ভ করেন। ভারতের 'সিদ্ধান্ত' নামক একটি জ্যোতির্বিদ্যার বই মহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-ফাজারি কর্তৃক অনূদিত হয়ে পরবর্তী পণ্ডিতগণের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হয়। পরবর্তী-কালে গ্রীক টলেমির আল-মাজেস্ট গ্রন্থের অনুবাদ দ্বারা আরবদের জ্যোতির্বিদ্যা প্রভাবান্বিত হয়। এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন হাজ্জাজ বিন মাত্তার এবং হুনাইন বিন ইসহাক।

মানমন্দির ঃ খলিফা আল-মামুনের সময় সিনদ বিন আলি এবং ইয়াহইয়া বিন আবি মনসুরের তত্ত্বাবধানে বাগদাদে একটি মানমন্দির রচিত হয়। খলিফা আল-মামুন দামেস্কের নিকট কাসিয়ুনেও একটি মানমন্দির তৈরি করেন। এছাড়াও জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মানমন্দির নির্মাণ করা হয়। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে জুন্দেশাহপুরে প্রথম বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার জন্য একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ-জ্যোতিষীগণ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। আল-মাজেস্ট বর্ণিত

ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা, বিষুবের সঠিক সময়কাল নির্ধারণ এবং সৌর বৎসরের দীর্ঘতা সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত। ইব্রাহিম আল-ফাজারিই প্রথম গ্রীক আদর্শে অ্যাসট্রোলেবল তৈরি করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যন্ত্রপাতিও যেমন, ডায়াল, কোয়াড্রান্ট এবং ভূ-চিত্রও তৈরি করেন।

যন্ত্রপাতি ও জ্যোতির্বিদগণ ঃ এই যুগের জ্যোতির্বিদদের যন্ত্রপাতির মধ্যে বৃত্তের চতুর্থাংশ (Quadrant) এস্ট্রলের সূর্যঘড়ি, এবং ভূগোল প্রধান ছিল। **আলম ইবন ঈসা** নামক একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এস্ট্রলের যন্ত্র তৈরি করে 'আস্তরলাবি' উপাধি লাভ করেন। **মূসা ইবনে শাকিরের বা সাবিরের** পুত্রগণ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতেন। **আল-খাওয়ারিজমি**, পালমিরা এবং ইউফ্রেটিসের নিকটবর্তী সিনজার সমতলভূমিতে ভূমণ্ডলের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে স্পেনের জ্যোতির্বিদ **মাসলামা আল-মাজরিতি** জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সারণী (সীজ) সংশোধিত করেন। পরে এটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় ব্যবহৃত হয়। আব্বাসীয় খেলাফতে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের (৮৪৭-৬১ খ্রীঃ) সময় বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী **আবু আল-আব্বাস আহম্মদ আল-ফরগণী** ফুসতাতে একটি নিলোমিটার (পানির উচ্চতা মাপবার যন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুদাখিল (১১৩৫ খ্রীঃ) ল্যাটিন এবং হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়। বুয়াইয়া আমীর শরফুদ্দৌলার সময় বাগদাদে যে মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ **আব্দুর রহমান আল-সুফী, আহমদ-আসসাগানী, আবু আল-ওয়াকা** এবং **আল-কুহী** উল্লেখযোগ্য গবেষণা চালান। **আল-বাত্তানি** (৮৭৭-৯১৮ খ্রীঃ) নামক সাবীয়ান জ্যোতির্বিদ গ্রহণ সম্পর্কে ও এবং গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে বহু তথ্য আবিষ্কার করেন। মৌলিক গবেষণায় তাঁর অবদান যথেষ্ট। তিনি টলেমির সূত্রের পরিবর্তন করে চন্দ্র এবং বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথ সম্পর্কে নতুন মত প্রতিষ্ঠা করেন। কৃতিত্বের সাথে তিনি সূর্যের আংশিক গ্রহণ, ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা, বছর ও ঋতুর দীর্ঘতা এবং সূর্যের কক্ষপথ সম্পর্কে সুষ্ঠু গবেষণা পরিচালনা করেন। এই অধ্যায়ে অন্য একজন জ্যোতির্বিদকেও নির্ভুল তত্ত্ব আবিষ্কার করতে দেখা যায়, তার নাম **আল-খাজিন**।

আবু-রাইহান আল-বেরুনি ঃ মুসলিম জগতের সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও প্রজ্ঞাশীল মনীষী আল-বেরুনিও একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি সুলতান মাহমুদের পুত্র মাসুদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্যোতিবশাস্ত্রের সমসাময়িক তত্ত্বাবলীর সমন্বয়ে ১০৩০ খ্রীঃ আল-কানুন-উল-মাসুদি (ফিল হাইয়াওয়ান নজুম) নামক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে তিনি আত-তাকফীম (লা আওয়াইল-সিনাত-উত-তনজীম) নামক জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অংকশাস্ত্রের একটি প্রশ্নোত্তর পুস্তক রচনা করেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত

গ্রন্থ আল-আসার। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন পঞ্জিকা ও অব্দ সমূহের ওপর বিশেষ আলোচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে মহাকবি আল-বেরুনি পৃথিবীর গতি-দ্রাঘিমা এবং অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ভুলভাবে নিরূপণ করে পৃথিবীর কক্ষপথ সম্বন্ধে বিতর্কিত তত্ত্বের ওপর নির্ভুল মন্তব্য করতে সক্ষম হন। আল-বেরুনি বহুদিন ভারতেও অবস্থান করে ভারতীয় বিদ্যাকে অর্জন করার নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করে জ্ঞানজগতের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের জন্ম দিয়ে যান, যার নাম 'কিতাবুল হিন্দ' বা ভারত গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ভারতের জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলেন—'কিতাবুল হিন্দ' একটি জ্ঞানভাণ্ডার জ্ঞানের খনি, আল-বেরুনি অন্য কোন পুস্তক রচনা না করলেও এই একটি পুস্তক দ্বারাই চির অমরত্ব লাভ করতেন। সুতরাং কিতাবুল হিন্দ তাঁর অমর সৃষ্টি।

(এই অমূল্য গ্রন্থটির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন বাংলাদেশের ডঃ মহম্মদ হাবিবুল্লাহ। পরে তিনি গ্রন্থটিকে ছাপার জন্য ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমিতে পাঠান, তদানীন্তন সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বইটিকে ভারতে ছাপা যায় কিনা, এই মতামতের জন্য আমার নিকট পাঠান, আমি খুবই ভাল মত পাঠাই। তবুও যে কারণেই হোক বইটি আর ভারতে ছাপানো হল না। পরিশেষে বাংলাদেশের বাংলা আকাদেমি গ্রন্থটিকে ছাপার ব্যবস্থা করে বাংলার জ্ঞান ভাণ্ডারকেও সমৃদ্ধ করেন।)

ওমর খৈয়াম ঃ সেলজুক সুলতানদের মধ্যে জালালুদ্দীন মালিক শাহ জ্যোতির্বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি একটি মানমন্দির নির্মাণ করে বহু পণ্ডিতগণের গবেষণার সুযোগ করে দেন। ওমর খৈয়াম নিশাপুরের এই মানমন্দিরে তাঁর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। সারা পৃথিবীতে কবি ও দার্শনিক হিসাবেই তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু অতীতে তাঁর পরিচিতি যে দিক দিয়েই হোক, বর্তমানে সারা দুনিয়াতে তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হিসাবেও অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব ছিল প্রাচীন ফারসী পঞ্জিকার সংশোধন। এটি আত-তারিখ-উল-জালালি পঞ্জিকা নামে পরিচিত। এই পঞ্জিকাটি গ্রেগারিয়ান পঞ্জিকা হতে নির্ভুল বলে সর্বজন গৃহীত ও স্বীকৃত।

নাসিরুদ্দীন তুসী ঃ ১২৫৮ খ্রীঃ বাগদাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর হালাকু খান উরমিয়া হ্রদের নিকট বিখ্যাত মারাগা মানমন্দির নির্মাণ করেন। জ্যোতির্বিদ নাসিরুদ্দীন তুসী (১২৭৪ খ্রীঃ মৃঃ) এই মানমন্দিরের মহা পরিচালক ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ। তাঁর প্রণীত সারণী 'আজীজ-উল-ইলখানি নামে পরিচিত ছিল। মারাগা মানমন্দিরে ৪,০০,০০০ গ্রন্থ সম্বলিত একটি সুবিশাল গ্রন্থাগারও ছিল।

আবু আল-মাশার ঃ জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন আল-মাশার। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে চারটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম চন্দ্র-সূর্যের প্রভাবে জোয়ার-ভাটার কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এইভাবে বিশ্ব জ্যোতিষশাস্ত্রের গগনে একদিন বহু মুসলিম উজ্জ্বল তারকার আবির্ভাব দেখা দেয়। এই শাস্ত্রে তাঁদের দান-অবদান অপরিমিত ও অসামান্য। আজও জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত Zenith, Azimath, Nadir প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁদেরই দান।

গণিতশাস্ত্র ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য অধ্যায়ের মতো মুসলমানগণ গণিত-শাস্ত্রেও অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। ভারতের 'সিদ্ধান্ত' গ্রন্থটি অনুবাদের ফলে মুসলমানগণ হিন্দু অংকশাস্ত্র, ভারতীয় সংখ্যারীতি এবং শূন্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করেন। আল-ফাজারি এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। অচিরেই ভারতের এই গণনা পদ্ধতি আরব জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এবং আরবগণের নিকট হতে এই গণণা পদ্ধতি পাশ্চাত্য জগতেও প্রচলিত হয়। আরব অংকবিদগণের মধ্যে মহম্মদ ইবনে আল-খাওয়ারিজমি সর্বপ্রথম এই গণণা পদ্ধতি আরব জগতে প্রচলিত করেন। কিন্তু আরবগণের মধ্যে এই গণণা পদ্ধতির সাথে সাথে পুরাতন কথায় লেখার পদ্ধতি ও গ্রীকদের অক্ষরের সাহায্যে গণনার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। আল-খাওয়ারিজমি ও হাবাস আল-হাসিরের সারণীর মাধ্যমেই এই সংখ্যা চিহ্নগুলি ব্যাপক প্রচারলাভ করে। কিন্তু আরব বৈজ্ঞানিকগণ হিন্দুদের জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবহারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। একাদশ শতাব্দীতে আল-ফারাজি তাঁর 'আল-কাফি ফিল হিসাব' নামক গ্রন্থেও সকল সংখ্যাগুলিকে শব্দের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন। আবার অন্যান্য পণ্ডিতগণের অনেকেই সেমেটিক এবং গ্রীকদের অনুকরণে বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করতেন।

তবে একথা বললেও অত্যুক্তি করা হবে না যে, আল-খাওয়ারিজমিই (৭৮০-৮৫০ খৃীঃ) ছিলেন প্রথম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অংকশাস্ত্র বিশারদ। তিনি একাধারে গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কেননা তিনি জ্যোতির্বিদ্যার নির্ঘণ্টও তৈরি করে-ছিলেন। তিনি অংকশাস্ত্রের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থও রচনা করেন। প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় সারণী প্রস্তুত ছাড়াও তিনি প্রাচীন অংক ও বীজগণিতের সূত্রগুলিকেও সুসমন্বিত করতে সক্ষম হন। অ্যালজেব্রা সম্পর্কিত তাঁর রচিত গ্রন্থ 'হিসাব-উল-জাবর-ওয়াল মুকাবালা' আরবী ভাষায় লিখিত বীজগণিতের ওপর প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরে এটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সমাদৃত হয়। এই গ্রন্থটির মাধ্যমেই সমগ্র ইউরোপে একদিন অ্যালজেব্রার চর্চা শুরু হয় এবং এই গ্রন্থটির নামকরণ হতেই এই বিষয়ের নামকরণ হয়—অ্যালজেব্রা। সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম পরে অ্যালজেব্রা সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর

অ্যালজেব্রা খাওয়ারিজমির অ্যালজেব্রা হতে উন্নতমানের ছিল। তিনি সমীকরণের প্রকারভেদ ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণে জ্যামিতির প্রয়োগ তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। আব্বাসীয় আমলের শেষ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক ছিলেন আবুল ওয়াকা। গণিতজ্ঞ ওয়াকা ও জ্যোতির্বিদ্যাও ত্রিকোণমিতিতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি খাওয়ারিজমিও ডায়োফান্তাসের অ্যালজেব্রার ভাষ্যও রচনা করেন। যাই হোক প্রাচীন ও প্রবীণ অসাধারণ গণিতজ্ঞ খাওয়ারিজমির প্রভাব পরবর্তী সকল গণিতজ্ঞের ওপর লক্ষ্য করা যায়, যেমন—ওমর খৈয়াম, লিওনার্ডো ফিবোনাসি, এবং মাস্টার জ্যাকোব প্রমুখ।

রসায়ন শাস্ত্র ঃ আরবগণের 'আল-কেমিয়া' বর্তমান কেমিস্ট্রি বা রসায়ন বিজ্ঞানের জনক। এই শব্দটি মিশরীয় শব্দ হতে উদ্ভূত বলে মনে হয়। পূর্বাকালে মিশরীয় ও গ্রীকগণ কাল্পনিক বিষয় হিসাবে এর চর্চা করেন। আরব বিজ্ঞানীগণ একে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এইভাবে রসায়নশাস্ত্রে মুসলিম মনীষীগণ অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

আরবদের কিমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও জন্মদাতা হলেন জাবির ইবনে হাইয়ান। যাঁকে ল্যাটিন ভাষায় জেবার বলা হয়। তিনি ৭৭৬ খ্রীঃ কাছাকাছি সময়ে কুফায় কার্যরত ছিলেন। আর-রাজির পর তিনিই সে যুগে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রীক ও মিশরীয় পণ্ডিতগণের মতে, জাবির ইবনে হাইয়ান মনে করতেন ভালর সংস্পর্শে মন্দ জিনিস ভাল হয়। এটি শুধু মনুষ্যজগৎ, প্রাণী-জগৎ ও উদ্ভিদজগতেই সীমাবদ্ধ নয়, বস্তু বা পদার্থজগতেও এটি প্রতিফলিত। হাইয়ানের ধারণা কোন অজ্ঞাত পদার্থের সাহায্যে টিন, লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতি নিকৃষ্ট পদার্থগুলি সোনা ও রূপাতে রূপান্তরিত হয়। জাবির ইবনে হাইয়ান খলিফা হারুণ রশিদের সময় তাঁর বার্মেকি উজিরদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায় ৮০৩ খ্রীঃ ঐ পরিবারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কুফায় নির্বাসিত হন এবং সেখানেই তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত হয়। তাঁর মৃত্যুর দু'শ' বছর পর কুফার একটি রাস্তা মেরামতের সময় জাবিরের গবেষণাগারটি আবিষ্কৃত হয় এবং সেখানে একটি সোনার পাতও পাওয়া যায়।

আরবী ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত কিমিয়ার ওপর একশ' পুস্তকে গ্রন্থকার হিসাবে জাবিরের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এদের অনেকগুলিই অন্য লেখকের লেখা বই কিন্তু তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ সেগুলির মান অত্যন্ত নিম্ন, এত নিম্নমানের বই জাবিরের মতো লেখকের হওয়া সম্ভব নয়। সেকালে একজনের লেখা বই অন্য জনের নামে চালিয়ে দেওয়ার প্রথাও ছিল। জাবির তাঁর প্রামাণ্য ২২ খানা গ্রন্থে রসায়নশাস্ত্রের সকল বিষয়ের ওপর গবেষণামূলক আলোচনা করেন। এদের মধ্যে—কিতাব-আল-রহমা, কিতাব-আল-তাজমি, এবং আল-জিবাক-আল-সরফি প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, জাবির অনেক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ তৈরি করেন। রসায়নশাস্ত্রের প্রধান দুটো সূত্র উষ্মীকরণ (Calcination) এবং লঘুকরণ (Reduction) সম্বন্ধে তিনি অতি উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বাষ্পীকরণ (Evaporation), ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation), তরলীকরণ (Melting) এবং স্ফটিকীকরণ (Crystallization) প্রভৃতি সূত্রের উৎকর্ষতা সাধন করেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ হতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রসায়নবিদদের মধ্যে সর্বপ্রথম হাতে-কলমে পরীক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। যার ফলে তিনি রসায়নের মতবাদ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় আল-কেমি ও কেমিস্ট্রির সমগ্র ধারায় তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা ও রাসায়নিক দ্রব্যের আবিষ্কার তাঁকে চির অমরত্ব দান করেছে। তাঁর বহু পুস্তকের ল্যাটিন তর্জমা হতে বহু বৈজ্ঞানিক নাম ইউরোপীয় ভাষায় সাদরে গৃহীত হয়। তাই তাঁকে নিসন্দেহ আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের জনক বলা হয়। ঐতিহাসিক হামবুলট বলেন—"আধুনিক রসায়নশাস্ত্র মুসলমানদেরই আবিষ্কার এবং এই দিক দিয়ে তাঁদের কৃতিত্ব অতুলনীয়।" পরবর্তীকালে মুসলিম রাসায়নিকগণ জাবিরকে তাঁদের শিক্ষকের সম্মান দান করেন। বিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী আর-রাজি কিমিয়া সম্বন্ধেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি জাবিরের ভাবধারা হতে অনেকটা উন্নত মানের। এই গ্রন্থে বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণী বিভাগ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে উন্নত মানের আলোচনা আছে।

প্রাণিতত্ত্ব ও খনিজ বিজ্ঞান: ইসলামের মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ) প্রাণিজগতের প্রতিও খুবই দয়াবান ছিলেন। তাঁর এই ব্যবহার হতেও আরবগণ প্রাণীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে তাঁরা প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কেও গবেষণায় নিয়োজিত হন এবং প্রাণিতত্ত্বে বহু রহস্য তাঁরা উদ্ঘাটন করেন। ঘোড়া ছিল আরবদের অত্যন্ত প্রিয়। এই ঘোড়া সম্পর্কে তাঁদের গবেষণা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত হয়। আবু উসমান-আমর-ইবনে বাহার-আল-জাহিজ আরব প্রাণিতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল-হাইওয়ান'-এ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে এবং একেই বিবর্তনবাদ ও প্রাণী মনস্তত্ত্বের উৎস বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে পারস্যের আল-কায়উইনি এবং মিশরের আদ-দামিরি আল-জাহিজের গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রভাবান্বিত হন।

পঞ্চাশের অধিক আরবী গ্রন্থে খনিজ পদার্থ এবং মণিমাণিক্য সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে উতারিদ-ইবনে মহম্মদ আল-হাসিবের গ্রন্থ সর্বাধিক পুরাতন। এতদ্ব্যতীত শিহাব-উদ-দীন-আত-তিফাশি প্রণীত আজহার-উল-

আফকার-ফি জাওয়াহির-উল-আজহার বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। আত-তিফাশি ২৪টি ও আল-বেরুনি ১৮টি মূল্যবান পাথর ও ধাতুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ভূগোল: ইসলামধর্ম শুধুমাত্র একটি গতানুগতিক ধর্ম নয়, এটি জীবন-ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলাম মুসলমানদের সমাজ জীবনের নানা অধ্যায় বিচরণ করতে উৎসাহ দান করে। একদিন ধর্মীয় কারণেই মুসলমানদের জন্য ভূগোল চর্চা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নামাজের সময় কেবলা নির্ণয় অর্থাৎ কাবা শরীফের দিক ঠিক করা, মসজিদ সমূহকে কাবামুখী করে নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং পবিত্র হজ্বযাত্রা ইত্যাদি ধর্মীয় কারণে ভূগোল চর্চা মুসলমানদের পঠন-পাঠনের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। ভূগোলের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অঙ্কের গভীর সম্পর্ক থাকায় উভয় উভয়েরই পরিপূরক হয়। জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণার জন্য সকল স্থানের অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত: হজ্বযাত্রা, নৌ-বাণিজ্য ও বিভিন্ন কারণে সমুদ্র পাড়ি দেবার প্রয়োজনেও মুসলমানগণ ভূগোল চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। সর্বপ্রথম দিগ-দর্শন ও দূরবীন যন্ত্রের আবিষ্কার মুসলমানদের অমর কীর্তি। সপ্তম হতে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে মুসলিম বণিকগণ পূর্বে জল ও স্থলপথে চীন, দক্ষিণে জাঞ্জিবার ও আফ্রিকার উপকূল, উত্তরে রাশিয়া এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত অভিযান করেন। এই সমস্ত অঞ্চল হতে প্রত্যাগত বণিকদের বর্ণনায় উৎসাহিত হয়ে তাঁরা দূর-দূরাঞ্চলে অভিযান করেন। এর মূলে ছিল আরব-মুসলমান সওদাগর ও অভিযাত্রীগণ দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর দূর-দূরান্তের দেশ ও অধিবাসী সম্পর্কে জানা-অজানা নানা মনোজ্ঞ কাহিনী প্রচার করে বিদেশ যাত্রার জন্য বহুলোককে প্রেরণা দান করেন। সিরাফ নগরীর বিখ্যাত সওদাগর সুলাইমান আত-তাজির ভ্রমণ বৃত্তান্ত হতে দূর-প্রাচ্য ও পাক ভারত সম্পর্কে অনেক মনোরম কাহিনী জানা যায়। মূলত এই সকল ভ্রমণ বৃত্তান্ত হতেই সিন্দাবাদ ও আহমদ-বিন-ফজলান-বিন-হাম্মাদ নামক নাবিকদের নামকে কেন্দ্র করে বহু রোমাঞ্চকর কাহিনীর সৃষ্টি হয়। ৯২১ খ্রীঃ আব্বাসীয় খলিফা মুকতাদির আহমদ ইবনে ফাজলান নামক এক পর্যটককে রাশিয়ার ভলগা নদীর নিকটবর্তী অঞ্চল পরিদর্শন করতে পাঠান। তাঁর লেখনী হতে প্রথম রাশিয়া সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়।

প্রথম ভূ-মানচিত্র: দশম শতকের শেষার্ধে গ্রীক মনীষী টলেমির ভূগোল এক প্রামাণ্য ভূগোল গ্রন্থ হিসাবে আরবীতে অনূদিত হয়। যাঁরা এই অনুবাদ কাজকে অত্যন্ত কৃতকার্যতার সাথে সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে—ইয়াকুত-ইবনে ইসহাক, আল-কিন্দি এবং সাবিত ইবনে কোররাহরই প্রধান। এই সময় স্বনাম-ধন্য বিশ্ববিখ্যাত ভৌগোলিক খাওয়ারিজমি সুরাতুল-আরদ (পৃথিবীর চেহারা

বা আকৃতি) নামক একটি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অতঃপর খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৩৩ খ্রীঃ) পৃষ্ঠপোষকতায় আল-খাওয়ারিজমি ৬৯ জন জ্ঞানীলোকের সহায়তায় সর্বপ্রথম সমগ্র পৃথিবীর একটি পূর্ণ মানচিত্র প্রণয়ন করতে সক্ষম হন। যাকে আরবী ভাষাতে বলা হত—যুবাত আল-আরদ (পৃথিবীর মানচিত্র)। ইসলামের এই প্রথম মানচিত্র চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত শুধু মুসলিম ভৌগোলিকগণই ব্যবহার করেননি, বরং সারা ইউরোপের ভৌগোলিকগণ এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ইউরোপীয় ভৌগোলিকগণ যখন পৃথিবীকে চ্যাপ্টা বলে মনে করতেন, তখন আরব ভৌগোলিকগণ তাঁদের ভুল সংশোধন করে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করেন।

ভূগোল গ্রন্থ ও ভৌগোলিকগণ: মুসলিম ভৌগোলিকগণের সকলেই ছিলেন এক একজন স্বনামধন্য ভূপর্যটক, কোনদিনই কেউ কোন গবেষণাগারে বসে ভূগোল গ্রন্থ বিরচিত করেননি। অধিকন্তু তাঁরাই ছিলেন এ বিষয়ের একমাত্র পথিকৃৎ, সুতরাং তাঁদের পূর্বে কোন গ্রন্থও ছিল না, তাঁরাই ছিলেন আদি ভূগোল গ্রন্থের প্রকৃত জন্মদাতা। তাই তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে এমনকি সারা জীবনব্যাপী নানা দেশ-বিদেশে, নানা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়েও বহু নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-জলাশয়, হ্রদ-উপত্যকা, বন-জঙ্গল, মরুভূমি-মরূদ্যান, গ্রাম-শহর, মাঠ-ঘাট যাবতীয় জিনিসগুলি নিখুঁত-ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তবেই ভূগোল লিখতে কলম ধরতেন। তখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত এই ভূগোল বৃত্তান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে সমাদৃত হত।

খুরদাজবিহ: সর্বপ্রথম ভূগোল বিবরণবেত্তা ছিলেন আব্বাসীয় খেলাফতের ডাক বিভাগের জিবাল অঞ্চলের প্রধান পারস্যবাসী ইবনে খুরদাজবিহ। তাঁর 'মাসালিক ওয়াল মামালিক' নামক ভূগোল গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ৮৪৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ইবনুল-ফাকীহ, ইবনে হাওকাল, আল-মাকদিসী ও অন্যান্য লেখকগণ এই গ্রন্থটি দ্বারা বহুলভাবে উপকৃত হন।

আল-ইয়াকুবি: ৮৯১-৯২ খ্রীঃ আল-ইয়াকুবি তাঁর 'কিতাব-বুলদানে' ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিশদ বিবরণ বর্ণনা করেন।

ইবনে রুস্তা ও আল-হামাদানি: ৯০৩ খ্রীঃ ইবনে রুস্তা তাঁর বিখ্যাত ভূগোল গ্রন্থ 'আল-আলাকুল নাফিসা' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সময় আল-হামাদানিও তাঁর 'কিতাবুল বুলদান' ও 'আল-ইকলীল এবং সিফাত জাজীরাতুল আফালিম' রচনা করেন।

কুদামা: ৯২৮ খ্রীঃ কুদামা তার 'আল-খারাজ' নামক ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি দেশের প্রদেশ বিভাগ, ডাকবিভাগ ও রাজস্ব সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ দেন।

ইস্তাখরি ও ইবনে হাওকাল: ইস্তাখরি তাঁর ভৌগোলিক গ্রন্থ

'মাসালিকুল মামালিকে' বহু দেশ-বিদেশের মানচিত্র সংযোজিত করেন। এবং তাঁরই অনুরোধে ইবনে হাওকাল বহুদেশ পরিভ্রমণ করে ইস্তাখরির পুস্তকটি সংশোধন করে মানচিত্রগুলি পুনরায় সন্নিবেশিত করেন, অতঃপর নিজ নামে একটি 'মাসালিক ওয়াল মামালিক' রচনা করেন।

আল-মাকদিসী: এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও স্বনামধন্য ছিলেন ভৌগোলিক আল-মাকদিসী। তিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত ভৌগোলিক ও বিখ্যাত পর্যটক। কেননা তিনি স্পেন, সিন্ধান, পাক ভারত প্রভৃতি যাবতীয় মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলি সুদীর্ঘ ২০ বছর পরিভ্রমণ করে এই দীর্ঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সমন্বিত একটি অতি উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ উপকরণ সমৃদ্ধ ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম—'আহসানাত তাকাসিম-ফিল মারিফাতুল আকালিম'।

ইয়াকুত আল-হামারি: আব্বাসীয় যুগের শেষভাগে পূর্বাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ইয়াকুত আল-হামারি তাঁর ভৌগোলিক বিশ্বকোষে 'মাজামুল বুলদান' রচনা করেন। তিনি এই ভৌগোলিক বিশ্বকোষ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্থানের নামসমূহ বর্ণমালার হিসাবে সুসজ্জিত করে প্রত্যেকটি স্থান সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেন। ভূগোল গ্রন্থ হিসাবে এই গ্রন্থটি একটি চিরস্থায়ী কীর্তি। তাঁর সাহিত্যিক বিশ্বকোষও সুধী সমাজে সমভাবেই সমাদৃত হয়েছিল।

আল-মাসুদি: খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে ভূগোল জগতের দিক্‌পাল এক অনন্যসাধারণ ভৌগোলিক আল-মাসুদি সমগ্র এশিয়া মহাদেশ, জানজিবার এবং উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ পর্যটন করে সমগ্র জীবনের একান্ত সাধনাকে সযত্নে সর্বমোট ৩০ খণ্ডে 'মুরুযুয জাহাব' নামে একটি অভাবনীয় ও অতুলনীয় ভূগোল গ্রন্থ রচনা করে ভূগোল জগতের সিদ্ধপুরুষের সুখ্যাতি অর্জন করেন।

আবু রাইহান আল-বেরুনি: এক ইরানী পরিবারে ৯৭৩ খ্রীঃ আবু রাইহান আল-বেরুনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমি প্রাচীন খোরেজমে থাকাকালেই তিনি কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। আল-বেরুনির 'কেতাবুল হিন্দ' ভারত-তত্ত্ব গ্রন্থটি নানাদিক থেকেই শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে একটি তথ্য-সমৃদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ হিসাবে চির খ্যাতি লাভ করেছে। সেকালের ভারতবর্ষকে জানতে ও চিনতে এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থটির কোন তুলনা নেই। এত জটিল এবং বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্য সমন্বিত এরূপ একটি বৈজ্ঞানিকভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর শক্তির পরিচায়ক। গ্রন্থটির মধ্যে নানা অধ্যায়ে যে ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দান করেছেন—সেখানে তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত ভৌগোলিকের আসন অলংকৃত করেছেন। ১০৩০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়।

ইবনে বতুতা, আল-ইদ্রিসী, আল-ইয়াকুত: এই যুগের অন্যান্য প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ছিলেন ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতা, আল-ইদ্রিসী, আল-ইয়াকুত প্রমুখ। ইবনে বতুতা সুদীর্ঘ ৩৬ বছর একটানা আরব, চীন, সিংহল, বাংলাদেশ,

আসাম, দিল্লি ও মধ্য আফ্রিকা পরিভ্রমণ করে 'রিহলা' নামে একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে কয়েকটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত বের হয়েছে মৌলিকতার দিক থেকে ও ভৌগোলিক বিচারে 'রিহলা'র স্থান আজও অনেক উচ্চে।

পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপ আরব ভৌগোলিকদের পঞ্জিকা, মানচিত্র, জ্যোতিঃ-বিদ্যা সংক্রান্ত সারণী এবং আরব কর্তৃক অ্যারিস্টটলের গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রভৃতি মুসলিম ভূগোল গ্রন্থগুলি হতে গ্রহণ করে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম অবদানের ও মুসলিম মনীষীদের কথা বলতে গিয়ে জর্জ মার্টিন বলেন—"মানবজাতির প্রধান কাজগুলি মুসলমানগণ কর্তৃকই সম্পাদিত হয়েছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল-ফারাবি একজন মুসলমান ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ আবু আল-ফামিল ও ইব্রাহিম ইবনে সিনান এবং খাওয়ারিজমি মুসলমান ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ও বিশ্বকোষ প্রণেতা আল-মাসুদি একজন মুসলমান ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আত-তাবারী, সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আবুবকর আর-রাজি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ওমর খৈয়াম, সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণিতত্ত্ববিদ আল-জাহিজও একজন মুসলমান ছিলেন।" এতদ্ব্যতীত সাহিত্যে-সঙ্গীতে, স্থাপত্য ও চিত্রকলায়ও মুসলমানগণ সমপারদর্শিতা দেখিয়ে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন।

ইতিহাস চর্চা: খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া যুগে ইসলামের ইতিহাস লেখা শুরু হলেও এটি প্রকৃত রূপ নেয় আব্বাসীয় যুগে। ইসলামের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উন্নতির চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। যে জিনিসটি আরব জনমানসকে ইসলামের ইতিহাস লিখতে সর্বপ্রথম উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল, তা মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর জীবনী বৃত্তান্তকে জানার এক আকুল আকুতি ও অপরিমিত আগ্রহ। মহানবীর তিরোধানের পর তাঁর অভাবনীয় বিরাট ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি সমগ্র আরবভূমিকে আলোড়িত করে তুলেছিল। অজানা, অদেখা মহানবী (দঃ)-কে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানার জন্য সকল মানুষের মনে যে অত্যুগ্র পিপাসা সঞ্চারিত হয়েছিল, তারই নিবারণার্থে প্রথম জন্ম নিল—**আরব-ইতিহাস** বা **ইসলামের ইতিহাস**। পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাস উন্নতি ও উৎকর্ষতার চরম শীর্ষে উপনীত হয়ে সারা বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি করল ইতিহাস জগতের হিমালয়, বিশ্ব-ইতিহাসের ইতিহাস জগতের ঐ গগনচুম্বী হিমালয়ের আপন আপন সৃষ্টিতে জগৎস্মরেণ্য ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন ও আত-তাবারি, কেউ বা কাঞ্চনজঙ্ঘা কেউ বা এভারেস্ট।

ইতিহাস লেখার প্রথম পদ্ধতি: হাদিস (মহানবীর বাণী) সংগ্রহের পদ্ধতিতে প্রথম ইতিহাস লেখা হত। হাদিস সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল 'ইসনাদ' যোগে। হাদিসশাস্ত্রে যাঁরা বর্ণনা করেন তাঁদের 'রাবী' বলা হয়। এবং তাঁদের বর্ণনাকে

'রেওয়ায়েৎ' বলা হয়। মহানবীর বাণী প্রায় শ্রবণ পরম্পরায় একজন হতে অন্য জনের নিকট এসেছে, এইভাবে তাঁর বাণী কালোত্তীর্ণ ও যুগোত্তীর্ণ হয়েছে, এই পরম্পরার নিখুঁত ধারাকে হাদিসশাস্ত্রে 'ইসনাদ' বলা হয়। এই ইসনাদ যোগে অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ-সহ ইসলামের ইতিহাস লেখা প্রথম আরম্ভ হয়। এই পদ্ধতিতে মূল বর্ণনাকারীদের হুবহু যবানীতে বা উক্তিতে ঘটনাগুলি বিবৃত হত। এই পদ্ধতি ঘটনা বা কাহিনীর সত্যতা উদ্ধারের জন্য বড়ই ফলপ্রসূ হত এবং এর মধ্যে ঐতিহাসিকের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা ও ইতিহাসের বিশুদ্ধতা প্রতিফলিত হত। আরব ইতিহাস চর্চার এটি ছিল এক নিখুঁত ভিত্তিভূমি, এতে কোন গোঁজামিল ছিল না। তাই সাধারণ মানুষ একে জানার জন্য প্রকাশ করেছিল অসাধারণ আগ্রহ। যেখানে ইতিহাস লেখকদের ছিল অকৃত্রিম সাধনা, সেখানে ইতিহাস পাঠক-পাঠিকাদেরও ছিল অপরিমিত আগ্রহ। পরবর্তী কালে এই অকৃত্রিম সাধনা ও অপরিমিত আগ্রহ সৃষ্টি করল ইসলামের ইতিহাসের বিশ্বজোড়া এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

প্রাক-ইসলামি আরবের ইতিহাস ঃ প্রাক মুসলিম আরবের ইতিহাস রচনায় হিশাম-আল-কালবী প্রসিদ্ধ অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুকাল ছিল ৮১৯ খ্রীঃ। তিনি প্রাক ইসলামি আরবের বহু বিছু তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণনাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, জানা যায় তাঁর সর্বমোট গ্রন্থ ছিল ১২৯টি। তন্মধ্যে আল-ফিহ্রিসত নামক গ্রন্থে সংযোজিত আছে মাত্র তিনটি।

আরবের ইসলামি ইতিহাস ঃ ইল্‌মুত-তাওয়ারিখ ঃ

ইবনে ইসহাক ঃ মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর প্রথম সিরাত বা জীবনী গ্রন্থ লেখেন মদিনাবাসী ইবনে ইসহাক। তিনি ৭৬৭ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন। ইবনে ইসহাক ছিলেন আরব ভূমির প্রথম ঐতিহাসিক। তাঁর মূল গ্রন্থটি এখন আর পাওয়া যায় না।

ইবনে হিশাম ঃ ইবনে ইসহাকের গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্তীকালে ইবনে হিশাম মহানবীর অন্য একটি সিরাত বা জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ৮৩৪ খ্রীঃ কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

শিহাব আজ-জুহরি, মূসা ইবনে উকবা, আল-ওয়াকিদী, ইবনে সাদ ঃ হাদিসবেত্তা ইবনে শিহাব আজ-জুহরির মহানবীর জীবনী সম্পর্কিত বহু হাদিস সংগ্রহ করেন। পরে এই সকল হাদিসের ভিত্তিতে 'মাগাজি' গ্রন্থ (ধর্মযুদ্ধ) লিখিত হয়। মাগাজি লেখক মুসা ইবনে উকবা এবং আল-ওয়াকিদী মদিনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা ৭৫৮ ও ৮২২ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন। ইবনে সাদ 'তাবাকাত' (বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনীকোষ) রচনা করেন। তাবাকাত গ্রন্থে

লিপিবদ্ধ হয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনীকোষ অর্থাৎ স্বয়ং মহানবী (দঃ)-এর জীবনী, অতঃপর তাঁর সাহাবা বা সঙ্গীগণের জীবনী, সঙ্গে তাঁর তাবেয়িন সাহাবাগণের পরবর্তী যুগের মনীষীগণের জীবনী। যাঁরা মহানবী (দঃ)-এর সঙ্গ ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন তাঁদের বলা হয় সাহাবা এবং যাঁরা সাহাবাগণের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভ করেছিলেন তাঁদের বলা হয় তাবেয়িন। সিরাত বলা হয় একমাত্র মহানবীর জীবনী গ্রন্থকে। মাগাজি বলা হয়—ধর্মযুদ্ধ বৃত্তান্ত ইতিহাসকে এবং 'তাবাকাত' বলা হয় যাতে বা যে গ্রন্থে মহানবী (দঃ) হতে তাঁর সাহাবী ও তাবেয়িনদের পর্যন্ত জীবনী বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-বালাজুরি, ইবনে আব্দুল হাকাম, ইবনুল মুকাফদা, ইবনে কুতায়বা, আবু হানিফা আদ দীনাওয়ারি আল-ইয়াকুবি, হামজা আল-ইস্পাহানি : সিরাত, তাবাকাত ও মাগাজি প্রভৃতি সাহিত্য ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে নবম শতাব্দী হতে ইসলামের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার কাজ আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক আল-বালাজুরির (মৃঃ ৮৯২) নাম সর্বজনবিদিত। পারস্যবাসী বালাজুরি বিখ্যাত 'ফুতুহ-উল-বুলদান' ও 'আনা সাব-উল আশরাফ' নামক দুটো প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে অমর হন। তিনি যুদ্ধাভিযানের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসও প্রণয়ন করেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে বালাজুরির নাম একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। মিশরবাসী ইবনে আব্দুল হাকাম (মৃঃ ৮৭০) তাঁর 'ফুতহুল-মিশর ওয়া আখবারুহা' গ্রন্থে মিশর, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেন বিজয়ের সর্বপ্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব-ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয়। লেখকগণ এই সময় তাঁদের লেখনী নানা দিকে তুলে ধরেন—কিংবদন্তী, উপাখ্যান, জীবনী, বংশ-তালিকা, ইহুদি ও খ্রীস্টান উপাখ্যান ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ঐতিহাসিক রচনার পথকে প্রশস্ত করে। ইবনুল মুকাফদা (মৃঃ ৭৫৭) প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ 'খুদাইনামা', 'সিয়ারুল মুলুকুল', 'আজম' নামে অনুবাদ করেন। সে যুগের ইতিহাস গ্রন্থে একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করা যায়—ইসলামি, অনৈসলামি কাহিনী, কাল্পনিক উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক কাহিনী পরস্পর একই সাথে একই গ্রন্থে সংযোজিত হতে থাকে এবং যে কোন উৎস হতে যে কোন কাহিনী ইতিহাস পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এটি যেন ছিল সামাজিক ইতিহাস, নিছক রাজা-বাদশাদের রাজকাহিনীই ছিল না। সমাজে যা কিছু ঘটতো, সেইগুলিই স্থান পেত পুস্তকে। বিশেষ করে এই প্রকারের পুস্তক যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ইবনে কুতাইবার (মৃঃ ৮৮৯) 'কিতাবুল মায়ারিফ', আবু হানিফা আদ-দীনাওয়ারীর (মৃঃ ৮৯৫) 'আখবারত তিওয়াল', আল-ইয়াকুবির 'তারিখ', হামজা আল-ইস্পাহানির (মৃঃ ৯৬১) 'তারিখ-ই-সিনি-ই-মুলুকিল আরদ'।

আত-তাবারি : আরব ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ

ঐতিহাসিক ছিলেন আবু জাফর মহম্মদ ইবনে জারির আত-তাবারি। তিনি তাঁর 'তারিখ-উর-রসুল-ওয়াল মুলুক' নামক শীর্ষক ইতিহাস গ্রন্থের জন্য চিরস্মরণীয় হয়েছেন। তিনি ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী বছরভিত্তিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। পৃথিবীর সৃষ্টি হতে ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারাবাহিক উপাদান সংগ্রহ করার জন্য এই জগদ্বিখ্যাত অমর ঐতিহাসিক একাধিক কাল ৪০ বছর পৃথিবীর নানা প্রান্ত পরিভ্রমণ করেন, বিশেষ করেন—ইরান, ইরাক, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল। সারা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর সাধকদের মধ্যেও এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষটি সুদীর্ঘ ৪০ বছরকাল প্রতিদিন গড়ে ৪০ পৃষ্ঠা লিখতেন। যার ফলে তাঁর লিখিত গ্রন্থটি সর্বমোট (৪০ × ৩০= ১২০০ মাসে, ১২০০ × ১২ = ১৪৪০০ পৃষ্ঠা বছরে, ১৪৪০০ × ৪০ = ৫,৭৬,০০০) পাঁচ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পৃষ্ঠা গ্রন্থে পরিণত হয়। বহু ইউরোপিয়ান লেখকও অতি উচ্ছ্বসিতভাবে সিদ্ধপুরুষ 'আত-তাবারি' সম্পর্কে বলেছেন— আজও পৃথিবীর কোন সাধকই তাবারির সাধনাকে অতিক্রম করতে পারেননি। তিনি শুধু ঘটনার পর ঘটনাই লিখে যাননি, কাহিনীর পর কাহিনীই গেঁথে যাননি, একজন নিরপেক্ষ সুক্ষ্মদর্শীর বিচার বিশ্লেষণ-সহ ইসলামের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে অখণ্ড ও পরিপূর্ণভাবে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের উপকরণসমূহ এত পরিপূর্ণভাবে তাবারি ব্যতীত আর কোন ঐতিহাসিক কর্তৃক সংগ্রহ ও সংকলিত হয়নি। ঐতিহাসিক তাবারি ইতিহাসে একটি বিরল যুগস্রষ্টা, আবার তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগেরও অবসান হয়।

আল-মাসুদি ঃ খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে ইসলামের ইতিহাসে আমরা দুটো দিক্‌পাল দেখতে পাই। একজন আত-তাবারি এবং অন্যজন আল-মাসুদি। আত-তাবারি যেখানে বছরভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে একটি যুগের সৃষ্টি করেন, আল-মাসুদি সেখানে বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস যুগের সৃষ্টি করেন। মাসুদি ঘটনাগুলিকে বছরের ভিত্তিতে বর্ণনা না করে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ, রাজবংশ অথবা জাতির ভিত্তিতে সাজিয়ে ইতিহাস রচনা করেন। পরবর্তীকালে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ফখরী ও ইবনে খালদুন এই পথ অনুসরণ করেন। মাসুদি মুতাজিলা মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে এশিয়ার প্রতিটি দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর পূর্বোল্লিখিত কালজয়ী সৃষ্টি 'মুরুযুব জাহাব' ইতিহাস ও ভূগোলের একটি বিশ্বকোষ। এতে শুধু মুসলিম ইতিহাসই স্থান পায়নি, পাক-ভারত, পারস্য, রোমান ও ইহুদিদের ইতিহাসও বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যের ভৌগোলিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে বলেন—যেখানে আজ সমুদ্র, সেখানে একদিন স্থলভাগ বিরাজ করত এবং যেখানে আজ স্থলভাগ, সেখানে একদিন সমুদ্র ছিল। আল-মাসুদি তাঁর বিখ্যাত

'আত-তারবিহ ওয়াল আশরাফ' নামক গ্রন্থে প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও খনিজজগৎ সম্পর্কে অতি বিস্তারিত ও মূল্যবান আলোচনা করেছেন। ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কেও তাঁর আলোচনা অতি উচ্চাঙ্গের। তাই ইতিহাস ও ভূগোল দুটি শাস্ত্রেই আল-মাসুদির নাম কিংবদন্তী স্বরূপ। যতদিন ইতিহাস ও ভূগোল শাস্ত্র আছে, ততদিন তাবারি ও মাসুদের স্মৃতি চির অম্লান ও উজ্জ্বল থাকবে।

অতীতের এবং আব্বাসীয় প্রাথমিক যুগের ও পরবর্তী যুগের ইতিহাসের ধারা ঃ দশম শতাব্দী হতে আরম্ভ করে আব্বাসীয় যুগের ইতিহাস লিখন পদ্ধতি নতুন দিকে মোড় নিল। এটি তখন হতে নতুন নতুন উপকরণ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর লিখিত হতে থাকে। পূর্বেকার ইতিহাস লিখন পদ্ধতি বা ধারা ছিল—ধর্মভিত্তিক ইতিহাস, নৈর্ব্যক্তিক ও চরম আদর্শবাদী। এটি একদিকে ছিল যেমন ব্যাপক ও অন্যদিক ছিল তেমনি মানবতাভিত্তিক। মানবতা-বোধ তার মধ্যে এত বেশি ছিল যে তাকে খাঁটি, নিখুঁত ও নিটোল সামাজিক ইতিহাস বলাও অত্যুক্তি হবে না। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ তাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিরল ব্যক্তিত্ব এবং কঠোর সাধনা দ্বারা প্রতিটি ঘটনা ও কাহিনীকে সত্যের তুলাদণ্ডে বিচার করে তবেই তার মূল্যায়ন করতেন। কাজেই দশম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস লেখনীর ধারা ছিল অবাধ মুক্ত, নির্ভেজাল, নির্লোভ ও নিষ্কাম নিষ্কলুষ কালিমাহীন যুগ-স্মৃতি মানব-সমাজের উজ্জ্বল দীপ্তময় দর্পণ।

দশম শতাব্দী হতে ইতিহাস রচনার কাজ পূর্বেকার ধর্মজ্ঞ, আলিম বা পণ্ডিত-গণের হাত হতে রাজকর্মচারীদের হাতে যেন স্থানান্তরিত হয়। বহু রাজকর্মচারী, সভাসদগণ ইতিহাস লেখার কাজে নিযুক্ত হলেন। যার ফলে ইতিহাসের আকার, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য সকল কিছুই যেন অভাবনীয়ভাবে পরিবর্তিত হল। ইতিহাসের ব্যাপক স্থান সীমিত হল, মানবতাবোধ গৌণ হল। রাজদরবার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিগণ রাজা-বাদশা ও রাজদরবারকে কেন্দ্র করেই তাঁদের ইতিহাস লিখতে থাকেন। কোথাও খলিফা বা আমীরের সচিবগণ দৈনিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করতে থাকেন. যাঁদের ইতিহাসের উপকরণ হল সরকারী দলিল, কর্মচারী-দের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, কোথাও দরবারের নানা গল্পগুজব ইত্যাদি। সরকারী দলিল-দস্তাবেজের ওপর নির্ভর করে ইতিহাস রচিত হওয়ায় নির্ভরযোগ্য হত রচিত ইতিহাস। কিন্তু এর মধ্যেও কিছু খাদ ছিল, কেননা লেখকদের ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের বা সত্য প্রকাশের স্বাধীনতাও সীমিত ছিল। ফলে সেদিনের ইতিহাস রাজা-বাদশাদের কিছুটা বাঁধাধরা ছাঁচে তৈরি হল।

এই যুগেও কিছু অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক জন্ম নেন, তাঁদের মধ্যে মিসকাওয়াই (মৃঃ ১০৩০), ইব্রাহিম আস-সাবি (মৃঃ ১০০৩), হিলাল-আস-সাবি (মৃঃ ১০৫৬), উৎবা এবং আবু শুজা রুদরাওয়ারি প্রমুখ। এঁদের সততা ও পক্ষপাতমুক্ততা

সর্বজন স্বীকৃত ছিল। এঁরা আপন আপন বিবেকবুদ্ধি বিবেচনাকে বিকিয়ে দিয়ে ইতিহাসের মূল্য নির্ণয় করতেন না।

আব্বাসীয় যুগের শেষের দিকেও বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিক জন্ম নেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—ইবনুল জওজী (১১১৬-১২০১), ইবনুল আসীর (১১৬০-১২৪৩) এবং সিবত ইবনুল জওজী (১১৮৬-১২৫৭)। ইবনুল আসীর তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "আল-কামিল ফিত-তারিখ"-এর জন্য ইতিহাসের অধ্যায়ে অমর হয়ে থাকবেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসের জন্য ইতিহাস জগতের প্রবাদ পুরুষ আত-তাবারির গ্রন্থের অনুস্মরণ করে ১২২১ খ্রীঃ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। ঐতিহাসিক ও সিদ্ধপুরুষ তাবারি জগতের সৃষ্টি যুগের সূচনা হতে ৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করে যান। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসের জগৎ সূচনা হতে ১২২১ খ্রীঃ পর্যন্ত একটানা ইতিহাস রচনা মানব-সৃষ্টির একটি চিরবিস্ময় বস্তু। ক্রুসেডের ঘটনা তাঁর ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় জুড়ে আছে। ইবনুল জওজী ও তাঁর পৌত্র সিবত যথাক্রমে কিতাবুল-মুন্তা-জাম ও মিরয়াতুজ-জামান (কালের দর্পণ) রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালের ইতিহাস রচনায় ইবনে খাল্লিকান ও ইবনে খালদুন বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিত্ব।

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রীঃ): আরব-জাহানের প্রথম যুগের ইতিহাসজগতের সিদ্ধপুরুষ, শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক আত-তাবারির প্রায় পাঁচশ' বছর পর পরবর্তী যুগে অন্য একজন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিকের আবির্ভাব দেখা যায়, যাঁর নাম ইবনে খালদুন। 'কিতাবুল ইবার' রচনা করে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। এই ইতিহাস গ্রন্থের মুখবন্ধ 'মুকাদ্দামা' বিশ্ব-ইতিহাসের এক নজিরবিহীন সৃষ্টি। তিনি রাজা-বাদশাদের গতানুগতিক নানা কাহিনী রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, সামাজিক ঘটনাগুলি সাজিয়ে দিয়েই ইতিহাসের সাজি ভর্তি করেননি। করেছেন সেগুলির কারণ নির্ণয় ও বিজ্ঞানসম্মত চমৎকার ব্যাখ্যা ও বিশদ বিশ্লেষণ। তিনি অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে রচনা করেছিলেন ক্রম-বিবর্তনের ধারা মানব সভ্যতার ইতিহাস এবং সেই সভ্যতার উত্থান-পতনের যথাযথ কারণ সমূহ-গুলিও। অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে ও প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক প্রভাবের কথা, খাদ্য ও আহার্যের প্রভাব এবং আবহাওয়ার প্রভাব ও এইগুলির তাৎপর্য কি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জুড়ে ইবনে খালদুনের ঐতিহাসিক খ্যাতি এক চরম শীর্ষে পেঁছায়। রবার্ট ফ্লিণ্ট বলেন—"হব-লক এবং রুশো তাঁর পথিকৃৎই ছিলেন না, বরং তাঁর নামের সাথে তাঁদের নাম উল্লেখ করা উচিত হবে না।" হিট্টি বলেন—"ইবনে খালদুন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক দার্শনিক হিসাবে সমাদৃত ছিলেন।"

ধর্মশাস্ত্র ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও মুসলমানদের ধর্মীয় শাস্ত্র অনুশীলনের ফলে কতকগুলি নতুন বিষয়ের সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে ইলমুল-কালাম কোরআন তত্ত্ব, হাদিসশাস্ত্র, ফেকাহ বা আইনশাস্ত্র এবং ভাষা তত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান।

কোরআন, হাদিস ও ফেকাহ ঃ মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর নিকট প্রেরিত আল্লাহর বাণী সমষ্টিকে কোরআন নামে অভিহিত করা হয়। মহানবীর কাজ, কথা ও মৌন সমর্থনকে 'হাদিস' বলা হয়। ফেকাহ শব্দের অর্থ চিন্তা করা, কোরআন ও হাদিসের যাবতীয় বিধি-নিষেধগুলিকে ইসলামধর্মের অনন্য সাধারণ চিন্তাবিদগণ ফেকাহ শাস্ত্রের মাধ্যমে বিধিবন্ধ করেন।

কোরআন শরীফ ঃ পৃথিবীর সমস্ত ঐশী ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কোরআন শরীফ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ অবিকৃত ঐশী ধর্মীয় গ্রন্থ। জ্ঞানের আধার কোরআন শব্দটির উৎস হচ্ছে—কারা অর্থ পাঠ করা বা পাঠাগার। আরবের হিরা পর্বতের গুহায় আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা (স্বর্গীয় দূত) জিব্রাইল (আঃ) হজরত মহম্মদ (দঃ)-কে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাম করে পাঠ করতে বলেন (একরা বিসমে রাব্বিকাল লাযি খালাক)—তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর। যিনি সৃষ্ট করেছেন। ৯৬ ঃ ১। এ হতে আল্লাহর প্রেরিত কেতাবের নামকরণ হয় কোরআন শরীফ বা পবিত্র কোরআন।

হাদিস শরীফ ঃ কোরআন ব্যতীত হাদিসশাস্ত্রও মুসলমানদের মধ্যে বিশেষভাবে চর্চিত হতে থাকে। সামাজিক ও রাজনৈতিক যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য হাদিসের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই এই হাদিসশাস্ত্রের জ্ঞানার্জনের জন্য মুসলমান বিদ্যান্বেষীগণ দূর হতে সুদূরে সুদীর্ঘ ও বিপদ সংকুল ভ্রমণে বিদেশযাত্রা করতেন, জ্ঞানার্জনের পথে নিহত ব্যক্তিদের ইসলাম ধর্মে শহীদের মর্যাদা দান করা হত।

হাদিস সংগ্রহের ব্যাপারে বিশুদ্ধতায় পরিমাপ হিসাবে দুটো জিনিসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রথম 'ইসনাদ', দ্বিতীয় 'মতন'। যাঁদের মধ্যস্থতায় হাদিস সংগ্রাহক হতে মহানবী পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হত তাঁদের এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতাকে বলা হত ইসনাদ ; এবং হাদিসের বিষয়বস্তু বা গর্ভ বিষয়কে বলা হত মতন। এই বিশুদ্ধকরণের ভিত্তিতে হাদিসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হত। (১) সহিহ—বিশুদ্ধ বা উত্তম হাদিস, (২) হাসান—শুদ্ধ বা মধ্যম হাদিস, (৩) জয়ীফ—দুর্বল হাদিস।

হিজরীর তৃতীয় শতাব্দীতে বা নবম শতাব্দীতে (৮০১-৯০০ খ্রীঃ) ছয়টি বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থের সংকলন হয়। এই ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে আস-সিহাহুস-সিত্তা বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়।

ইমাম-বুখারি (৮১০-৭০ খ্রীঃ) ঃ ইমাম মহম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারির সংকলন গ্রন্থ (বুখারি শরীফ) এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলে বিবেচিত

হয়েছে। ইমাম বুখারি সুদীর্ঘ ষোল বছর যাবৎ একটানা ইরান, ইরাক, সিরিয়া, হেজাজ ও মিশর পরিভ্রমণ করে ১০০০ বিশেষজ্ঞের নিকট হতে ৬০,০০,০০০ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন এবং এদের মধ্যে ৭২৭৫টি হাদিসকে একেবারেই নির্ভুল ও প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেন এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী সেগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেন। যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও জেহাদ এবং শিক্ষা ইত্যাদি। প্রতিটি হাদিস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ইমামসাহেব ওজু করে পবিত্র শরীরে আল্লাহর নামে (দু' রাকাৎ নামাজ) পড়তেন। তাঁর হাদিস গ্রন্থ বুখারি শরীফ মুসলিম জগতের সর্বত্র বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ হিসাবে শ্রদ্ধার সাথে পঠিত হয়ে থাকে।

ইমাম মুসলিম (মৃঃ ৮৭৫)ঃ ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের স্থান ইমাম বুখারির পরই। কেননা বুখারির গ্রন্থের সাথে প্রায় সমভাবে মুসলিমের গ্রন্থ মুসলিম সমাজে সমাদৃত হয়ে থাকে। দুটো গ্রন্থকে সহীহাইন বা দুটো বিশুদ্ধ পুস্তক বলা হয়ে থাকে।

ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরিমিজী, ইমাম ইবনে মাজা ও ইমাম নাসায়ী—এঁদের মৃত্যু সন যথাক্রমে ৮৮৮, ৮৯২, ৮৮৬ ও ৯১৫ খ্রীঃ। এঁরা প্রত্যেকেই হাদিস সংগ্রহ করে মুসলিম জাহানে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন।

ফেকাহ শাস্ত্রঃ কোরআন ও হাদিসের পর ইসলামধর্মে স্থান পায় ফেকাহ শাস্ত্র। ফেকাহ শাস্ত্র মূলত কোরআন ও হাদিসভিত্তিক বস্তু। কোরআন ও হাদিসের যাবতীয় বিধি-নিষেধ ফেকাহর মাধ্যমে বিধিবদ্ধ হয়ে থাকে। এই সময় সমাজে নিত্যনতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে ফেকাহ শাস্ত্রে মূলত দুটো নীতির উদ্ভব হয়; কিয়াস—অনুমান বিবেক বা সাদৃশ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত, অন্যটি ইজমা—সাধারণের সম্মতিসূচক সিদ্ধান্ত। এইভাবে ইসলামধর্মে মুসলিম আইনের সর্বমোট চারটি উৎস স্থিরীকৃত হয় বা স্বীকৃতি লাভ করে। যেমন কোরআন, হাদিস, কিয়াস ও ইজমা। কোরআন শরীফের প্রায় ছয় হাজার আয়াতের মধ্যে দু' শত আয়াত বিশেষ করে কোরআনের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সূরা—বকর ও নেসা মুসলিম আইন শাস্ত্রের উৎস।

মজহাবঃ ফেকাহ শাস্ত্রের এই নীতির ভিত্তিতে মুসলিম আইন প্রণয়নের ফলে মুসলমান সমাজে জগদ্বিখ্যাত চারজন মুসলিম চিন্তাবিদগণের নেতৃত্বে চারটি মজহাব বা পথ বা মতবাদ গড়ে ওঠে। চারজন চিন্তাবিদ—ইমাম আবু হানিফা (৭০০-৬৭), ইমাম শাফি (৭৬৭-৮২০), ইমাম মালেক (৭১৩-৯৫), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (৭৮০-৮৫৫)।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)ঃ ইরাকের কুফাবাসী ইমাম আবু হানিফা চারটি মজহাবের প্রধান মজহাবের জন্মদাতা এবং তাঁরই নামানুসারে তাঁর সৃষ্টি মজহাবের নামকরণ হয় হানাফী মজহাব। পরবর্তীকালে আবু হানিফা সাহেবের প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর বিখ্যাত কিতাবুল খারাজে তাঁর শিক্ষকের

মতবাদগুলিকে লিপিবদ্ধ করে যান। ইমাম আবু হানিফা কিয়াসের সাথে অন্য একটি নীতিও প্রয়োগ করেন। যার নাম ইসতিহসান অর্থাৎ সুবিচার। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর মজহাব সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা সহনশীল। সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রায় অর্ধাংশ এই মজহাবের অনুসারী। ফন ক্রেমার বলেন—"এই মজহাব ইসলামের এক মহত্তম ও মহিমান্বিত কীর্তি।" ইমাম আবু হানিফাকে ইমাম-আজমও (বড় ইমাম) বলা হয়।

ইমাম শাফি (রাঃ)ঃ মহম্মদ ইবনে ইদ্রীস আশ-শাফিয়ী সহনশীল ইরাকের ও রক্ষণশীল মদিনার দুই মতবাদের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেন। তাঁর মতবাদ বা মজহাব শাফিয়ী মজহাব নামে পরিচিত। এই মজহাব মিশরের নিম্ন অঞ্চল, পূর্ব আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, পশ্চিম ও দক্ষিণ আরব এবং ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে। ভারতের আহলে হাদিস গোত্র এই মজহাবের অনুসারী।

ইমাম মালিক (রাঃ)ঃ মদিনাবাসী ইমাম মালিক ইবনে আনাস মালিকী মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব আরবে এই মতবাদ প্রচলিত। তাঁর আল-মুয়াত্তা গ্রন্থ ইসলামি আইনশাস্ত্রের একটি মূল্যবান পুস্তক।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ)ঃ বাগদাদবাসী ইমাম শাফির শিষ্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) হাম্বলী মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খলিফা মামুনের সময় (৮১৩-৩৩) মুতাজিলা মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে কারারুদ্ধ হন এবং বহু নিপীড়ন ও নিগ্রহ সহ্য করেন। তবুও আপন মতবাদ পরিত্যাগ করেননি। তিনি বাগদাদের জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জানাজা নামাজে (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) আট লক্ষ পুরুষ ও ষাট হাজার স্ত্রীলোক যোগদান করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'মসনদ' নামে অভিহিত।

বর্তমান পৃথিবীতে এই চার মজহাবের অনুসারী সংখ্যা—(১) হানিফী মজহাবের অনুসারী সংখ্যা ১১৮,০০০,০০০, (২) শাফিয়ীদের সংখ্যা ৭০,০০০,০০০০, মালিকীদের সংখ্যা ৩০,০০০০০০ এবং ও হাম্বলীদের সংখ্যা ৩,০০০,০০০।

ইসলামধর্মের বিধিনিষেধ অনুযায়ী মুসলমানদের যাবতীয় (ধর্মীয়) কাজ-কর্মগুলিকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) ফরজ অতি অবশ্যই কর্তব্য, (২) সুন্নত কর্তব্য, (৩) মুস্তাহাব বা নফল—প্রশংসনীয়, (৪) জায়েজ—আইন সিদ্ধ। (৫) মকরুহ—অপছন্দনীয়, (৬) হারাম—নিষিদ্ধ বা অবৈধ, (৭) হালাল—বৈধ।

দু' যুগের দুটি বড় অবদানঃ ইসলামধর্মে উমাইয়া যুগের যেমন সর্বাপেক্ষা বড় অবদান—অগণিত পাঠক-পাঠিকার জন্য কোরআন শরীফকে সহজপাঠ্য করার জন্য (উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫) কর্তৃক তাতে জের-জবর-পেশ ও নুক্তার (একার-আকার-উকার ও বিন্দুর) প্রবর্তন। আব্বাসীয় যুগের

তেমনি সর্বাপেক্ষা বড় অবদান—হাদিস সংকলন ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের প্রবর্তন। এই হল ইসলামে দু' যুগের দুটি বড় অবদান।

আব্বাসীয়া যুগের সাহিত্য জগৎ :

সংস্কৃতির সমন্বয় : আমরা লক্ষ্য করেছি উমাইয়া যুগে আরব প্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছে এবং আব্বাসীয় যুগে আরব ও অন-আরব সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে, এখানে একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করেছে, কিন্তু পরাজিত করেনি, এইভাবে দুটো সংস্কৃতিই সমৃদ্ধশালী হয়েছে আব্বাসীয় যুগে। যার ফলে সাহিত্য ও কাব্যচর্চায় আব্বাসীয় যুগ একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা ও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। আরবী ও ফারসী সাহিত্য দুটোরই চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। আরবী সাহিত্যে আবুল ফারাজ, ইবনে খাল্লিকান, আবু নওয়াস উতবী এবং আবু তাম্মাম যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। সংস্কৃতির সমন্বয় যে একটি দেশকে সংস্কৃতবান করে তোলে তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আব্বাসীয়া যুগ।

শূবীয়াহ আন্দোলন : এখানে একটি কথা না বললে আব্বাসীয় যুগের সাহিত্যচর্চার মূলের ইতিহাস কিছুটা বা আংশিক অনুল্লেখিত থেকে যায়। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। যে সমাজে যখন যা কিছু ঘটতে থাকে তার একটি ছাপ পড়তে থাকে সাহিত্যে, কখনও গোচরে, কখনও বা অগোচরে, কখনও প্রত্যক্ষে কখনও অপ্রত্যক্ষে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে আব্বাসীয় খেলাফতের সৃষ্টির পশ্চাতে ছিল একটি বিরাট আন্দোলন ও দেশজোড়া আলোড়ন যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এই বিশাল খেলাফত। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম যুগে ঐ বিরাট আন্দোলন সাহিত্যক্ষেত্রেও একটি অভিনব আন্দোলন গড়ে তোলে। পারস্য ও অন্যান্য অন-আরবদের মধ্যে এই আন্দোলন জন্ম নেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল আরব-কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে, আভিজাত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এই আন্দোলন শূবীয়াহ নামে পরিচিত ছিল। সাহিত্যচর্চাই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনে বাহ্যত মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও এর মূলত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরবদের প্রাধান্যকে বিনষ্ট করা ও অন-আরবদের শ্রেষ্ঠত্বকে সপ্রমাণ করা। সে যাই হোক, এই যুগে আরবী সাহিত্যে অন-আরবদের দান অস্বীকার্য ও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

আরব ও অন-আরব সাহিত্যিক : আরব অপেক্ষা পারস্যদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিলেন আল-বেরুনি ও হামজা-আল-ইস্পাহানি প্রমুখ। অপরদিকে আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সোচ্চার ছিলেন—আজ জাহিজ ইবনে-দুরায়েদ, ইবনে কুতাইবা এবং আল-বালাজুরি প্রমুখ। মুসলিম সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ যে কেবলমাত্র আরবী ভাষা সম্ভূত ছিল তা কখনও বলা যাবে না। কেননা সাহিত্য, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার ক্ষেত্রে আরবগণের মৌলিক চিন্তায় অন-আরব প্রভাব অনস্বীকার্য। কেননা আরব অভিধান রচয়িতা আজ-জাওহারি ছিলেন তুর্কী

সন্তান। অনুরূপভাবে আলেপ্পোর হামদানি রাজদরবারে অন-আরব ইবনে জিন্নী ভাষাতত্ত্বের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। এইভাবে আরব ও অন-আরব উভয় পক্ষের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বহু সুযোগ্য ও বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ আরব সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। সুতরাং সে যুগের উন্নত আরব-সাহিত্য ভান্ডার আরব ও অন-আবর সাহিত্যিকগণের সর্ব যুগের অকৃত্রিম অবদান।

গদ্য : মাকামাহ—আজ-জাহিজের (৮৬৮-৬৯) হাতে আরবী সুকুমার শিল্পের সূচনা, এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বদীউজ্জামান হামদানি (৯৬৯-১০০৮), আস-সায়ালিবী (৯৬১-১০৩৮) ও হারিরী (১০৫৪-১১২২) প্রমুখ লেখকগণের লেখনীতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এটি ছিল পূর্ব প্রচলিত ছন্দময় গদ্যের স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি। পারস্য প্রভাবের ফলে এই যুগের গদ্য সাহিত্য কৃত্রিম ও অলঙ্কারমণ্ডিত হয়। বদীউজ্জামান হামদানি সর্বপ্রথম নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্প রচনার জন্য মাকামা নামক এক প্রকার ছন্দময় গদ্যের প্রবর্তন করেন। লেখক এই রচনা পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু অপেক্ষা রচনা কৌশল, কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার ওপর বিশেষ জোর দেন। বদীউজ্জামানের মাকামা হারিরর বাকামার আদর্শস্বরূপ ছিল। হারিরর মাকামাও (১০৫৪-১১২২) যে কালজয়ী সৃষ্টি সে কথায় কোন সন্দেহ নেই, আজও পর্যন্ত সারা বিশ্বে এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই, যার আরবী বিভাগে হারিরের মাকামা পাঠ্যক্রম হয়নি। এরূপ কালজয়ী লেখক ও কালজয়ী সৃষ্টি সারা বিশ্বের চিরদিনই বিস্ময়। আজ প্রায় হাজার বছর অতিক্রম হতে চলল, তবুও হারিরর মাকামা আজও সর্বত্র নবীনের মর্যাদায় সমাদৃত। এ দুর্লভ সম্মান সারা বিশ্বের খুব কম লেখকেরই ভাগ্যে জুটেছে। আরবী সাহিত্যে এই গদ্য রচনা নাটকের কাছাকাছি হলেও আরবগণ প্রকৃত নাট্য সাহিত্য রচনায় কখনও ব্রতী হননি।

কেতাব আল-আগানি : আরবী সাহিত্য ও মুসলিম সভ্যতার ওপর গবেষণামূলক অতি মূল্যবান গ্রন্থ কেতাব আল-আগানি রচনা করে আবুল ফারাজ ইস্পাহানি অমর হন। তাঁর এই গ্রন্থটি সম্পর্কে আরব ও পারস্যের সমালোচকগণের অভিমত—গ্রন্থটি কবিতা ও সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্নভান্ডার। হামদানি বংশের সাইফুদ্দৌলাহ তাঁর এই কাজের জন্য তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেন। কথিত আছে, প্রখ্যাত বুয়াইয়া উজির ইবনে খাব্বাদ (৯৯৫) ভ্রমণের সময় ত্রিশটা উটের বই সঙ্গে নিয়ে যেতেন, কিন্তু কেতাব আল-আগানি হাতে পাওয়ার পর আর কোন দ্বিতীয় গ্রন্থ সঙ্গে রাখার প্রয়োজন বোধ করতেন না। বিশ্ববিখ্যাত ইবনে খালদুন এই গ্রন্থটিকে আরবদের রেজিস্ট্রার বলে অভিহিত করেন।

আরব্য উপন্যাস : দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ইরাকের আল-জাহশিয়ারী (৯৪২) পুরাতন পারস্য গ্রন্থ হাজার আফসানার ওপর ভিত্তি করে একটি

গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি পরবর্তীকালের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ আলেফ-লায়লা ওয়া লায়লা (সহস্র ও এক রজনী) গ্রন্থের অগ্রদূত ছিল। এই গ্রন্থটিতে ভারত, গ্রীক, হিব্রু ও মিশরীয় গল্পেরও সমাবেশ ঘটে, মিশরের মমলুক শাসনের সময় এই গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তী গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়, যেমন গ্যালাণ্ড (Galland) সর্বপ্রথম এটিকে ফারসী ভাষাতে অনুবাদ করেন এবং উইলিয়ম লেন ও জন পাইন এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। খলিফা হারুণ-আর-রশিদের সময়ও এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পায়।

পদ্য : উমাইয়া যুগের ন্যায় আব্বাসীয় যুগেও কাব্যচর্চায় প্রাক ইসলামি যুগের আদর্শ পরিত্যক্ত হয়। গদ্য সাহিত্যের ন্যায় পদ্য সাহিত্যেও নতুন পদ্ধতি ও নবীন রচনা কৌশল প্রবর্তিত হয়। এই কাব্যচর্চায় নানা দেশের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও পারস্য প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। জোসেফ হেল বলেন—"যখন পাশ্চাত্যে প্রেম কাব্য অপরিচিত ছিল, তখন আরব দেশে এটি চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।" আরব কাব্যচর্চার পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন বাদশার ইবন বুর্দ। তিনি অন্ধ ছিলেন, জিন্দিকদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা থাকায় তাঁকে হত্যা করা হয়। কাব্য রচনার নতুন ধারায় অপর একজন পথিকৃত ছিলেন আবু নুওয়াস। খলিফা হারুণ রশিদের সভাকবি আবু নুওয়াস তাঁর কবিতায় তৎকালীন উচ্চশ্রেণীর সমাজের বিলাসব্যসন ও ভোগসর্বস্ব জীবনের নিখুঁত ছবি তুলে ধরেন। তাঁর বিশিষ্ট কবিতাগুচ্ছ খামুরীয়াত মদের প্রশংসায় রচিত হয়েছিল। ঐ যুগের অপর এক বিশিষ্ট কবি ছিলেন—আবুল-আতাহিয়া (৭৪৮-৮২৮)। তিনি ধর্মীয় ও নৈতিক কবিতা রচনা করে উচ্চশ্রেণীর মানুষের ভোগ-বিলাসের জীবনকে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় বলে প্রকাশ করেন। নীতি ও আদর্শভিত্তিক কবিতা রচনার জন্য তিনি অমর হয়েছেন। এই যুগে সিরিয়ায় দু'জন বিখ্যাত কবি জন্ম নেন—একজন আবু তাম্মাম, অপরজন আবুল-আলা-আল-মায়াররী। আবু তাম্মাম বীর-রসাত্মক হামাসা নামক কবিতা গ্রন্থ সংকলনের জন্য অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত সংকলন আজও জগতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হচ্ছে। অন্ধ কবি আবুল-আলা আল-মায়াররী তাঁর কাব্য রচনায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত ঐ যুগে পারস্যে এমন কয়েকজন অমর কবি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বকবির আসন অলংকৃত করেছেন, যেমন—মহাকবি মুতান্নবী ফেরদৌসী, ওমর খৈয়াম, নেযামী, খাকানী, সেখ সাদী, রুমী আত্তার ও হাফিজ প্রমুখ। একটি দেশের একটি যুগে এক সাথে এতগুলি মহাকবির জন্ম, বিশ্বকবির জন্ম ইতিহাসে একান্ত বিরল, বা নেই বললেও কোন অত্যুক্তি করা হবে না। এই দিক থেকে আব্বাসীয় যুগে সাহিত্যে সোনার ফসল ফলেছে, তাই সে যুগ সাহিত্য এবং সংস্কৃতিরও স্বর্ণযুগ তথা ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ।

স্থাপত্য শিল্প :

আব্বাসীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য : বৈশিষ্ট্যের দিক হতে আব্বাসীয় স্থাপত্য-শিল্প উমাইয়া যুগের স্থাপত্যে বাইজান্টাইন প্রভাব পরিলক্ষিত এবং আব্বাসীয় স্থাপত্যে পারস্য রীতির প্রভাব প্রকট। আব্বাসীয় যুগে স্থাপত্যশিল্প একটি অভিনব যুগের সৃষ্টি করে। মেসোপটেমীয় স্থাপত্যের বিশেষ করে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল মার্বেলের পরিবর্তে ইটের ব্যবহার এবং খিলান, ভল্ট ও অলংকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আব্বাসীয় স্থপতিগণ পারস্য ও মেসোপটেমীয় স্থাপত্যের অনুকরণ করে। আব্বাসীয় সংস্কৃতি যেমন বিশ্ব-সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিজ সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও সারবান করে তুলল, আব্বাসীয় স্থাপত্যশিল্পও ঠিক তেমনি ভাবে নিজ শ্রীবৃদ্ধি সাধনা করল। পরবর্তীকালে বিশ্ব স্থাপত্যশিল্পে আব্বাসীয়দের অবদান অপরিমিত ও অভাবনীয়। আব্বাসীয় যুগে খলিফা মনসুর ও হারুণ রশিদের সময় বহু সুরম্য অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সবই আজকালের করাল গর্ভে বিলীন। ঐ সমস্ত প্রাসাদ ও অট্টালিকার জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনা আজ শুধু ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ।

সূচনা : মহানবী হজরত মহম্মদের সময়কাল হতে খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত স্থাপত্যশিল্প ছিল খুবই সাধারণ ও অনাড়ম্বরপূর্ণ। ইসলামের সম্প্রসারণ ও রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান স্থপতিগণ বিশ্ব-স্থাপত্য কীর্তির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। একথা সর্বজন স্বীকৃত—মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম স্থাপত্যের উন্মেষ বা জন্ম। মদিনার মহানবীর মসজিদই-নবীকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালের মসজিদগুলি গড়ে ওঠে। এই সমস্ত মসজিদের প্রধান উপকরণ ছিল—মিহরাব, মিম্বর ইত্যাদি।

উমাইয়া যুগ : উমাইয়া রাজত্বকালে মুয়াবিয়ার অধীনে জিয়াদ কুফা ও বসরার প্রাচীন মসজিদগুলিকে নতুন রীতিতে সংস্কার করেন। ঠিক একই ভাবে অমর ফুসতাতের মসজিদে প্রথম মিহরাব প্রচলন করেন। উত্তর আফ্রিকায় ওকবা বিন নাফি কায়রোয়ানে (৬৭০-৭৬ খ্রীঃ) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমরের সময় মদিনার মসজিদে সর্বপ্রথম মিহরাব স্থাপন করা হয়। মসজিদের ভেতরে অপর একটি উপকরণ স্থাপিত হয়, এর নাম মাফসুরা। যার প্রবর্তনকারী ছিলেন—প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া। খলিফার নিরাপত্তার জন্য মসজিদের মিহরাবের সম্মুখে এটি স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত এই যুগেই মসজিদে মিনার প্রবর্তিত হয়, ফুসতাতের মসজিদে আমর সর্বপ্রথম মিনার নির্মাণ করেন। উমাইয়া স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন খলিফা আব্দুল মালিক কর্তৃক নির্মিত ডোম-অব-দ্য-রক। জেরুজালেমে নির্মিত এই রক এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি গোলাকার ইমারত। এর মধ্যে একটি পবিত্র পাথর আছে। এই অপূর্ব ইমারত আজও উমাইয়া যুগের স্থাপত্যশিল্পের অতুলনীয় স্বাক্ষর বহন করছে। খলিফা প্রথম

ওয়ালিদ কর্তৃক নির্মিত দামেস্কের জামে মসজিদটিও স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। দামেস্কের মসজিদটিকে মুসলিম স্থাপত্যের এক সমন্বয় ভূমি বলা যায়। ধর্মীয় ইমারত ব্যতীতও উমাইয়া যুগে বহু মরু প্রাসাদেও অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত গড়ে ওঠে, যেমন প্রথম ইয়েজিদের সময় কুসাইর আক্‌রা, হিশামের সময় খিরবত মফজার, দ্বিতীয় ওয়ালিদের সময় মাশাডা প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রাসাদগুলিতে অপূর্ব দেওয়াল চিত্র ও অচিন্ত্যনীয় ভাস্কর্যের নিদর্শনও দেখা যায়।

আব্বাসীয় যুগ প্রাসাদ ও নগর: আব্বাসীয় স্থাপত্যকলা উমাইয়া স্থাপত্যশিল্প হতে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। উমাইয়া স্থাপত্যশিল্পে বাইজান্টাইন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম স্থাপত্য এক অভিনব যুগের সৃষ্টি করে। সেখানে পারস্য স্থাপত্যের প্রভাব কিছু কিছু লক্ষ্য করা গেলেও আব্বাসীয় স্থাপত্য আপন গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। মেসোপটেমীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল—মার্বেলের পরিবর্তে ইটের ব্যবহার। এবং ব্যাবিলনীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল—খিলান, ভল্ট, অলঙ্করণ প্রভৃতি। আব্বাসীয় স্থাপত্য সকল প্রাচীন স্থাপত্য-কলা হতে কিছু কিছু গ্রহণ করেও স্থাপত্যজগতে আপন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। খলিফা মনসুর বাগদাদ নগরী স্থাপনে স্থাপত্যশিল্পের যে পরিচয় রেখে যান, তা আজও বিরল। এই গোলাকার সংরক্ষিত দুর্গটি তৎকালীন বিশ্বের একটি বিস্ময় ছিল। বাগদাদ দুর্গের অভ্যন্তরে কুব্বাত-আল-খাদরা অর্থাৎ সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট একটি রাজপ্রাসাদও তৎসংলগ্ন একটি জুমা মসজিদ নির্মিত হয়। অধিকন্তু খলিফা রাক্কা নামক স্থানেও একটি অপূর্ব রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে স্থাপত্যশিল্পের চরম নিদর্শন রেখে যান। শুধু খলিফা মনসুরের সময়েই নয়, বিভিন্ন খলিফার সময় বহু রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—বার্মেকিদের শামমাশিয়ার প্রাসাদ, সামারায় মুতাসিমের বুলকাওয়ারা প্রাসাদ, মুতাজিদের তাজ প্রাসাদ, মুকতাদিরের দার-উস্-শাজারাহ প্রাসাদ। এবং বুয়াইয়াদের আল-মুইজ্জিয়া প্রাসাদ অন্যতম।

মসজিদ: আব্বাসীয় স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করছে অসংখ্য মসজিদ। খলিফা আল-মনসুরের বাগদাদ দুর্গে নির্মিত জুমা-মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য খলিফাগণও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। ক্রসওয়েল বলেন—"আব্বাসীয় আমলে সিরিয়ায় হেলেনিস্টিক প্রভাব পারস্যের সাসানীয় প্রভাবের চাপে দূরীভূত হয়।" ইরাকের বাগদাদ হতে পারস্যের সামররায় রাজধানী স্থানান্তরিত হলে পারস্য প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করে। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বে ৮৪৮-৪৯ খ্রীস্টাব্দে সামাররার জামে মসজিদ ও আবু দুলাফের যে মসজিদ নির্মিত হয়। তা নিঃসন্দেহে পারস্য স্থাপত্যের ঐতিহ্য বহন করছে। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের জিগুরাতের অনুকরণে সামররার মসজিদের বাহির

পার্শ্বে একটি মিনার স্থাপিত হয়। এটি গোলাকৃতি এবং ওপরে ওঠার জন্য বাহির থেকে ঘোরান সিঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। কথিত আছে—এই মিনারকে কেন্দ্র করে ইবন-তুলুন কায়রোতে তাঁর মসজিদে একটি মিনার তৈরি করেন। আব্বাসীয় স্থাপত্যশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য গোলাকার গম্বুজ। অর্ধবৃত্তাকার খিলান, ভল্ট, খাঁজকাটা কঙ্গুরা (Battlement), ইটের নকশা, মিনাকরা টালি প্রভৃতি।

বিশ্ব-স্থাপত্যশিল্পে ইসলামের অবদান বা প্রভাবের কথা বলতে গেলে সহজেই মনে পড়ে বর্তমান বিশ্বের দুটো অতুলনীয় স্থাপত্যের কথা, একটি স্পেনের আল-হামরা এবং অন্যটি ভারতের তাজমহল। আজও দুটোই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই খানেই ইসলামি স্থাপত্যশিল্প অপ্রতিদ্বন্দ্বতার ও অমরত্বের গৌরবলাভ করে বিশ্ব স্থাপত্য ও বিশ্ব সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করছে। কবিগুরুর ভাষায় :

তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি—
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছ বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া—
'ভুলি নাই—ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া' !

সুকুমার শিল্প :

সূচনা : ব্যক্তি পূজার আশংকায় ইসালামধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক স্বয়ং হজরত (দঃ) মানুষের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাই বর্তমান জগতে যত ছবিই মুসলিম জাহানে পাওয়া যাক, তাঁর ছবিটি কোথাও পাওয়া যাবে না। এমন কি কোথাও কেউ তাঁর ছবি অংকন করলে বা ছাপালে মুসলিম জাহানে বিরাট আলোড়ন পড়ে যায় বা যাবে। বিশেষ করে মহানবী (দঃ) হতে তাঁর চার সৎ খলিফার ও তাঁর পরিবারবর্গের কারো কোন ছবি আজও পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় না। চিত্রকলা জগতে মুসলমানরা ঐ সীমারেখা পর্যন্ত মেনে চলেন। কিন্তু এই সীমারেখার পরে মসুলমানরা চিত্রকলায় অন্যান্য অধ্যায়ের মতো চরম পারদর্শিতার পরিচয় দেখিয়েছেন। উমাইয়া যুগে যার হাতেখড়ি, আব্বাসীয় যুগে তার চরম উৎকর্ষতা লাভ দেখা যায়। খ্রীস্টান ও বৌদ্ধধর্মে চিত্রকলা ধর্ম প্রচারের নিমিত্ত ব্যবহার হত। কিন্তু ইসলামে চিত্রকলা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল না। ধর্মীয় এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মুসলমানরা চিত্রকলায় সার্থক শিল্পীর পরিচয় দেন। বাগদাদে প্রথম মেসোপটেমিয়া চিত্রকলা প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন আরব পরিব্রাজক নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন দরবারে মহানবী (সাঃ)-এর সর্বপ্রাচীন ছবিটি দেখান। সম্ভবত কোন নেস্টোরিয়ান শিল্পী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই গোপনে এই ছবিটি অংকন করেন।

ক্ষুদ্রচিত্র : মুসলিম চিত্রকলা প্রথম প্রধানত পাণ্ডুলিপিভিত্তিক ছিল এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় বিভিন্ন রেখা ও রংয়ের প্রয়োগে চিত্র অংকন করা হত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পুস্তকে

ক্ষুদ্র চিত্রের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। মাকরিজী মুসলিম চিত্রকলার ওপর একটি প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কতকগুলি বিশেষ পাণ্ডুলিপিকে কেন্দ্র করে মুসলিম ক্ষুদ্র চিত্রকলার আদিযুগ শুরু হয়। যেমন গ্রীক লেখক ডায়-সকরাইডসের মেটিরিয়া মেডিকা। হারিরির—'মাকামাই কালিলা ওয়া দিমনা' ও কিতাবুল আগামী' প্রভৃতি প্রধান। সম্ভবত খ্রীস্টান নেস্টোরিয়ান ও জাকোবিন শিল্পীদের দ্বারা বা তাঁদের প্রভাবে এই পাণ্ডুলিপিগুলি চিত্রায়িত হয়। পারস্য ভূমি প্রথম মুসলিম চিত্রশিল্পেব জন্মদাতা।

চিত্রকলা বা দেওয়ালচিত্র ঃ প্রাণিজগতের প্রতিকৃতি অংকন সম্বন্ধে বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমরা অট্টালিকার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ঐ চিত্রকলার ব্যবহার লক্ষ্য করি। কেননা সে যুগে রাজপ্রাসাদের অলংকরণের ব্যবহার ছিল খুবই জনপ্রিয়। খলিফা আল-মনসুর তাঁর বাগদাদের রাজপ্রাসাদের গম্বুজের ওপর দিক্ নির্ণয়কারী একটি অশ্বারোহীর প্রতিকৃতি স্থাপন করেছিলেন। খলিফা আল-আমিন দজলা নদীতে তাঁর প্রমোদ তরীগুলির কোনটিকে সিংহ, কোনটিকে ঈগল বা কোনটিকে ময়ূর ও কোনটিকে তিমি মৎস্যের আকৃতি করে নির্মাণ করিয়ে-ছিলেন। সেই পুরানো দিনের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে আজও আমাদের দেশের নদীগুলিতে ময়ূরপংখী নৌকা অতি জনপ্রিয় ও মর্যাদাশীল যাত্রার বাহন। খলিফা আল-মুকতাদির তাঁর একটি প্রকাণ্ড সরোবরের মধ্যস্থলে ১৮টি শাখা বিশিষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত একটি বৃক্ষ স্থাপন করেছিলেন। এবং এই সরোবরের প্রতিপার্শ্বে ব্রাকেডের পোশাকে সুসজ্জিত বর্শাধারী ১৫টি অশ্বারোহীর মূর্তি ছিল, তারা যান্ত্রিক-যোগে সদা বলমান যুদ্ধরত সৈনিকদের মতো বীর-বিক্রমে সদাই ঘুরতে থাকত। খলিফা মুস্তাসিম তাঁর সামাররা রাজপ্রাসাদকে 'কুসায়র আমরার' মতো প্রাসাদের দেওয়ালে কোথাও অপূর্ব সুন্দরী নারী মূর্তি, কোথাও বা পরমা সুন্দরীর নগ্নদেহ, কোথাও বা পশু-পক্ষীর যৌন মিলন, কোথাও বা মৃগয়ার দৃশ্য দ্বারা সুশোভিত করে তোলেন। খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সময়েও রাজপ্রাসাদে বহু মানব-মূর্তি অঙ্কিত হয়। এতদ্ব্যতীত কার্পেট জীবন্ত প্রাণীর নকশা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এই সকল কাজ প্রথম প্রথম খ্রীস্টান কারিগর দ্বারা করা হত বলে অনুমান করা যায়।

মৃৎশিল্প ঃ মৃৎশিল্পেও আব্বাসীয় শিল্পীগণ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। এ ধরনের রঙিন নকশাকৃত ছবির নাম ছিল কাশী, যার উৎপত্তিস্থল ছিল পারস্যের কাশান। এনামেল ও গিলটির ওপর কাজের জন্য এণ্টিয়োক, আলেপ্পো ও দামেস্ক প্রসিদ্ধ ছিল। সামাররা ও ফুসতাতের অসংখ্য মৃৎপাত্র, রঙিন থালা, পাত্র, কলসী, ফুলদানি ও বাতি এবং ঝাড় লণ্ঠন আব্বাসীয় চারুশিল্পের স্বাক্ষর আজও বহন করে। কায়রার আরব মিউজিয়াম ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আজও ঐগুলোর কিছু কিছু স্মৃতি-চিহ্ন সংরক্ষিত আছে। বাকি সবকিছুই কাল-গর্ভে বিলীন।

খুশখৎ—হস্তলিখন শিল্প : মুসলমানদের মধ্যে মূর্তি অংকন, প্রাণিজগতের প্রতিকৃতি অংকন প্রভৃতি কাজে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ থাকার ফলে কখনও তা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়নি। কিন্তু ঐশ্বরিক বাণীর মর্যাদা দানের প্রবণতায় মুসলিম শিল্পীগণ, 'প্রথম কোরআন শরীফের প্রতিলিপি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে খুশখৎ বা সুন্দর হস্তাক্ষর ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তখনকার দিনে 'খুশখৎ' লেখকগণ সমাজে চিত্রকর অপেক্ষা অনেক বেশি সম্মানী ছিলেন। রাজা-বাদশাহ, কাজী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ খুশখৎ অভ্যাস করাকে অতি পুণ্যের কাজ বলে মনে করতেন। আমাদের দেশে সুলতান নাসিরুদ্দীন, বাদশাহ আওরঙ্গজেব কোরআন শরীফের সুন্দর অক্ষরগুলিকে নিজ হস্তে নকল করাকে অতি পুণ্যের কাজ মনে করে স্বহস্তে কোরআন শরীফ নকল করে বাজারে বিক্রি করাতেন এবং ঐ উপার্জিত অর্থ দ্বারা নিজ জীবিকা পরিচালনা করতেন। কথিত আছে, তাঁরা সাধারণের বা সরকারী রাজকোষ হতে আপন ব্যয় নির্বাহের জন্য এক পয়সাও গ্রহণ করতেন না। খলিফা আল-মামুনের রাজত্বে আর রায়হানী আরবী হস্তলিখন রীতি 'রাহানীয়' প্রবর্তন করেন। আব্বাসীয় মন্ত্রী তথা প্রখ্যাত হস্তলিপিকার ইবনে মুকলাহার ডান হাত কর্তিত হলেও তিনি বাম হাতেই এমনকি কর্তিত হাতের মধ্যভাগে কলম বেঁধেও দ্রুত লিখতে পারতেন। ইবনুল-বাওয়ার 'মুহাক্কাফ' পদ্ধতির প্রচলন করার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আরবী ভাষায় লিখিত বইয়ের বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য আমরা সকলেই ঐ সমস্ত লেখকের সাজ-সজ্জা, বাঁধাই ও অলংকরণ এবং বিভিন্ন রংয়ের সাহায্যে একে মনোগ্রাহী করে তৈরি করার কলাকৌশলও মুসলমানগণ উদ্ভাবন করেন। সুতরাং খুশখৎ বা হস্তলিখন শিল্পও এই যুগে বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে।

সঙ্গীত : উমাইয়া যুগ অপেক্ষা আব্বাসীয় যুগে সঙ্গীত-চর্চা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এবং মুসলমানগণ সঙ্গীতের প্রতি দিন দিন বেশি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এই যুগের বিখ্যাত সঙ্গীতবিদদের মধ্যে মক্কার সিয়াত, মসুলের ইব্রাহিম, ইবনে জামী, মুখারিক ও ইসহাক ইবনে মসুলি প্রধান। এঁদের মধ্যে ইব্রাহিম মসুলি সর্বশ্রেষ্ঠ ও মৌলিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। আল-মাহদি মক্কার সঙ্গীত শিল্পী সিয়াত এবং তাঁর শিষ্য ইব্রাহিম মসুলিকে তাঁর রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। কথিত আছে, পারস্যবাসী ইব্রাহিম শুধু যষ্টির আঘাতে সুর-হিল্লোল সৃষ্টি করতে পারতেন। তিনি ত্রিশটি বীণার সুরের মধ্যে পার্থক্য এবং তাদের ত্রুটি সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন। খলিফা হারুণ রশিদ তাঁকে এককালীন ১ লক্ষ ৫০ হাজার দিরহাম উপঢৌকন দান করেন। এবং তাঁর জন্য মাসিক দশ হাজার দিরহাম বৃত্তি নির্ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁর অপূর্ব সঙ্গীত বিতরণের জন্যও মাঝে মাঝে পারিতোষিকও লাভ করতেন। একবার একটিমাত্র গানের জন্য খলিফা তাঁকে এক লক্ষ দিরহাম দান করেন। আরব্য উপন্যাসের

নায়ক খলিফা হারুণের দরবার ছিল সঙ্গীতচর্চায় উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই সঙ্গীতের মজলিসে কখনও কখনও দু' হাজার গায়ক-গায়িকা অংশগ্রহণ করতেন। খলিফা হারুণের ভ্রাতা ইব্রাহিম ইবনে মাহদিও একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক ছিলেন। অন্যান্য খলিফাদের মধ্যে আল-ওয়াসিক, আল-মুনতাসির, আল-মুতাজ ও আল-মুকতামিদ সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। আল-আমিনের দরবারেও কণ্ঠশিল্পীদের সমাদর কম ছিল না। আল-মামুন ও আল-মুতাওয়াক্কিলের সভাকবি ছিলেন। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী ইসহাক-ইবনে ইব্রাহিম আল-মসুলি। খলিফা আল-ওয়াসিক তাঁর বাঁশীতে এক শত সুর-লহরী বাজাতে পারতেন। কণ্ঠশিল্পী হিসাবে খলিফা আল-মুকতাদির সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর দরবারে ভূগোল-বিশারদ খুরদাদাবিহ নৃত্য ও সঙ্গীতের ওপর একটি সুচিন্তিত সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন।

এই যুগে সঙ্গীত সম্পর্কিত অনেক বই গ্রীক ভাষা হতে আরবীতে অনূদিত হয়। সঙ্গীতে আরবী প্রতিশব্দ 'মুসিকী বা মিউজিকী' গ্রীক ভাষা হতে গৃহীত। আরবগণ সঙ্গীতের মতবাদের জন্য গ্রীকদের নিকট ঋণী হলেও সঙ্গীত চর্চায় ও তার উৎকর্ষতা সাধনে আরবগণের মৌলিক অবদান অপরিমিত। আরব সঙ্গীত জ্ঞান সঙ্গীতের থিওরী বোঝাতে যেমন 'মুসিকী' শব্দের প্রয়োগ করতেন, তেমনি সঙ্গীতের ব্যবহারিক প্রয়োগ বোঝাতে আরবী শব্দ 'গীনা'র প্রয়োগ করতেন। যাঁরা সঙ্গীত জগতের গ্রন্থ রচনায় সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দার্শনিক আল-কিন্দি, চিকিৎসা-জ্ঞানী আর রাজি ও দার্শনিক আল-ফারাবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আল-ফারাবি সঙ্গীতের ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'কিতাবুল-মুসিকী-উল-কবীর' সমগ্র প্রাচ্য জগতে সঙ্গীতের ওপর সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য পুস্তক। বিশ্ব-বিশ্রুত মনীষী ইবনে সীনাও সঙ্গীত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। ইমাম গাজ্জালি 'সামা' নামক ভক্তিমূলক গানের সমর্থনে তাঁর মত প্রকাশ করায় পরবর্তী যুগে ইসলামের সুফীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সঙ্গীতের বহুল প্রচার ঘটতে দেখা যায়।

সুতরাং আব্বাসীয় যুগের ইতিহাস মানব-সমাজের কল্যাণে মুসলমানদের সাধনার ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্থানের ইতিহাস আগামী দিনের যে কোন যুগের জন্য একটি লোভনীয় ইতিহাস, আদর্শ ইতিহাস।

পরিশিষ্ট

ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সন-তারিখ

মহানবী হজরত মহম্মদ (দঃ)

(৫৭০-৬৩২ খ্রীঃ)

খোলাফা ই রাশেদীন

(৬৩২-৬১)

হজরত আবু বকর ৬৩২-৩৪
হজরত ওমর ৬৩৪-৪৭
হজরত উসমান ৬৪৪-৫৬
হজরত আলি ৬৫৭-৬১

উমাইয়া খলিফাগণ

(৬৬১-৭৫০)

ময়াবিয়া ৬৬১-৮০
ইয়েজিদ (১ম) ৬৮০-৮৩
ময়াবিয়া (২য়) ৬৮৩
মারওয়ান (১ম) ৬৮৩-৮৪
আব্দুল মালিক ৬৮৫-৭০৫
ওয়ালিদ (১ম) ৭০৫-১৫
সুলাইমান ৭১৫-১৭
ওমর বিন আঃ আজিজ ৭১৭-২০
ইয়েজিদ ৭২০-২৪
হিশাম ৭২৪-৪৩
ওয়ালিদ (২য়) ৭৪৩-৪৪
ইয়েজিদ (৩য়)—৭৪৪
মারওয়ান (২য) ৭৪৭-৫০

আব্বাসীয়া খলিফাগণ

(৭৫০-১২৫৮)

সাফফাহ ৭৫০-৫৪
মনসুর ৭৫৪-৭৫
মাহদি ৭৭৫-৮৫
হাদি ৭৮৫-৮৬
হারুণ রশিদ ৭৮৬-৮০৯
আমিন ৮০৯-১৩
মামুন ৮১৩-৩৩
মুতাসিম ৮৩৩-৪২
ওয়াসিক ৮৪২-৪৭
মুতাওয়াক্কিল ৮৪৭-৬১
মুন্তাসির ৮৬১-৬২
মুস্তায়িন ৮৬২-৬৬
মু'তাজ ৮৬৬-৬৯
মুহতাদি ৮৬৯-৭০
মুতামিদ ৮৭০-৯২
মুতাদিদ ৮৯২-৯০২
মুকতাফি ৯০২-০৮
মুকতাদির ৯০৮-৩২
কাহির ৯৩২-৩৪
রাদি ৯৩৪-৪০
মুত্তাফি ৯৪০-৪৬
মুস্তাকফি ৯৪৪-৪৬
মুতি ৯৪৬-৭৪
তায়ি ৯৭৪-৯১
কাদির ৯৯১-১০৩১
কায়িম ১০৩১-৭৫
মুকতাদি ১০৭৫-৯৪
মুস্তাজির ১০৯৪-১১১৮
মুস্তারশিদ ১১১৮-৩৫
রশিদ ১১৩৫-৩৬
মুকতাফি ১১৩৬-৬০
মুস্তানজিদ ১১৬০-৭০
মুস্তাদি ১১৭০-৮০
নাসির ১১৮০-১২২৫
জাহির ১২২৫-২৬
মুস্তানসির ১২২৬-৪২
মুস্তাসিম ১২৪২-৫৮

ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

ঘটনা	সন
মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনপঞ্জী	
হজরত মহম্মদ (দঃ) জন্ম	৫৭০
নবুয়ত লাভ	৬১০
ধর্মপ্রচারে আদিষ্ট	৬১৩
আবিসিনিয়ায় হিজরত	৬১৫
বনু হাশিমের বিরুদ্ধে অসহযোগ	৬১৬
আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যু	৬১৯
আকাবার প্রথম শপথ	৬২১
আকাবার দ্বিতীয় শপথ	৬২২
হিজরত	৬২২
বদরের যুদ্ধ	৬২৪
ওহোদের যুদ্ধ	৬২৫
খন্দকের যুদ্ধ	৬২৭
হুদায়বিয়ার সন্ধি	৬২৮
খাইবার বিজয়	৬২৮
মুতা অভিযান	৬২৯
মক্কা বিজয়	৬৩০
হুনাইনের যুদ্ধ	৬৩০
তাবুক অভিযান	৬৩০
প্রতিনিধি প্রেরণ	৬৩১
বিদায় হজ্ব	৬৩২
ওফাত (মৃত্যু)	৬৩২
খোলাফা-ই রাশেদীন	
হজরত আবু বকর খলিফা নির্বাচিত	৬৩২
উসামার নেতৃত্বে অভিযান	৬৩২
রিদ্দার যুদ্ধ	৬৩২-৬৩৩
আজনাদাইনের যুদ্ধ	৬৩৪
আবু বকরের মৃত্যু	৬৩৪
হজরত ওমর খলিফা নির্বাচিত	৬৩৪
দামেস্কের আত্মসমর্পণ	৬৩৫
ইয়ারমুকের যুদ্ধ	৬৩৬
জেরুজালেমের আত্মসমর্পণ	৬৩৭

ঘটনা	সন
কাদিসিয়ার যুদ্ধ	৬৩৭
মাদায়িন অধিকার	৬৩৭
জালুলার যুদ্ধ	৬৩৭
ব্যাবিলনের (মিশরের) আত্মসমর্পণ	৬৪১
আলেকজান্দ্রিয়ার সন্ধি	৬৪১
নিহাওন্দের যুদ্ধ	৬৪২
হজরত ওমরের শাহাদত	৬৪৪
হজরত ওসমান খলিফা নির্বাচিত	৬৪৪
পূর্বাঞ্চলে বিজয় অভিযান	৬৪৫
কাবা গৃহের সংস্কার	৬৪৭
কোরআন শরীফ একত্রীকরণ	৬৫৬
হজরত ওসমানের শাহাদত	৬৫৬
হজরত আলি খলিফা নির্বাচিত	৬৫৬
উষ্ট্রের যুদ্ধ	৬৫৬
সিফফিনের যুদ্ধ	৬৫৭
নাহরাওয়ানের যুদ্ধ	৬৫৮
দুমার মীমাংসা	৬৫৯
হজরত আলির শাহাদত	৬৬১
উমাইয়া যুগ	
মুয়াবিয়ার সিংহাসন লাভ	৬৬১
কারবালার শোচনীয় হত্যা	৬৮০
ইয়েজিদের মদিনা আক্রমণ	৬৮৩
মক্কা অবরোধ	৬৮৩
জাব নদীর যুদ্ধ	৬৮৬
হাজ্জাজের মক্কা ও মদিনা আক্রমণ	৬৯২
ওয়াসিত নগরীর পত্তন	৭০২
মধ্য এশিয়া বিজয়	৭০৫-১২
স্পেন বিজয়	৭১১
সিন্ধু বিজয়	৭১২
কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ	৭১৪
টুলোর যুদ্ধ	৭২১
টরসের যুদ্ধ	৭৩২
মার্ভের পতন	৭৪৭

ঘটনা	সন	ঘটনা	সন
কুফা অধিকার	৭৪৯	মালিক শাহের মৃত্যু	১০৯২
জাবের যুদ্ধ	৭৫০	খলিফা মুস তাহজিদ	১০৯৪-১৮
উমাইয়া যুগের পতন	৭৫০	মুসতারসিদ	১১১৮-৩৪
আব্বাসীয়া যুগ		রশিদ	১১৩৪-৩৫
নাসিবিনের যুদ্ধ	৭৫৪	মুকতাফি	১১৩৫-৬০
বাগদাদের পতন	৭৬২	মুস্তানজিদ	১১৬০-৭০
বার্মেকিদের পতন	৮০৩	মুস্তাদি	১১৭০-৮০
বাগদাদে বায়তুল হিকমার প্রতিষ্ঠা	৮৩০	নাসির	১১৮০-১২২৫
মুতাজিলা মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সরকারী ফরমান	৮৩৩	জাহির	১২২৫-২৬
রাজধানী সামারায় স্থানান্তরিত	৮৩৬	মুস্তানসির	১২২৬-৪২
নিগ্রো বিদ্রোহ	৮৬৯-৮৩	মুসতাসিম	১২৪২-৫৮
বুয়াইয়া বংশ	৯৪৬	হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং আব্বাসীয়া যুগের পতন	১২৫৮
সেলজুক বংশ	১০৫৫		

ইসলামের শাসক ও রাজধানী

	শাসক	রাজধানী	সন
১।	মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) হতে হজরত ওসমান (রাঃ) পর্যন্ত	মাদনা	৬২২-৫৬
২।	হজরত আলি (কঃ)	কুফা	৬৫৬-৬৬১
৩।	মোয়াবিয়া—ইব্রাহিম	দামাস্কাস	৬৬১-৭৪৪
৪।	মারওয়ান (২য়)	হাররান	৭৪৪-৫০
৫।	আবুল আব্বাস	কুফা	৭৫০-৫৪
৬।	আবু জাফর আল-মনসুর হতে আল-মুসতাসি	বাগদাদ	৭৫৪-১২৫৮